বেঞ্চ অ্যাণ্ড বার

[অন্তরঙ্গ আদালত]

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

[illegible] বুক হাউস ॥ ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ সাল

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৮৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯ ।

দিক্‌পাল সাহিত্যিক

অধ্যাপক, শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

লেখকের অন্য বই

ইষ্ট ব্যাকল্যান্ড রোড
পূর্বাভাস
বারোয়ারী বিবি
ঈশ্বরের আবাস
যুগস্বাক্ষর
রোটারিয়ান
বিহঙ্গ নিষাদ (যন্ত্রস্থ)

১

বুধবার। সাতই জুলাই। বাংলা ক্যালেণ্ডারে বোধহয় আষাঢ় মাসের কোন্ একটা তারিখ। বাংলা তারিখের সঙ্গে প্রতিদিনের যোগাযোগ থাকে না। দিনের নির্ঘণ্ট চলে ইংরেজি তারিখ ধরে। একটা গতানু-গতিক রীতিতে।

কিন্তু আজ সাতই জুলাই উশ্রীর জীবনে কয়েকটি ঐতিহাসিক দিনের একটি। যে তারিখ বার আর সাল লিখিত না হয়েও তার মনের পৃষ্ঠায় চিরমুদ্রিত হয়ে থাকবে। এমন আরও কয়েকটা তারিখ। কিন্তু উশ্রীর পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের জীবনে এমন বিশিষ্ট তারিখের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

বিয়ের ইংরেজি তারিখটা পর্যন্ত উশ্রীর স্মরণ নেই। কার্ডে ছাপা হয়েছিল পনেরোই শ্রাবণ। সেটাও বোধহয় জুলাই। অথবা আগস্ট। তবে মনে আছে বর্ষাকাল। সেদিন কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় নি। পুরো সপ্তাটাই শুকনো। আকাশ ভরা মেঘ, অথচ বৃষ্টি নেই। দিনে অসহ্য গরম রাতে গুমোট। তবে বিয়ের দিনটা প্রকৃতির এ দৌরাত্ম্য গায়ে আঁচ কাটতে পারে নি। মনে অসহিষ্ণু ভাব জাগে নি। কিন্তু তবু পনেরোই শ্রাবণের সমান ইংরেজি তারিখটা স্মরণ হয় না। অর্থাৎ বিয়ে হওয়ার ব্যাপারটা তার কাছে ঐতিহাসিক নয়। ছেলে মেয়ের জন্মতারিখও তার মনে নেই। না ইংরেজি, না বাংলা। তিনটির একটিরও না।

প্রথম দুটি সন্তানের অবশ্য তারিখ বার ও সাল একই। দীপ্ত আর কাবেরী একই দিনে জন্মেছে। পাঁচ সাত মিনিট তফাতে। তার প্রায় তিন বছর পরে তাপ্তী। তারা উশ্রীর সঙ্গে ডাক্তার ভাস্কর মুখার্জির বিবাহজনিত যোগাযোগের জৈব ফসল। তাদের জন্ম কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। যদি না তারা ব্যক্তিগত ইতিহাস সৃষ্টি করে তবে সে জন্ম তারিখ শুধু

লেখাপড়া চাকরি বাকরি আর বিয়ের সময় প্রয়োজন হবে। সে তারিখ ভাস্করের ডাইরি থেকে স্কুলের খাতাপত্রে চালান হয়ে গেছে। কিন্তু তা সঠিক নয়, বছর দুই করে কমিয়ে লেখানো।

আজ সাতই জুলাই এর অন্যতম ঐতিহাসিক দিনে উশ্রী নিজেকে সম্পূর্ণ অব্যবস্থিত মনে করতে লাগল। এ দিনটা কি কখনো তার সদা জেগে থাকা চেতনা থেকে মুছে ফেলতে পারবে ?

ঘটনা কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। হঠাৎ কিছু হয়ে যায় নি। তবে ঠিক এইভাবে ঘটবে তা উশ্রীর মনে হয় নি। এ আশংকা থাকলে সে নিজেকে যথা সময়ে গুটিয়ে ফেলত। ও পক্ষকেও ঠিক সময় সাবধানতার ইঙ্গিত দিত। নিজের বিবেক অথবা বাইরের দুনিয়ার কাছে কোনোরকম জবাবদিহির অবকাশ রাখত না।

তবু অস্বীকার করা যায় না ব্যাপারটা যেভাবে এগিয়ে চলেছিল, এবং যতখানি অস্বাভাবিক পথ ধরে, তাতে মুহূর্তের নিশানায় সব ওলটপালট হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। হলোও তাই, অথচ উশ্রীর কাছে এটা তার জীবনের সঙ্গে জড়িত একটি দুঃখ পরিবেদনা ও লজ্জাভরা আকস্মিক ঘটনা।

রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। এখন সময় পৌনে দশটার মতো। ন'টা পঁচিশের পর উশ্রী আর ঘড়ি দেখে নি। তারপর থেকে সময়টাকে সে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চলবার অধিকার দিয়েছে। আগামীকাল সকাল আটটা পর্যন্ত তার কোনো ব্যস্ততা নেই। তবু ইতিমধ্যে বারকয়েক মনে হয়েছে আর একবার হাসপাতাল ঘুরে আসে। আগের মতো এবারও দেখা না হলে বাইরে থেকে খবর নেয়, বেঁচে আছেন তো তিনি !

চেম্বারেই বসে রয়েছে উশ্রী, এত রাতেও অফিস বন্ধ করে ভেতরে যায় নি। বড় মেয়ে কাবেরী ফাঁকা ঘর দেখে একবার এখানে এসে ঢুকেছিল। উশ্রীর হুকুম, 'বাইরের লোকজন থাকলে যতই দরকার হোক অফিসঘরে আসবে না। খুব বেশি হলে কাগজে লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

উশ্রীর এ নির্দেশ বাড়ির সবাই মেনে চলে। এমনকি স্বামী ভাস্কর যখন

এখানে এসে দু-একদিন থাকে, সে অবধি। উশ্রীর স্বতন্ত্র সত্তার দিকে ভাস্কর কখনো হাত বাড়ায় নি। এ অবশ্য তার সমীহ মনোবৃত্তি নয়, দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক রীতিনীতির প্রতি অনীহা, তবু যে সূত্রেই আসুক, বিবাহিতা তরুণীর কোনো অবরোধ উশ্রীকে একটি দিনের জন্যেও ভোগ করতে হয় নি। পত্নিত্বের বন্ধনে থেকেও সে সবদিক দিয়ে নিজের কাছে অবারিত। সর্বত্রই স্বাধীন।

'মা, সাড়ে ন'টা তো বাজে, ভেতরে আসবে না?' বাইরে থেকে একবার উঁকি দেবার পর কাবেরী ঘরে ঢুকেছে।

অন্যমনস্কভাবে উশ্রী প্রশ্ন করেছে, 'খাওয়া হয়েছে তোমাদের?'

'না।'

'মাস্টারমশাই পড়িয়ে চলে গেছেন?'

'সে তো অনেক আগেই!' কাবেরীর গলায় বয়েসের উপযুক্ত বিরক্তির মৃদু আঁচ। প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরও ক্ষীণ কষায়িত চোখে সে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

উশ্রীর অন্যমনস্ক মন ও প্রহারাবিহীন দৃষ্টিতে কাবেরীর কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টির উত্তাপ ধরা পড়ে নি। সে শান্তভাবে বলেছে, 'তুমি তাহলে তারিণীকে বলো তোমাদের খেতে দিয়ে দেবে। আমার খাবার রাখতে বারণ করো, খিদে নেই। তোমরা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়, আমার আসতে দেরি হবে, অনেক কাজ আছে।'

কাবেরী বোধহয় কথাটা শুনে একটু অবাক হয়েছে। কারণ তখন সে উশ্রীকে কোনো কাজ করতে দেখে নি। উশ্রী নিশ্চুপ বসে। ঘরে কোনো মক্কেল নেই। মুহুরীও না। মুহুরী এ সময় আসে না।

অ্যাডভোকেট উশ্রীর চেম্বারে দিনেরবেলাই যত ভিড়। অনেক সময় ঘরের যতগুলি চেয়ার আর মুহুরীর সতরঞ্জি ঢাকা তক্তাপোশেও কুলোয় না। উৎকণ্ঠাগ্রস্ত প্রতীক্ষমান মক্কেলরা বাইরের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করে, কতক্ষণে মুহুরী এসে চেম্বারে ডেকে নিয়ে যায় এবং তাদের ভাগ্যে উশ্রীর কাছে নিজেদের আর্জি আবেদন পেশ করার অবসর ঘটে। মাঝে মাঝে ঐ ভিড় যেন অবৈতনিক হাসপাতালের আউটডোরকে পর্যন্ত

ম্রিয়মান করে তোলে।

কিন্তু সন্ধ্যের পর কেউ একটা আসে না, কারণ তখন উশ্রী কাজ করে না। কাজের চাপ বেশি থাকলে একা বসেই মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখে, আইনের বই ঘাঁটে। নজির খোঁজে। আর প্রয়োজন বোধ করলে চেম্বার সংলগ্ন ঘরটাতে গিয়ে ডিভানের ওপর গা এলিয়ে বিশ্রাম নেয়। তখন বাইরে থেকে চেম্বারে ঢোকার দরজাটা ভেজিয়ে দেয় সে। অর্থাৎ সে সময়ও সবার পক্ষেই চেম্বারে ঢোকা নিষেধ।

উশ্রী তখনো বসে, চেম্বারের দরজার একটা কপাট ভেজানো। দরজার গায়ে আধ-গোটানো নীল রঙের পর্দা। সাধারণ জীন কাপড়, ধুলো জলের এবং বিভিন্ন হাতে ছোঁয়ার অনেক ধকল সইতে পারে। অধিকাংশ সময়ই পর্দাটা সম্পূর্ণ টানা হয় না, শুধুমাত্র এক নিয়মের বাঁধের মতোই টাঙানো রয়েছে। যেতে আসতে পর্দাটা গায়ে ঠেকে গেলে উশ্রীর গা ঘিন ঘিন করে। ওটা সরিয়ে দিলেই হয়, তবু সরানো হয় নি।

লোহার ফটকে কেউ হাত ছুঁইয়েছে, ফটক খোলার শব্দ শোনা গেল। বাড়িতে আজ ডাকাত পড়লেও অবাক হবার নেই। আজকাল এ শহরে প্রায়ই সন্ধ্যেরাতে ডাকাতি। সন্ধ্যে সাতটা আটটা। দিনতুপুরেও। অ্যাড-ভোকেট উশ্রী মুখার্জী জানে শহরের ক্রাইম পজিশান দিন দিন কি পরিমাণ আশংকাজনক হয়ে উঠছে।

প্রায় প্রতিদিনই উশ্রীকে তুটো একটা ডাকাতি কেসের জামিন মুভ করতে হচ্ছে। সবাই কি নিরপরাধ, পুলিশ আর প্রতিবেশীদের আক্রো-শের শিকার ? অধিকাংশই নয়। মক্কেলদের ঘটনার সত্যাসত্য জিজ্ঞেস করতে নেই, উশ্রীও করে না। তাছাড়া বলতে গেলে প্রকৃত ডাকাতের চেহারাই সে অদ্যাপি দেখে নি, তাদের আত্মীয়স্বজন মোকদ্দমার কাগজ-পত্র নিয়ে আসে, এফ. আই. আর. কেস ডাইরি, টি. আই. চার্ট ; তাই দেখেই কাজ।

মক্কেল মানে কাগজ, কাগজ মানে মোটা টাকার ফী, তাছাড়া আর কিসের সঙ্গেই বা উকিলের সম্বন্ধ। পরে হয়তো কমিটিং বা ট্রায়াল কোর্টে মক্কেলদের দেখতে পায় উশ্রী, কিন্তু তখনো সেই কাগজপত্র আর

টাকা। এই ছুই আসল বস্তুর চেহারা ছাপিয়ে মক্কেলদের পুংখানুপুংখ অবয়ব সে দেখতে পায় না। দেখতে পায় না তাদের চোখ নাক বা মুখের আদল। আসামীর কাঠগড়ার ভেতরে ওদের আধখানা করে শরীর আবছা হয়ে থাকে। তারপর বিচার শেষে কার রেহাই, কার বা ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা, তা সে তাদের চেহারা দেখে ধরতে পারে না।

হাইকোর্টে আপিল পাঠাতে হলে তখনো সেই জাজমেণ্টের কপি। কাগজই বলে দেয় কে নির্দোষ, কে তখনকার মতো দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, আর কার বা সারা ভবিষ্যৎটাই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়ে রইল।

উশ্রীর চেম্বারের দরজার পর্দায় একটা হাত পড়েছে, পর্দার পাশ দিয়ে সাদা পাগড়ী বাঁধা মাথা উঁকি দিয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে উশ্রী প্রশ্ন করল, 'কে ওখানে দাঁড়িয়ে, চন্দ্রদেও সিং ? ভেতরে এস।'

চেম্বারে ঢুকল চন্দ্রদেও সিং, টেবিলের ওপারে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'আমি এইমাত্র হাসপাতাল থেকেই আসছি।'

সহজ জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে উশ্রী অকম্পিত স্বরে প্রশ্ন করে, 'সাহেব কেমন আছেন ?'

চন্দ্রদেও সিংএর জবাবী কণ্ঠস্বর কিন্তু সবিশেষ উদ্বেগপূর্ণ, এবং অকারণেই অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত, 'অপারেশন করে কাঁধের ওপর থেকে একটা গুলি বার করেছে। হাত ছুটো আর পায়ে প্লাস্টার হয়েছে। ছুটতে গিয়ে চেয়ারে হুমড়ি খেয়েছিলেন।'

উশ্রীর মুখ গম্ভীর, মক্কেলের ফাঁসির রায় শোনার পরও যেমন নির্লিপ্ত থাকে তেমনি নির্বিকার, তুঃখ বা চিন্তার রেখা শূন্য মুখাবয়ব, এবং চোখের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি। সে প্রশ্ন করে, 'সাহেব বেঁচে আছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

স্বল্পশিক্ষিত চন্দ্রদেও সিং ধরতে পারে না, কিন্তু উশ্রীর পরবর্তী জিজ্ঞাসায় বুঝতে পারা যায় তার মনের ভেতরটা কতখানি অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন, 'বাঁচবেন ?'

চন্দ্রদেও সিং ম্লান হাসল, আকাশের দিকে একটা আঙুল তুলে দেখাল সে। অর্থাৎ, ঈশ্বর জানেন!

সাবেকী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর সুদৃশ্য কলমদানী, তা থেকে একটা লাল-নীল পেন্সিল তুলে নিয়ে মাথা নিচু করে ব্লটিং কাগজ মোড়া ডেস্ক প্যাডের গায়ে আঁচড় কাটতে কাটতে উশ্রী মৃদু ও ইতস্তত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে, 'তোমার সঙ্গে সাহেবের দেখা হয়েছে? মানে, অপারেশনের পর তুমি তাঁকে দেখতে পেয়েছ?'

ঘাড় নাড়ল চন্দ্রদেও সিং, তাতে হ্যাঁ অথবা না, উভয়ই অনুমিত হতে পারে। অর্থাৎ সে নিজেই যেন এ প্রশ্ন সম্পর্কে স্থিরসিদ্ধান্ত নয়। বলে, 'অপারেশনের ঘর থেকে বার কবে ট্রলির ওপর শুইয়ে রোগীকে যখন কেবিনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন দূর থেকে দেখেছি। কাছে কাউকে যেতে দেয় নি, কেবিনেও ঢুকতে দেয় না দিদি।'

চন্দ্রদেও সিংএর এই জবাব এবং পূর্ববর্তী তথ্য পরিবেশনের মধ্যে উশ্রী খানিকটা অসামঞ্জস্য দেখতে পায়, বিরক্তি গোপন, কিন্তু সন্দিগ্ধস্বরে সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তো কাছে যেতে পাব নি, তবে এত সব খবর পেলে কোথায়?'

চন্দ্রদেও সিং এবাব আনিত সংবাদের সত্যাসত্যের দায় জনসাধারণের ওপর ন্যস্ত করে, 'সবাই বলাবলি করছে।'

'কে কে ছিল সেখানে?' তীক্ষ্ম রশ্মি-রজ্জুতে উত্তরদাতার দৃষ্টি নিজের দৃষ্টির সঙ্গে বেঁধে রেখে উশ্রী প্রশ্ন করে।

উকিলের জেরা! চন্দ্রদেও সিংএর মনের গোপনাংশে হাসির উদ্রেক হয়। জেবা করার জন্যে তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে সারাদিন ধরে সে জবাব দিয়ে যেতে পারে। পঁয়ত্রিশ বছর কাছারিতে চাপরাশিগিরি করে কত তুঁদে উকিলের জেরা শুনেছে সে। শুনে শুনে একটা আন্দাজ হয়ে গেছে, কি প্রশ্নের কি উত্তর দিলে আইন সন্তুষ্ট এবং উকিল জব্দ হয়।

আজ অবশ্য চন্দ্রদেও সিংএর এই উকিল দিদিটিকে জব্দ করার তিলমাত্র ইচ্ছে নেই। উকিল দিদি তাকে হাসপাতালের খবর নিয়ে একবার

আসতে বলেছিল, চুপি চুপি একপাশে ডেকে। সবার চোখ আর কান বাঁচিয়ে। অনুরোধে পড়েই সে এত রাতে এ বাড়িতে এসেছে। উকিল দিদির মনের ভেতরটা কি যে হচ্ছে তা চন্দ্রদেও সিং ভালই জানে। হাসপাতালে গিয়ে কতক্ষণই বা ছিল উকিল দিদি, জোর পনেরো মিনিট, কিন্তু সেই সময় প্রায় একশ'টা লোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তীর তাকে যে ভাবে বিঁধে রেখেছিল তা দেখে মায়া হয়। ঐ দৃষ্টির ঘায়ে বিব্রত হয়ে সে বাড়ি পালিয়ে এসেছে, কিন্তু মনটাকে হাসপাতালের চৌহদ্দি থেকে সরিয়ে আনতে পারে নি। সাহেবের কাছে না যেতে পেরে তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা যেন সাহেবের গায়েই সেঁটে রয়েছে।

এদিন আসবে তা চন্দ্রদেও সিংএর জানা ছিলো, কিন্তু নিজের পদের ওজন ছাপিয়ে ওপর মহলে সাবধানতার ইঙ্গিত পৌঁছে দিতে পারে নি। বড়রা বিপদে পড়লে ছোটদের আপন বিবেচনা করে। বিপদ দুর্যোগ না আসা পর্যন্ত তারা অন্য জগতের অধিবাসী, চন্দ্রদেও সিংএর মতো আদালতের পিওনজাতীয় মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই উশ্রী আবার নিজের চোখের দৃষ্টি নিরুদ্বেগ ও নিরুদ্বিগ্ন করে নেয়, ততক্ষণে চন্দ্রদেও সিং জবাব দিচ্ছে, 'সব হাকিম আর অনেক উকিল তো এসেইছেন, বড় জজ সাহেবও ট্যুর থেকে ফিরে খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গেছেন। ডাক্তার এসে তাঁদের কাছে রিপোর্ট দিলেন আমিও শুনলুম, তারপর আপনাকে খবর দিতে এসেছি।'

'তুমি এখন কোথায় যাবে?' অহেতুক একটা ছোট্ট হাই তুলে উশ্রী প্রশ্ন করল।

একটু চিন্তার ভাব দেখাল চন্দ্রদেও সিং, তারপর থেমে থেমে বলল, 'হাসপাতালেই যাব।'

অনুরোধ অথবা আদেশ নয়, সাধারণভাবে উশ্রী জানতে চায়, 'কাল সকালে এসে একবার খবর দিয়ে যেতে পারবে?'

চন্দ্রদেও সিং ঘাড় নাড়ল, মনে মনে বলল, পাপের সাজা ভোগ কর! মুখে বলল, 'হ্যাঁ।'

'দাঁড়াও একটু।' বাঁ দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে উশ্রী টেবিলের দেরাজ

টানে, তারপর দেরাজের ভেতরেই হাত গলিয়ে ব্যাগ খুলে একটা দশ টাকার নোট বার করে চন্দ্রদেও সিং এর দিকে বাড়িয়ে দেয়, 'এটা রাখো, রিক্সা ভাড়া ; বারবার তোমায় আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে?' টাকা নিল না চন্দ্রদেও সিং। 'আমি তো সাইকেলে এসেছি।'

উশ্রী তবু চন্দ্রদেও সিংএর দিকে নোটখানা বাড়িয়ে রাখে, 'তবে চা-টা খেও, তোমায় রাত জাগতে হবে?'

'পরে চেয়ে নেব দিদি।' ডান হাতখানা একটুখানি তুলে সেলাম জানিয়ে চন্দ্রদেও সিং চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ক্লক টাওয়ারের ঘড়িতে সংকেত পড়ল, রাত সাড়ে দশটা। এখান থেকে ক্লক টাওয়ারের দূরত্ব এক মাইলের ওপর, রাতের নিস্তব্ধতা আওয়াজ-টাকে এতদূর টেনে এনেছে! দিনেরবেলা শোনা যায় না।

এমনকি দিনেরবেলা মনের মধ্যে অতিরিক্ত কোলাহলের জন্যে নিজেরই মনের সব চেতনা চৈতন্যেরও সাড়া পাওয়া যায় না। দিনের কোলাহল উশ্রীকে নিজের সঙ্গে কথা কইতে দেয় না। তার সত্তার স্বরূপ প্রতিপক্ষ সুমুখে এসে দাঁড়াবার অবসর পায় না। প্রত্যাশী মক্কেলের মতো সে মনের চৌকাঠের ওপারে থেকে প্রতীক্ষার পল গোণে। রাতটাকেও উশ্রী মনের দিক থেকে মুখর ব্যস্ততায় ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

চেম্বার বন্ধ করে অ্যাডভোকেট উশ্রী মুখার্জি উঠে পড়ল। হাসপাতাল থেকে ফিরে গাড়িটা গ্যারাজে তোলা হয় নি। পোর্টিকোয় পড়ে রয়েছে। বছর দুই আগে ষোলো হাজার টাকায় কেনা মার্ক টু অ্যামবাসাডার। এখনো প্রায় নতুন। দাম হওয়া উচিত ছিল অন্তত বিশ বাইশ হাজার। উশ্রী অনেক কমে কিনেছে। চাইলে হয়তো দশ বারোতেও হয়ে যেত। কিন্তু এত কম দিতে তার নিজেরই লজ্জা হয়েছে। সময় সময় নিজের ক্ষমতার সুযোগ নিতে হয়, কিন্তু মাত্রা রেখে নেওয়াই ভালো। অন্তত বিবেক খানিকটা পরিষ্কার থাকে। প্রতিটি দিনের যা ঘোর প্যাঁচ, তাতে অবশ্য সদাসর্বদা বিবেক পরিষ্কার রেখে চলা অসম্ভব, তাহলে জীবনের গতিই রুদ্ধ হয়ে যাবে, তবু এরই ভেতর যতটুকু সম্ভব, তার প্রয়াস প্রয়োজন।

জীবন মানেই প্রয়াস।

মিথ্যের প্রয়াস। সত্যের প্রয়াস!

মিথ্যের প্রয়াস বর্তমান যুগপরিস্থিতিতে জীবনটাকে সুষ্ঠু ও সম্মানজনক-ভাবে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে। সত্যের প্রয়াস বিবেককে বাঁচিয়ে রাখতে। ওটা একেবারে মৃত বা মুমূর্ষু হয়ে পড়লে জীবনের স্বাদ ঘুচে যায়। যন্ত্রবৎ চলতে থাকা জীবনে সত্যিকার প্রাণের স্পন্দন শোনা সম্ভব নয়।

উশ্রীর চিত্ত সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত হলে আজকের এতবড় দুর্ঘটনা তার মনে কোনো দাগই কাটত না। এই ঘটনায় সে দুঃখিত, ব্যথিত এবং মর্মাহত। সারা শহরের কাছে সে আজ ব্যঙ্গের লক্ষ্যস্থল। তবু মনে হয় এরই জন্যে এ দুনিয়ায় তার অস্তিত্ব আরো বেশি মহার্ঘ্য হয়ে উঠেছে, এবং প্রাণটা তার নিজেরই কাছে অধিক মর্যাদায় ভূষিত হয়ে চলেছে। সকলের তীক্ষ্ম দৃষ্টির শাসন ও আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকা, সে-ও এক ধরনের সৌভাগ্যের নিদর্শন।

হয়তো এর পরবর্তী অধ্যায় উশ্রীর মৃত্যুর সূচনা। অথবা পরিমাণহীন অসম্ভ্রম। পরম খ্যাতির সমানই যার মূল্য, মৃত্যুর পরও যা প্রশমিত হয় না!

২

রোজ যেখানে রাখে, আজও সেখানে গাড়ি রাখল উশ্রী। মিউনিসিপ্যাল অফিস বিলডিং এর দক্ষিণ দিকের ছোট মাঠটায়। ইতিপূর্বে আরও কটা গাড়ি এসে সৌধ আর গাছের ছায়া দখল করে ফেলেছে। পৌঁছতে দেরি হয়ে গেলে এমনিই হয়। কৃষ্ণচূড়া গাছটাকেই পছন্দ করে উশ্রী, কিন্তু এর নিচে মাত্র খান-তিনেক গাড়ির জায়গা। বাকি আটটা আশেপাশে দাঁড়ায়। কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় জায়গা পেতে হলে পৌনে এগারোটার মধ্যে আসা দরকার। ও জায়গাটায় সবারই লোভ।

মোট এগারোখানা গাড়ি, অ্যামবাসাডার আর ফিয়াট। সবই উকিলের।

একদিন গাড়ি রাখতে এসে প্রায়-প্রবীণ অ্যাডভোকেট রামশরণ শর্মা উশ্রীকে বললেন, 'আপনি আমাদের মতন রোদ-জলে গাড়ি রেখে নষ্ট করেন কেন, আমরা নয় নিরুপায় ?'

'তবে কোথায় রাখব ?' মৃদু হেসে উশ্রী প্রশ্ন করে। তারপর উত্তরের জন্যে অপেক্ষার অবসরে কালো কোটের নিচে স্টীফ কলারের খাঁজে বাঁধা অ্যাডভোকেটস্ ব্যাণ্ডের ফিতেটা নেড়েচেড়ে ঠিক করতে থাকে।

জানলার কাচগুলো তুলে দেওয়ার পর গাড়ির দরজা লক্ করেন রামশরণ শর্মা, তারপর বলেন, 'সিভিল কোর্ট কম্পাউণ্ডে জুডিসিয়াল অফিসারদের জন্যে বারোটা গ্যারাজ, তার দুটোর বেশি কখনোই ভরে না। বাকি দশটা খালি। চল্লিশজন হাকিমের মধ্যে মাত্র দুজনের গাড়ি। গাড়ির লাকসারি ওঁরা ভাবতেই পারেন না।

রামশরণশর্মা বিরতি দিতে মৃদু হেসে উশ্রী সমর্থন দেয়, 'তা যা বলেছেন আপনি !'

উশ্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রামশরণ শর্মা তার হাসির গায়ে নিজেরও এক পরত হাসি সম্মিলিত করেন, 'আমাদের প্রতি ওদের প্রচণ্ড ঈর্ষা। They are very much jealous about status and income of lawyers ; এ তো জানেন না, কত সংগ্রামের পর তারা দাঁড়াতে পারে। সবাই কি, কেউ কেউ। ওকালতি পেশার মাউণ্ট এভারেস্টে উঠতে গিয়ে শতকরা নব্বইজন ব্যর্থতার গ্লেসিয়ারে জমে বরফ হয়ে থাকে। অধিকাংশই তো জ্যোতিষীর কাছে চক্ পেতে আর স্বপ্ন দেখে সারা জীবনটাই কাটিয়ে দেয় !' হঠাৎ যেন প্রসঙ্গ স্মরণ হয়, শেষ কথায় একটা সজোর পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে তিনি উশ্রীকে উপায় প্রদর্শনের প্রয়াস করেন, 'ইয়েস, আপনাকে যা বলছিলাম, একটা ব্যবস্থা করে আপনি তো সিভিল-কোর্ট গ্যারাজেই গাড়ি রাখতে পারেন, ওখান থেকে কোর্ট বিলডিংও কাছে ? এমন এক জায়গায় গাড়ি রেখে তারপর সিকি মাইল হাঁটারও বালাই নেই !'

পাশেই রাস্তা, ওপারে পুরনো বার লাইব্রেরি, রামশরণ শর্মার পাশাপাশি সেদিকেই উশ্রী হাঁটছে ; ঈষৎ অন্যমনস্ক স্বরে সে প্রশ্ন করে বসে, 'আমি

চাইলেই বা ও গ্যারেজে গাড়ি রাখতে দেবে কেন ?'

'কোনো না কোনো অফিসার এ ব্যাপারে আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আমাদেরসে সুযোগ কোথায়? We have no such approach;'

'রামশরণ শর্মার মুখে বিশেষ ধরনের অর্থবহ হাসি, 'অন্তত আপনি চেয়ে দেখতে পারেন।' বার লাইব্রেরির পঁয়তাল্লিশ ফুট দীর্ঘ সিঁড়িতে উশ্রীর একান্ত পাশাপাশি উঠতে উঠতে তিনি কথা বলেন।

'আচ্ছা—।' এখানেই আকস্মিকভাবে জবাব শেষ করে দেয় উশ্রী, তারপর রামশরণ শর্মাকে এড়িয়ে প্রায় জোড়া পায়ে বাকি তিনখানা সিঁড়ি উঠে বারান্দার একপাশে জলের ঘরের দিকে চলে যায়। মনে হয় হঠাৎ যেন সে খুব পিপাসার্ত হয়ে পড়েছে, পা'দুটোও অকস্মাৎ যেন খুব দুর্বল বোধ হচ্ছে।

বার লাইব্রেরির উত্তর দিকের বারান্দার পশ্চিম কোণে পানশালা। ঘরে ঢোকা নিষেধ। ঢুকতে হলে জুতো খুলতে হয়। দরজার বাইরে পাশাপাশি তিনখানা চেয়ার। দুটো খালি। একটাতে বসে মদিরাপাত্রে চুমুক দেওয়ার মতো ধীর বিরতি এবং পরিতৃপ্তির সঙ্গে জলের গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন ষাটোত্তীর্ণ অ্যাডভোকেট বাবু প্রদীপ সিং। রিটায়ার্ড ডিসট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসন্‌স্ জজ। প্রায় বছর তিন অবসর নিয়েছেন। তারপর ওকালতি আরম্ভ। ইতিমধ্যেই খ্যাতির শিখরের উদ্দেশে রাঠোর রাজপুত খুব জোর কদমে ছুটে চলেছেন।

প্রদীপ সিংএর পাশের চেয়ারে বসে এক গেলাস জল চাইল উশ্রী, 'কেশোরাম, পানি এক গিলাস।'

'লিজিয়ে পানি দিদি, ধরিযে।' চক্‌চকে কাঁসার গেলাসে জল এগিয়ে দিল কেশোরাম।

জলের গেলাস মুখে তুলে উশ্রীর মনে হলো, সত্যিই কি সে পিপাসার্ত হয়েছিল, না রামশরণ শর্মার সঙ্গ ও গায়ে পড়া উপদেশের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গময় হুল এড়াবার জন্যে এখানে পালিয়ে এসে বসেছে ? জল খেতে খেতে সে একবার আড়চোখে বাবুসাহেবের দিকে তাকাল। অভিজাত রাজপুত মাত্রেই বাবুসাহেব।

এ কোর্টে পাঁচ'শ সাতচল্লিশটি উকিলেব মধ্যে বাবুসাহেব অন্তত বিশ জন। অধিকাংশই প্রথমাবধি ওকালতি করছেন। একজন বাবুসাহেব এসেছেন অবসরপ্রাপ্ত দারোগা। সাব ইনস্পেকটর অথবা ইনস্পেকটর ছিলেন। ওকালতির বয়েস তাঁর বছব সাত, কিন্তু দেড় ডজন দালালের সাহায্যে পেশা বেশ জমিয়ে ফেলেছেন। পসার বেড়েছে, কিন্তু মর্যাদা বাড়ে নি। বিভিন্ন প্ররোচনার আড়কাঠি পেতে মক্কেল ধরে নিয়ে যাবার সময় দালাল ভক্তারাম বলে, 'ওকিলসাহেব জজসাহেবকা জিগরি দোস্ত্, বোজ সন্ঝামে দোনো একসাথ বৈঠকর শরাব পীতে হেঁ, ঔর—সমঝলো, য়হ সব বাত কহা নঁহী যায়! মেরে ওকিলসাহেব সীর্ফ ওকিলহী নঁহী, পুলিশ এস.পি । অভীতক্ সব দাবোগা উনকে ডেরে মে দরবার লগাতে হেঁ।

প্রকৃত বাবুসাহেব পরিচয়ে একমাত্র প্রদীপ সিং। বাবুসাহেব মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, 'কেমন আছেন মিসেস মুখার্জী?'

'প্রণাম!' উশ্রী তাড়াতাড়ি মুখের কাছ থেকে জলের গেলাস সবিয়ে জবাব দেয়। তারপর বলে, 'আপনি ভালো আছেন তো স্যার?'

বাবুসাহেব হাসেন, 'কি করে বলি? বেসের ঘোড়া যতক্ষণ ছুটতে পাবে ততক্ষণই ভালো, নয়তো একবার যদি মুখ থুবড়ে পড়ে, He becomes absolutely a legend , উপকথায় পরিণত! যাহোক আমি কিন্তু নিজেকে সব সময় গামা পালোয়ান মনে করি। শরীরের যন্ত্রপাতি কে কিভাবে চলছে তা নিয়ে মোটেই ওয়ারিড্ নই।'

জল খাওয়া শেষ করে বাবুসাহেব উঠলেন। এজলাসে যাবেন এবার। আবার দেড়টা নাগাদ এসে এই চেয়ারে বসবেন। প্রায় দুটো পর্যন্ত বসে সুদীর্ঘ সময় নিয়ে এক গেলাস জল পান করবেন। তারপর আবার এজলাস। আপিলের সওয়াল। কিংবা টাইটেল সুট মানি সুটের সাক্ষীর জেরা। প্রতিটি প্রশ্ন ধীর, একাগ্র এবং অব্যর্থ। বিপক্ষের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ যুদ্ধে একই রীতি। প্রতিপক্ষের ক্রোধ মন্তব্য ও শ্লেষ খুব সহজ আয়াসে গ্রহণ করেন বাবুসাহেব 'I feel very much obliged. I have yet to learn many things from you. আপনার কাছে

আমার অনেক কিছু শেখার আছে।'

এই চেয়ারে বসে থাকতে থাকতেই উশ্রীর তারা সেনের সঙ্গে চোখা-চোখি হলো, আজ বোধহয় আসতে দেরি হয়ে গেছে, ব্যস্ত পদক্ষেপে কমিশনারেব কোর্টের দিকে ছুটেছেন। ভাগলপুর কমিশনারি, শুনতে অনেকখানি, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দুটিমাত্র সাবডিভিশান নিয়ে ডিসট্রিক্ট কোর্ট।

কমিশনাবের এজলাসে কটা আর মোকর্দমা? তাও সেখানে হাতে গোনা পাঁচ সাতটি উকিলেব মনোপলি। সাঁওতাল পরগণাব আদিবাসী জেলা-কোর্ট থেকে যা কাজ আসে তা প্রায় তাঁদেরই এলাকায় সীমাবদ্ধ, অন্যত্র যায় না বিশেষ। ওদিকে মুঙ্গেব জেলা থেকে মোকর্দমার ব্রীফ, সেখানে মামলাব সঙ্গে উক্ত স্থানেরই উকিলেব শুভাগমন। আর কমি-শনাব কোর্টে যাওয়াব অর্থ—ব্যর্থতাব ফলপ্রাপ্তি। Justice delayed is justice denied. দেরির বিচার আইনেব ব্যভিচার!

কমিশনার নিরুপায়, বাজ্যে তেত্রিশটি মন্ত্রী, প্রতিদিন প্রত্যূষে হাওয়াই আড্ডায় দৌড়ে তাঁদের কাউকে না কাউকে স্বাগত করে আনার পর এজলাসে বসাব অবসর বিশেষ থাকে না। মন্ত্রী-পূজায় অনীহা দেখা গেলেই বিভাগীয় শাসনকর্তাব পথ থেকে অপসৃত হয়ে মহাকরণের ফাইল অধ্যুষিত পাঁচ ফুট বাই পাঁচ ফুট বদ্ধ শেলের অভ্যন্তরে বাকি চাকরি জীবনের কালাতিপাত। প্রকৃতপক্ষে ছোট জেলা আদালতের এইটুকু গণ্ডির ভেতরই প্রায় সাড়ে পাঁচশ' উকিলেব ভিড়।

উপরন্তু বার-এর চেহারা এখন ধর্মধ্বজীদের পিঁজরাপোল। অবসরপ্রাপ্ত অকর্মণ্য গরুগুলোকে যেমন সেখানে ভর্তি করে দেওয়া হয়, তেমনি প্রায় সব রকমের জীবিকাক্ষেত্র থেকে অবসর পাওয়া মানুষ গলায় ব্যাণ্ড আর গায়ে কালো কোট ঝুলিয়ে এখানে এসে জমে বসেছে।

বার লাইব্রেরির চেহারা দেখলে উশ্রীর গোশালার কথাই মনে হয়। কালো কোটের ভিড়ে আজও মাঝে মাঝে তার মাথা ঝিমঝিম করে, মনে হয় পচা আনাজের গুদোমের ভেতর গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। এবং মনে হওয়া মাত্রই সমগ্র শরীরে অস্বস্তির আনচানানি। উশ্রীর নিজের

জীবনে সর্ববিধ আয়োজন বেড়েই চলেছে, তবু মনের বিবাগী মুহূর্তে ইচ্ছে হয় সব ছেড়েছুড়ে এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। মান বাঁচায়!

৩

শখের বশেই উশ্রীর ওকালতি পরীক্ষা পাস। দুপুরটা নির্জন বাড়িতে একা একা কাটাতে ভালো লাগে না, তাই পঁচিশ টাকার লাইসেন্স নিয়ে পেশায় ঢুকে পড়া, তখন উপার্জনের চিন্তাটা মুখ্য ছিল না।
পাটনা হাইকোর্টে কয়েকজন মহিলা অ্যাডভোকেট, দুটি ব্যারিস্টার। কিন্তু এ প্রদেশে উশ্রীই জেলা কোর্টের সর্বপ্রথম মহিলা উকিল। বয়েস চব্বিশ। বিবাহিতা। যমজ সন্তানের মা ; সুদীপ্ত আর কাবেরী। তাদের বয়েস এক বছর। যমজ বলেই স্বামী ডাক্তার ভাস্কর মুখার্জি দিনরাতের জন্যে সুপটু এবং স্বল্পশিক্ষিতা পরিচারিকা রেখে দিয়েছে।
পরিচারিকা কল্যাণীর বয়েস চল্লিশের নিচে। স্কুলে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর বিয়ে। একটি কন্যা-সন্তান, মেয়েটি সাত বছর বয়েসে টাই-ফয়েডে মারা যায়, এবং কিছুদিন পরেই রাজ্য পরিবহনের কন্‌ডাকটর স্বামীর বাস অ্যাকসিডেণ্টে অকাল মৃত্যু। কল্যাণীর সরকারি অনুদানের টাকা, তা নিয়ে ভাই অমল ব্যবসায় নেমেছিল, সুদ অথবা মূল কিছুই ফেরৎ আসে নি। অমলও ফেরে নি।
উপযুক্ত অভিভাবকহীন সংসারে অল্প বয়েসী বিধবার যা বিধিলিপি কল্যাণীর ক্ষেত্রেও তার অন্যথা নেই। তারপর আরও কয়েকটি তিক্ত অভিজ্ঞতার ঘাট মাড়িয়ে উশ্রীর সংসারে এসে ঢুকেছে সে। তার অনা-কাঙ্ক্ষিত মাতৃত্বের দায় বে-আইনীভাবে মুক্ত করে দিয়েছিল ভাস্কর, উশ্রী অবশ্য সে কথা আজও জানে না। তাকে জানালে লজ্জামৃতা কল্যাণীকে এ সংসারের দায় ঠেলার জন্যে পাওয়া যেত না।
কালো কোট পরে কাছারি এসেছে উশ্রী। চব্বিশ বছরের সুন্দরী তরুণী যেদিন বার লাইব্রেরির সভ্যা হয়ে সেনট্রাল হলে উকিলের চেয়ারে

বসেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই পাঁচশ' জোড়া বিস্ময়পূর্ণ চোখের পাহারা-ঘেরা অবস্থা। তার সিনিয়ার খ্যাতনামা বৃদ্ধ উকিল ধীরেন গুপ্ত। তিনি তখন অবসর সন্ধানী, কোনোদিন কাছারি আসেন, কোনোদিন আসেন না। ধীরেন গুপ্তর কাছে শিক্ষানবীশ উশ্রীর স্থিতির নির্ধারিত মেয়াদ সাত-আট মাস, সেই শর্তেই তিনি তাকে নিজের চেম্বারে জায়গা করে দিয়েছেন।

স্পষ্ট উচ্চারণে খুব কাটা কাটা ভাষায় কথা বলেন ধীরেন গুপ্ত ; 'You must take chance with some other senior within the remaining days of this year, because I am retiring from the first day of January of the next year after fifty-five years of practice, when I shall be an old mummy of eighty ; অতএব তোমায় ইতিমধ্যে সব ব্যবস্থা সেরে রাখতে হবে, কারণ পঞ্চান্ন বছর ওকালতির পর এই মমিটার আর কোনো গুণই থাকবে না। আগামী বছরের পয়লা জানুয়ারী থেকে আমার অবসর-কাল আরম্ভ হবে।'

পরবর্তী ব্যবস্থা উশ্রীর আগেই স্থির হয়েছিল। সিনিয়ার অ্যাডভোকেট পরেশ বসু তাকে সরাসরি নিজের চেম্বারে নিতে চান নি। বার-এর সব উকিল আর শহরভর্তি হাকিম পেশকার কোর্টপেয়াদা মুহুরী দালাল ও মক্কেলদের অনভ্যস্ত চোখে ব্যাপারটা সন্দেহজনক ও রসসিক্ত ঠেকতে পারে।

ধীরেন গুপ্তর কথা শুনে উশ্রী সম্মতি জানায়, 'আপনি রিটায়ার করার পর আমি আর নিজেকে আপনার চেম্বারে রাখার কথা বলব কেন ?' তারপর ভবিষ্যত ব্যবস্থার কথা চেপে রেখে বলে, 'কিন্তু তখন যদি আইন সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু শিখতে বা জানতে আসি—'

মাঝ পথেই ঘাড় নাড়েন ধীরেন গুপ্ত। 'নো, তখন আমি গীতাটিতা পড়ব, Few days for accumulating the means of salvation ; মরণের পর মুক্তির উপায় তো করে রাখতে হবে ? একত্রিশে ডিসেম্বর আমার দু'ঘর ভর্তি আইনের বই, আলমারি ফারনিচার সব তোমায়

দিয়ে দেব।'
উশ্রী মৃদু আপত্তি করে, 'আমায় কেন দিতে যাবেন?'
সে প্রশ্নের জবাবস্বরূপ ধীরেন গুপ্ত বলেন, 'তারপর থেকে আমার আপিসঘরে ধর্মচক্র বসবে। I shall try to create and put faith in Paramhansa or Aurabindo ; হয় পরমহংসদেব অথবা শ্রী-অরবিন্দে আত্মসমর্পণ! আমার বিশ্বাস এ প্রচেষ্টা অসার্থক হবে না। ওঁদের সব বই আনিয়ে রেখেছি, এখনো খুলে দেখি নি, ফার্স্ট জানুয়ারী থেকে পড়া আরম্ভ করব, আইনের ব্যাপারে যেমন ছিলাম ঠিক তেমনি, with all earnestness, as I am still a student of law; তোমায় যদি আমার উপদেশ দেবার অধিকার থাকে তবে একটা মাত্র অভিজ্ঞতার কথা বলব, এতখানি জীবনে অনেক রকম বিবর্তন দেখলাম, কিন্তু একটি জিনিস বদলাতে দেখলাম না, That is sincerity ; আন্তরিকতা শব্দ এখনো প্রাচীন মূল্য নিয়ে ঠিকই টিঁকে রয়েছে। এর সংজ্ঞার্থে কোনো পরিবর্তন হয় নি।
প্রথম দিন বার লাইব্রেরিতে আসার পব সেণ্ট্রাল হলে ধীরেন গুপ্তর পাশের চেয়ারটাতে বসেছে উশ্রী, কয়েকশ' জোড়া চোখের বিভিন্ন রকম দৃষ্টিতে মনের কোথায় যেন খানিকটা অস্বস্তির পীড়ন অনুভূত হচ্ছে। তবুও উপলব্ধি, এই মুহূর্ত থেকেই তার জীবনের ভিন্ন ক্ষেত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শুরু। অপরিচিত এক নতুন জগতে সদ্য পদার্পণ। এই চিন্তার দরুণ ও নবীন পর্যায়ের পুলকানুভব।
ইতিমধ্যেই উশ্রীর অন্তঃকরণে এক ধরনের স্বাধীনতার স্পন্দনানুভূতি আরম্ভ হয়ে গেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মল্লভূমিতে কবে তার নিজের প্রতিষ্ঠার শিলান্যাস হবে সে চিন্তাও বারবার মনের ভেতর উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। আশংকাও পরিতৃপ্তির যুগল ভাবানুভব তাকে এক আচ্ছন্না-বস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়! আইন কলেজে পড়ার সময় অধ্যাপক নারায়ণ সিন্‌হা প্রায়ই বলতেন, 'No doubt bar is very much crowded, but position at the top remains always vacant ; ওকালতিতে যতই ভিড় হোক, ওপরটা চিরদিনই শূন্য হয়ে রয়েছে।'

প্রায় বিশ মিনিট বিশ্রাম করার পর ধীরেন গুপ্ত বললেন,'চল উশ্রী, এবার তোমায় কয়েকজন Dying out senior, coming to lime light mid-senior and rising junior, অর্থাৎ কেউ ফুরিয়ে যাচ্ছে, কেউ খ্যাতির মধ্যপথে রয়েছে, কেউবা সবেমাত্র উন্নতির পথে পদার্পণ করেছে, এমন জন কয় উকিলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি'। পরিচয় হলে তুমি বিশেষ লাভবান হবে। এঁদের ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা সারাক্ষণই আইন। Law is a jealous mistress ; ঈর্ষাপরায়ণা প্রণয়িনীর মতো, তাকে সঙ্গে রেখে অন্যকিছু করার উপায় নেই।'

উপমা শুনে উশ্রী মৃদু হাসল।

ধীরেন গুপ্ত আবার বলেন, 'সত্যিকার ওকালতি করতে বসে আর কিছু করা সম্ভব নয়। কেউই পারেন নি। Right from Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, C. R. Das, the Nehrus to many others ; তাঁদের সকলেই শেষাবধি পেশা ছেড়েছেন।'

ধীরেন গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন, পরনে সাদা ফুলপ্যাণ্ট, গায়ে চাপকান। এ আদালতে আর মাত্র দু'জন উকিলই চাপকান পরেন। ভানু নারায়ণ ও ফণীন্দ্র ঘোষ। বয়েসের হিসেব ধরলে উভয়েই অস্তমিত প্রায়। তারপর চোগাচাপকানের যুগ শেষ। মাথায় শামলা আর আচকানের ওপর দিয়ে উপবীতের মতো ঘেরা পাকানো চাদরের দিন বহুকাল পূর্বেই ফুরিয়েছে। সে কাল স্বয়ং ধীরেন গুপ্তই দেখেছেন কিনা স্মরণ করতে পারেন না। সেটা উনিশ শতক পর্যন্ত। বড় জোর এই শতাব্দীর প্রথম দু-চার বছর। তিনি এসেছেন উনিশশ'সাত সালে। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ। এর পরেই অতিদ্রুত পায়ে দিন বদলে চলেছে। আর এক পালা বদলের ধাক্কা এসেছে চল্লিশের দশকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব। সমাজ জীবনের অনেক ক্ষেত্র থেকেই আকস্মিকভাবে পর্দা সরে গেছে তখন। পোশাকের চরম বিবর্তনই নয়, পোশাক যারা পরে তাদের চরিত্রেও।

ধীরেন গুপ্তকে নিয়ে অনেক গল্পই প্রচলিত।

ডিসট্রিক্ট জজের কোর্টে রাজ বনেলী স্টেটের প্রবেট কেসে সওয়াল

করছেন ধীরেন গুপ্ত। প্রতিপক্ষের অ্যাডভোকেট প্রখ্যাত সুরজিৎ সিংহ, যিনি দু'বার হাইকোর্ট জজের পদ সবিনয়ে প্রত্যাখান করেছেন। গভর্ণমেণ্ট প্লিডারের পদ ও পদবী জোর করে তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাও বেশিদিন ধরে রাখেন নি। তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্রের দু'জনই উপস্থিত বিভিন্ন প্রদেশে উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি।

পেছনে একজন মক্কেল এসে দাঁড়িয়েছে, সওয়ালে এক মুহূর্তের বিরতি দিয়ে ধীরেন গুপ্ত প্রশ্ন করেন, 'কি ব্যাপার?'

মক্কেল সবিনয়ে বলে, 'হুজুর মুন্সিফ কোর্টে আমার মোকর্দমার ডাক পড়েছে।'

'তুমি হাকিমকে গিয়ে বল টিফিনের পরে রাখতে।' উত্তর দেওয়ার পর ধীরেন গুপ্ত আবার সকর্মে মনোনিবেশের চেষ্টা করেন।

'বলেছিলাম—'

'কি বললেন তিনি?' প্রশ্ন করেন ধীরেন গুপ্ত।

'হাকিম বললেন, ধীরেনবাবু এখন আসতে পারবেন না তো কি হয়েছে? বটতলায় তো ব্যাঙের ছাতার মতন উকিলের আড্ডা; যাও, যে কোনো একটা দু'টাকার উকিল ডেকে নিয়ে এস।'

ধীরেন গুপ্ত নীরব একটু, তারপর বললেন, 'উকিল এত সস্তা, তা তো আমার জানা ছিল না! যাও, এবার তুমি সাহেবকে গিয়ে বল, হুজুর, দু'টাকার উকিল একজনও খুঁজে পাওয়া গেল না, সবাই মুন্সেফির চাকরি নিয়ে চলে গেছেন।'

মক্কেলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আবার ডিসট্রিকট জজের সামনে প্রবেট প্রসিডিং এর সওয়াল আরম্ভ করলেন ধীরেন গুপ্ত।

উশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে ধীরেন গুপ্ত এক এক করে অনেক উকিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সকলেই ত্বরিত দ্রুততার সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান দেখালেন তাঁকে। উশ্রীর পরিচয় করালেন তিনি, 'Srimati Usri Mukherjee the first lady lawyer of district bar in our State, and the last junior to this poor and humble setting Sun; কথা শেষ করার পর নিজের চাপকান আঁটা বুকে

ডানহাতের তর্জনী ঠেকালেন তিনি।

ধীরেন গুপ্ত আবার ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। পাশের চেয়ারে নবীনা উকিল উশ্রী মুখার্জি। বার লাইব্রেরির বেয়ারা লালচাঁদকে দিয়ে ধীরেন গুপ্ত ডেকে পাঠালেন প্রৌঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত অ্যাডভোকেট রাধিকা প্রসাদ পাণ্ডেকে। সেন্ট্রাল হলের দু-পাশে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর। তারই একটায় বসেন রাধিকাপ্রসাদ।

'রাধিকাপ্রসাদ, তুমি আমার প্রথম জুনিয়ার, শ্রীমতী উশ্রী মুখার্জি আমার শেষ জুনিয়ার, তুমিই সবচেয়ে আগে 'সগুন' করাও।'

সবিনয় ব্যস্ততার সঙ্গে রাধিকাপ্রসাদ বললেন, 'এখুনি আসছি স্যার, এক মিনিট।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাধিকাপ্রসাদ ফিরে এলেন, সঙ্গে মুহুরীর হাতে ওকালতনামা। উশ্রীকে দিয়ে একটি ফৌজদারী মোকর্দমার ওকালতনামা সই করিয়ে এগারো টাকা দক্ষিণা দিলেন। তারপর উশ্রীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি আপনাকে আনন্দের সঙ্গে আমাদের মাঝে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি স্যারের জুনিয়ার ছিলাম, তবে আজকাল বেশি ফৌজদারীই করি। যদি এদিকে ইন্টারেস্ট পান আমার চেম্বারে মাঝে মাঝে আসবেন।'

তারপর একে একে অনেক 'সগুন'। অর্থাৎ শুভেচ্ছামূলক সম্মান-দক্ষিণা। কত উকিল মুহুরী আর মক্কেল উশ্রীর হাতে টাকা দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল! উশ্রীর মাঝারি মাপের ভ্যানিটি ব্যাগের গর্ভে জায়গা রইল না আর। বাড়ি গিয়ে গুণে দেখল সাতশ'ছাব্বিশ। প্রথম দিনের উপার্জন! অথচ আজ সবকটি আদালত কক্ষ ঘুরে দেখাই তার শেষ হয় নি।

৪

আটই জুলাই। রাত পৌনে বারোটার মতো। এমন ঘন অন্ধকারময় কালো রাত উশ্রী বোধহয় জীবনে দেখে নি। অথচ আজও একফোঁটা বৃষ্টি নেই। আকাশে মেঘ আছে কিনা অন্ধকার রাতের দরুণ তা বোঝা যায় না। পাঁজিতে কি তিথি লিখেছে কে জানে! অন্ধকারের বহর দেখে মনে হয় অমাবস্যাই হবে। কিন্তু তাহলে আকাশে যে তারার সম্ভার থাকা উচিত ছিল, তা নেই। এতেই মনে হয় উধ্বর্াকাশ মেঘপ্লাবিত। গুমোট বোধ হচ্ছে খুব, বাইরের বারান্দায় বেরিয়েও হাওয়ার স্পর্শ নেই এক ফোঁটা। অসহ্য অবস্থা।

পরিবেশ যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তৈরি; এবার যদি প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাতে সৃষ্টি বাঁচে, এবং তারচেয়ে বড় কথা, উশ্রী বাঁচে।

'মা!'

প্রথমটা উশ্রী শুনেও সাড়া দিল না, বাইরের বারান্দায় যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, রেলিং-এ ভর দিয়ে, ঘন অন্ধকারময় আকাশের দিকে তাকিয়ে, শুধুমাত্র নিজের মনের আংশিক অন্যমনস্কতা এবং অনন্ত আকাশের এ অর্থহীন শূন্যতাকে আশ্রয় করে, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু উশ্রী জানে বেশিক্ষণ এভাবে তার থাকার উপায় নেই। বারো বছর বয়েসের যমজ সন্তান দীপ্ত আর কাবেরী বেশ বশ হয়েছে, তার শাসন আর অনুশাসন মেনে নিয়েছে, কিন্তু তাদের কনিষ্ঠ তাপ্তীর সঙ্গে সে আজও পেরে ওঠে নি। দীপ্ত বা কাবেরী হলে দ্বিতীয়বার আর ডাকত না; কিন্তু একটু অপেক্ষা করার পর তাপ্তী আবার ডাকবে। এবং সে ডাকে সাড়া না পেলে ডুকরে কেঁদে উঠবে, যেন হঠাৎ কেউ এসে তার গায়ে জ্বলন্ত মশাল ফেলে দিয়ে গেছে।

তাপ্তীর মড়াকান্না বহুবার উশ্রীকে বাইরের লোকের সুমুখে লজ্জায় ফেলেছে। পরবর্তী অধ্যায়ের শাসন অথবা চপেটাঘাত তার কাছ থেকেও

ভবিষ্যতে সাবধান্ হবার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারে নি।

'মা, মা শুনতে পাচ্ছ না, এই মা!' তাপ্তীর উঁচু কণ্ঠস্বর এবার বুঝি মেঘের ভারে ঝুলে পড়া আকাশের গা ছু তে চলেছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত উশ্রীর মনে হতো পেট থেকে নামিয়ে দিয়ে দূরে সরাতে পারলে মাতৃত্বের সব শর্ত কেটে ফেলা যায়, কিন্তু ইদানীং যেন একটু একটু করে সেই ভুল ভাঙছে। মাতৃত্বের শর্তাদি পালন করানোর খানিকটা দায় সন্তানের নিজের অধিকার ফলানোর ওপরও নির্ভর করে, তাপ্তী তা একেবারে শিশু অবস্থা থেকে ভালোই জানে। কেউ তাকে শিখিয়ে দেয় নি। বড় যমজ দুটির আচরণ বিপরীত। ওরা একটু শিথিলতা পেলেই; বা উশ্রীর দিক থেকে একটুখানি নিস্পৃহার ইঙ্গিত দেখলে, অভিমানের বশে অনেকখানি দূরে সরে যায়।

রক্তের সম্বন্ধ, নাড়ির টান, ইত্যাদি কথাগুলোর ওপর উশ্রী দিন দিন আস্থাহীন হয়ে পড়ছে। ওকালতি আরম্ভ করার পর থেকে নিয়ত তার চোখের সুমুখে এত অনর্গল দৃষ্টান্ত উপস্থিত হচ্ছে যাতে এই চিরাচরিত ধারণাসমূহ ভুলই প্রমাণিত হয়েছে। কত তুচ্ছ কারণে মা সন্তান হত্যা করে! পুত্র তার মা'কে আইনের দরবারে ব্যভিচারিণী সাব্যস্ত করতে গিয়ে ভিটেমাটি বিক্রি করে পথের ভিখিরি হয়। পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ তো আরো বৈরি, যেন আজীবনই তারা পরস্পরের ঘোর বিদ্বেষী, চাণক্যের মতো নন্দবংশ ধ্বংস করার পর রাজ-রক্তে ধোয়া শিখাবন্ধনে প্রতিশ্রুত!

'মা-আ গো-ও, কালা হয়ে গেছ নাকি তুমি, শুনতে পাচ্ছ না?'

'কালা হয়ে যাই নি, মরে গেছি।' উশ্রী নিজেকে শুনিয়ে চাপা স্বরে বলে, তারপরই সাবধান হয়। এই ডাকই তাপ্তীর শেষ নোটিশ। এরপর মড়াকান্না জুড়বে সে। গলা চেপে ধরলেও সর্বাঙ্গ দিয়ে অজস্র বিক্ষুব্ধ সুর ফুটে বেরোবে। প্রতিটি মর্মবিদারী।

বারান্দা ছেড়ে উশ্রী নিজের ঘরে এলো। ঘর অন্ধকার। ঘরে একাই থাকে সে। এদিকে তিনটে ঘর পাশাপাশি, মাঝখানে দরজা বসিয়ে ইনটারলিংকড্। একানে ঘর না হলে উশ্রীর চলে না। প্রায়ই অনেক রাত

অবধি জেগে তার পড়াশোনা। ফাইল দেখা। অফিসে বা তার পাশের ঘরে ডিভানে শুয়েও কাজ চলতে পারে। কিন্তু উপায় নেই, কারণ ঐ তাপ্তী।

উশ্রী দোতলায় না আসা পর্যন্ত তাপ্তী ঘুমোবে না। অন্ধকার সিঁড়িতে একা বসে থেকে তার কান্না। ছেলেমেয়েদের সান্নিধ্য সংস্পর্শ উশ্রীর আর ভালো লাগে না। ওরা যেন অনেক দিকেই তার আত্মিক বন্ধন। ওকালতি করতে আসার পর থেকে সে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করছে। ভাস্কর বা অপর কেউ বাধা দেয় না। উপরন্তু মাসের মধ্যে কটা দিনই বা ভাস্কর এখানে থাকে? তার নামের সিঁদুর আর পদবীর সামাজিক বাঁধনটা আজকাল উশ্রীর কাছে উপহাস বলে মনে হয়। ভাস্কর তার নারিত্বের একদিককার সাইনবোর্ড, তাই নিজের মর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধির খাতিরে ও ভারটুকু বহন করতে হয়।

নিজের ঘরের ভেতর দিয়ে উশ্রী পাশের ঘরে এলো। এ ঘরখানাও অন্ধকার। রাত্তিরে একটা ডিম্ লাইট জ্বলে, তা জ্বলছে না। ইলেকট্রিক চলে গেছে। প্রায়ই যায়। ঘরে দুখানা খাট। একটাতে শোয় কাবেরী আর তাপ্তী। অন্যটায় দীপ্ত।

চাপা গলায় উশ্রী তর্জন করে, 'টর্চ জ্বাল মুখপুড়ী, মাঝরাতে উঠে চ্যাচাতে বসেছে, দেব গলা টিপে শেষ করে।'

ভারতীয় প্রথায় বাঙালী মায়ের মতো কথা বলল উশ্রী। যমজ দুটিকে সে কখনো এভাবে গাল দেয় না। প্রয়োজনও নেই, তারা এক কথার বশ। উশ্রীর সামান্য ইঙ্গিত ইশারায় বেশ ভালোই চলে। তা সত্ত্বেও বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ওদের বেশি শাসন করতে গেলে বা গালাগাল দিতে হলে মনে হয় নিজেরই অনধিকার। গায়ে শাসনের হাত উঠতে চায় না।

ভুল ত্রুটি করে ফেললে শুধুমাত্র সামান্য ভ্রূকুটি প্রদর্শনে উশ্রী যমজ সন্তান দুটির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে। ওরা ভেতর থেকে শুধরে যায় কিনা তা বলা সম্ভব নয়, কিন্তু বাইরের আচরণ পরক্ষণেই সুষ্ঠু সমাধানের মতো বদলে যায়। তারপর ঐ যমজ দুটির দিকে তাকিয়ে তার নিজেকেই

কেমন অপরাধী মনে হয়। তাপ্তীকে নিয়ে এ জ্বালা নেই, সে উৎপাত, কিন্তু বিবেকের প্রতিবন্ধক নয়।

দুটো খাটে ইলেকট্রিক চার্জ করা দুটি সুদৃশ্য চীনে টর্চলাইট। প্রতিটি সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসের মতো আজকাল ইলেকট্রিকের ওপরও ভরসা নেই। সর্বত্রই বিশ্বাস হননের অকাতর নিদর্শন। প্রায়ই বিদ্যুৎ চলে যায়। মাঝরাতের ঘোর অন্ধকার, অসম্ভব গুমোট গরম ; এই তো লোড্-সেডিং এর উপযুক্ত সময়!

'জ্বেলেছি তো!' বলার পর তাপ্তী বিছানার মধ্যে টর্চ জ্বালে। নাইলনের জাল-মশারি, বাধাহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ আলো বাইরে এসে পড়ে।

টর্চের আলোয় লক্ষ্য অনুসরণ করে উশ্রী তাপ্তীর বিছানার কাছে যায়। ওর পাশেই কাবেরী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। 'কি ব্যাপার, মাঝরাত্তিরে ষাঁড়ের মতন চ্যাচাস কেন?' উশ্রী রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করে।

'আমি কোথায় চেঁচিয়েছি, তুমিই চ্যাঁচালে, গলা টিপে দেব বলে ; আমি তো তোমায় ডাকছি!'

তাপ্তীকে আর ঘাঁটাল না উশ্রী, এ মেয়ে যে ভবিষ্যতে কি হবে তা ঈশ্বরই জানেন। ইচ্ছে হলো বচনমুখর মুখের ওপর দু'চার ঘা বসিয়ে দেয়। কিন্তু তার পাশে শুয়েই কাবেরী ঘুমোচ্ছে। পাশের খাটে দীপ্ত, সে-ও জেগে উঠবে। দুই নিয়ত যুযুধান মা-মেয়ের কলহে এ দুটিকে অযথা টেনে আনা অনুচিত। ওরা মা'কে এড়িয়ে নিজেদের মনোজগতের গণ্ডির মধ্যে থাকে, তাই থাক। জীবনের বোঝা যত কম হয় ততই ভালো। অবশ্য সব দায় ছাড়তে চাইলেই পারা যায় না। পুরনো দু'একটা থেকে যায়, উপরন্তু নতুন ভার এসে জমে।

তাপ্তীর খাটের পাশে এসে দাঁড়াল উশ্রী, নাইলনের মশারি ভেদ করে তাপ্তীকে এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। সমস্ত রাগ চেপে রেখে সে প্রশ্ন করে, 'ডাকছিস কেন, হয়েছে কি?'

চড়া সুরে তাপ্তী জবাব দেয়, 'পাখা থেমে গেছে, গরম—!' যেন এই উপদ্রবের জন্যে মা'ই দায়ী।

'লাইন নেই।' দাঁতে দাঁত পিষে ক্রোধ সংযত করে উশ্রী, তারপর মৃদু

গলায় উত্তর দেয়।

আব্দার নয়, আদেশের সুরে তাপ্তী বলে, 'পাখা নিয়ে এসে হাওয়া কর। উশ্রী প্রথমটা এই আদেশ অথবা আব্দার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, 'আমি ঘুমবো না? চুপ করে শুয়ে থাক্, লাইন এখুনি এসে যাবে।'

'জল দাও।' তাপ্তীর আর এক ফরমাস।

কোনোমতে ক্রোধ প্রশমিত কবে উশ্রী জল এনে দিল, 'জল খেয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতন ঘুমো এবার।'

'আগে তুমি একটুখানি হাওয়া কর।'

তু'তলায় তালপাতার পাখা খুঁজলে পাওয়া যাবে না, এর জন্যে নিচে রান্নাঘরে যেতে হবে। উশ্রীর ঘরের টেবিলে একটা ভাঁজ করা জাপানী পাখা পড়ে থাকে, কবে যেন সেটা কিনেছিল। ও ঘরে গিয়ে সেই পাখা-খানা নিয়ে এসে মশাবি তুলে তাপ্তীকে মিনিট তুই হাওয়া করল সে, 'ঘুমো এবার।' কিন্তু এটুকু বলারও দরকার ছিল না। নিজের জিদেব পুষ্টি হতে দেখেই নিমেষে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। বদ্ধ গুমোটে উশ্রী নিজে তখন ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে আবার সে বাবান্দায় এসে দাঁড়াল।

ক্লান্তিকর অবসরের সময় ঘড়ির কাঁটা একটু দেরি কবেই ঘোরে। কাল বাতে জেগেছে, আজও উশ্রীর কপালে জাগরণ। বিছানায় শুয়ে সর্বক্ষণ ছটফট করতে থাকলেও এক জোড়া চোখের তু'জোড়া পাতা এক হবে না। সামনে একের পর এক বিভীষিকার চিত্র ফুটে উঠবে। ব্যাপাবটা কোনোমতেই ভুলতে পারা যায় না।

আজও ঘড়ি ধরে সকাল এগারোটা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত কোর্ট করে এসেছে উশ্রী। নিয়ম সাড়ে চারটে। হাইকোর্ট সারকুলাবে তাই লেখা—সকাল এগারোটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত এজলাস চলার সময়। কিন্তু প্রায় আবহমান কালের কনভেনশন, অর্থাৎ যে প্রচলিত রীতি, তদনুযায়ী আদালত বসে বারোটায়। কেউ বা সাড়ে বারোটায়। আর শেষ সাড়ে তিনটেয়। মাঝে লাঞ্চ এক সওয়া ঘণ্টা।

সাড়ে তিনটের পর ক্বচিৎ কখনো আটকে পড়লে মনে হয় ডিটেনশান !
হাইকোর্ট সারকুলারে লিপিবদ্ধ বিধিবিধান আইনের পরিভাষায় পুঁথি-গত আইন মাত্র, যৎকিঞ্চিৎ নির্দেশ সূচক, অবশ্য পালনীয় নয়। অসময়ে আদালত বসাটা ফ্যাক্‌টম ভ্যালেট। অর্থাৎ আইন যাই হোক, তার প্রযুক্তি ভিন্ন পদ্ধতিতে। এবং কালক্রমে এই অপপদ্ধতিই প্রকৃত বিধির রূপ ধারণ করেছে।

কোর্টে গিয়েও উশ্রী আজ কোনো কাজে মন বসাতে পারে নি। গতকাল সন্ধ্যের বিশ্রী ও বেদনাপূর্ণ ঘটনার কথাটা তার মন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরে নি। প্রতিদিন সাড়ে পাঁচশ' জোড়া উকিল আর বত্রিশ জোড়া হাকিমের চোখ তার দিকে মুখিয়ে থাকে, সেটা প্রায় গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, ওদের বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে ঈর্ষা মনে করেও তৃপ্তি পেত সে, কিন্তু আজ মনে হলো ঐ বিদ্বেষ বা ঈর্ষার সঙ্গে আরো কিছু যুক্ত হয়েছে যেন, যা তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। উকিলের গায়ে মোটা চামড়া থেকে ঝেড়ে ফেলতে গেলেও তা অত্যন্ত দুরূহ প্রয়াস।

নিয়মিত ঢিলেঢালা আদালতগুলোর কোথাও আজ যেন একটুও দায়িত্বের দানা বাঁধে নি। সকলেই প্রায় সারাক্ষণ চেম্বারে কাটিয়েছেন। দশ পনেরো মিনিটের মতো বুড়ি-ছোঁয়া হয়ে এজলাসে বসে দু-একটা ফর্মাল সাক্ষীর এজাহার লিখে, বা অর্ডার সীটে Appeal heard in part, এই পেশকারী কলমে লেখা দিনপঞ্জীর নিচে ইনিসিয়াল সই ঘষে, further tomorrow, আদেশ জারি করে উঠে গেছেন।

তবু বোধহয় আজকের আদালতে এ ধরনের অত্যধিক শিথিল আব-হাওয়া খুবই যুক্তি সঙ্গত। গতকালের যা ঘটনা স্মরণীয়কালের মধ্যে আদালতের জীবনে তার সমকক্ষ কোনো পূর্ব-ইতিহাস নেই। কাল সন্ধ্যে-বেলায় জুডিসিয়ারির সব মর্যাদা ও নিরাপত্তা যেন এক মুহূর্তের মধ্যে ঘুচে গেছে। উশ্রীর মনে হতে লাগল বিক্ষুব্ধ জনতা তার চতুর্দিকে স্লোগান দিচ্ছে, Down with judiciary ; ন্যায়ালয় নিপাত যাক্ !

৫

উশ্রীর তখন সবে ওকালতি শুরু, সেই সময়কার একটা কথা মনে পড়ে যায়। ধীরেন গুপ্তর ছত্রছায়ায় কোর্টে যাওয়া আসা চলছে, বাড়িতে যদিও তাকে ভাস্কর উকিলসাহেবা বলে মেকি সম্ভ্রম দেখায়, ঠাট্টা তামাসা করে, ঐ বিস্তীর্ণ আইনের রঙ্গভূমিতে গিয়ে সে বেআইনী প্রেম-ট্রেম করে না বসে, এই কারণে তার বিপুল আশংকা ও গভীর উৎকণ্ঠা, কিন্তু তখন উশ্রীর আলাপ পরিচয় বলতে গেলে কারো সঙ্গেই হয়নি।

উশ্রীর ওকালতি-লাইসেন্সের আবেদন করার সময় তাকে ডিসট্রিকট জজের সামনে সনাক্ত করেছিলেন ধীরেন গুপ্ত, 'শ্রীমতী উশ্রী মুখার্জিকে আমি আদালতের সামনে সনাক্ত করছি, ইনি ওকালতি সনদের আবেদিকা। আমার জুনিয়ার হয়ে আসছেন।'

উশ্রীর গায়ে কালো কোট, ওপর থেকে লয়ার্স গাউন চাপানো, পরনে কালো শাড়ি, তবু তাকে দেখে জজসাহেব যেন একটু চমকে উঠেছিলেন, সে বিস্ময়ভাব নিমেষে সামলে নিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'I think you will be the first lady lawyer in the State from a district bar ? I heartily welcome you in this noble profession. You have opened a new and very respectable line for women of the State.'

ধীরেন গুপ্ত বললেন, 'yes, your honour, হ্যাঁ স্যার, আপনি খুব খাঁটি কথা বলেছেন।'

উশ্রী স্মিতমুখ এবং দ্রুতস্পন্দিত বুকে দাঁড়িয়ে, জজসাহেব এজলাসে উপস্থিত উকিল সম্প্রদায়ের দিকে একবার তাকিয়ে পুনরায় তার ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনেন, এবং পূর্বোক্ত কথাগুলি হিন্দিতে বলেন, 'আপনাকে আমি স্বাগত জানাই, আশা করব আপনি এই জেলার শিক্ষিত নারী-

জাতির প্রেরণা স্বরূপ হবেন।'

এত কথা শুনে উশ্রী ভয় আর বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, শুধু ধীরেন গুপ্তব ইঙ্গিতে ঘাড় ঝুঁকিয়ে আদালতকে সম্মান জানায় সে।

তারপর উশ্রীর কটা দিন ধীরেন গুপ্তকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে বেড়ানো। আপিলে আরগুমেন্ট করেন ধীরেন গুপ্ত, অন্য জুনিয়ারের নির্দেশে উশ্রী তাঁর হাতের কাছে বই এগিয়ে দেয়। এ আই.আর. সুপ্রীম কোর্ট অথবা বি এল জে. আর-এর পেজমার্ক করা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা তাঁর হাতের কাছে খুলে ধরে। আইনের বিশদ তথ্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ মোক-দ্দমার নজির নিজেব জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি ব্যক্তিগত খাতায় টুকে নেয় সে।

ধীরেন গুপ্ত যখন কোনো মোকর্দ্দমার সাক্ষীকে জেরা করেন উশ্রী তার এজাহার ফুলস্কেপ কাগজে লিখে চলে। পরে অবসর সময় ধীরেন গুপ্ত বলেন, 'দেখি মিসেস মুখার্জি, কি লিখলে তুমি ?···না, না, সাক্ষী ও কথা বলে নি, তুমি শুনতে ভুল করেছ, কোর্ট যা লিখেছেন তার সার্টিফায়েড কপি কাল আমবা পেয়ে যাব, মিলিয়ে দেখে নিও। ওকালতি অনেকটা গুপ্তচর বৃত্তির মতন, সর্বদা খুব সাবধান আর সচেতন হয়ে থাকার চেষ্টা করবে। তোমার অন্যমনস্কতার ফাঁক দিয়ে প্রতিপক্ষ পালিয়ে যেতে না পারে, সে বিষয়ে খুব সাবধান! এ পেশায় নিজের অন্যমনস্কতা ও আলস্যের চেয়ে বড় শত্রু নেই।'

ধীরেন গুপ্তর উপদেশ উশ্রী শোনে বটে, কিন্তু কোনো মোকর্দমা যখন চলতে থাকে সে নিজের কাজের ফাঁকে বিশেষভাবে ধীরেন গুপ্তকেই লক্ষ্য করে। তাঁর কর্মপদ্ধতি। আশি বছর বয়েস ধীরেন গুপ্তর, কর্মের যৌবশক্তিতে যে কোনো তরুণ ও স্বাস্থ্যবান যুবকের সমান। সুন্দর পরিষ্কার এবং সচেতনতাপূর্ণ কাটাকুটিবিহীন হাতের লেখায় পরিপক্ক বয়েসের সামান্যতম কম্পন নেই। আরগুমেন্টের সময় প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট-তার সঙ্গে উচ্চারিত। এক বলতে আর এক বলেন না। একটি অক্ষরেরও পরিবর্তন নেই। যা বলেন তাই যেন সর্বদা তাঁর সুচিন্তিত ও চরম উক্তি। জেরার প্রশ্নগুলি তীব্র তীরের স্থির নিশানা। উশ্রী অনুভব করে ধীরেন

গুপ্ত কৃত পর পর তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সে নিজেও আর পূর্বা-পর সঙ্গতি রাখতে পারবে না, এ বিষয় আগে থেকে যতই শিখে আসুক না কেন।

ধীরেন গুপ্ত বলেন, 'ছেলেবেলা আর কলেজে পড়ার সময় তো বটেই, ওকালতিতে আসার পরও আমি খুব তোতলা ছিলাম, উপরন্তু প্রকৃতি অত্যন্ত নার্ভাস, স্বভাব ভয়কাতুরে। মাঝরাতে বাড়ির ছাদে উঠে নিজের মনেই আপিল আরগুমেণ্ট করতাম, জেরার প্রশ্ন রচনা করতাম, নিজের ভুল নিজেই খুঁজে বার করা, সংশোধন করা। এ পেশায় তোমার প্রকৃত গুরু অন্য কেউ নেই মিসেস মুখার্জি। কেউ শেখাতে চাইলেও তুমি শিখতে পারবে না, যদি না নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা কর। বড় উকিলের ছেলে প্রায়ই বড় উকিল হয় না। A lawyer must live like a hermit and work like a horse ; এ আমার কথা নয়, ইংল্যাণ্ডের এক প্রখ্যাত ব্যারিস্টারের প্রবচন। বুঝলে ? সন্ন্যাসীর একনিষ্ঠতা আর জোয়ালের বলদের মতো কর্মক্ষমতা উকিলের আবশ্যিক গুণ! আমি আজীবন এইভাবে চলার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া উকিল হিসেবে কাউকেই বড় একটা অনুকরণের চেষ্টা করি নি, নিজের পথ আর পন্থা নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়েছে।'

ওকালতিতে আসার আগে উশ্রী ক'জন আশীতিপর লোক দেখেছে তা স্মরণ নেই। দু'একটি যদি বা দেখে থাকে তা শয্যাশায়ী রোগী। জীবিত দেহে শ্বাসপ্রশ্বাস চললেও মনে হয় তাদের কর্মজগৎ বহুকাল পূর্বে পরলোকে স্থানান্তরিত, এ জগতে থেকেও তারা যেন ভিন্ন লোকের আবাসিক।

কিন্তু এই আদালতেই অন্তত পাঁচজন উকিল আশির উর্ধ্বে, এখনো সক্ষম শরীরে চতুর্দিকে কর্মের তুফান তুলে রেখেছেন। এঁরা সবাই সুরজিৎ সিংহ অথবা ধীরেন গুপ্তর মতো কৃতী নন, তিরাশি বছরের নিমু সাহু আজও জুনিয়ার পর্যায়ে। স্থানীয় বিধি-জগতের বহু ইতিহাসে তিনি জীবিত সাক্ষী, কিন্তু নিজের কোনো ইতিহাস রচনা করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্ররা যদি স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে পিতার তৈলচিত্র বার

লাইব্রেরীকে উপহার দেয় তা দেওয়ালে টাঙানো অন্যান্য ছবিগুলির গায়ে অমর্যদার আঁচড় কাটবে।

আশি নয়, পুরো একশ' বছর বয়েস পর্যন্ত কোর্টে এসে ওকালতি করে গেছেন ললিতমোহন ঘোষ। এই আদালতেই উকিল ছিলেন তিনি। ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রী বি. পি. সিংহের সভাপতিত্বে তাঁর উকিল জীবনের হীরক জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। সে সমারোহে সারা রাজ্যের প্রখ্যাত আইনজীবীবর্গ এখানকার বার অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর একশ' বছর বয়সপূর্তিতে এই বার কর্তৃক তাঁর বিদায় অভিনন্দন। ভারতীয় আইনজীবীদের ইতিহাসে ললিত-মোহন ঘোষ বিরল দৃষ্টান্ত।
উশ্রী দেখেছে ললিতমোহন ঘোষকে। তখন সে এখানকার আইন কলে-জের ছাত্রী। ললিতমোহন আইন জগতে জীবিত প্রবাদ স্বরূপ। এ লিভিং অ্যাণ্ড স্পিকিং এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ্ ল! বাড়িতে আপিস-ঘরের সামনের বারান্দায় বসে আইনের বই লিখছেন। আইনের যাবতীয় রেফারেন্স তাঁর কণ্ঠস্থ। একশ' তিন বছর বয়েস। চশমা বিহীন চোখ। সমর্থ শরীর। বাইরে থেকে কিছুক্ষণ দেখার পর সামনে গিয়ে উশ্রী তাঁকে প্রণাম করেছিল। নিজের পরিচয় দিয়েছিল, আইনের ছাত্রী।
ফতুয়ার পকেট থেকে বাঁধানো দু'পাটি দাঁত বার করে মুখে পুরলেন ললিত-মোহন, দন্তহীনতার দরুন ঈষৎ বিকৃত মুখ পুষ্ট হয়ে উঠল অচিরাৎ, তারপর তিনি বললেন, 'পাঁচ বছর হলো সব অরিজিনাল দাঁত ফেলে দিয়ে নকল নিয়েছি, কিন্তু নকল কিছু আমার সহ্য হয় না। কিডনি আর কাজ করছে না, পেট ফুটো করে রবারের নল ভরে দিয়েছে। বুঝতে পারছি, আমার শরীরের প্রাকৃতিক সম্পদ ফুরিয়ে এসেছে, এবার চলে যাওয়া উচিত।'
উশ্রী বলল, 'দেখে তো মনে হয় আপনার স্বাস্থ্য বেশ ভালোই?'
ললিতমোহন সমর্থন সূচক ঘাড় নাড়েন, 'খুব খারাপ নয়, তবে পৃথিবীর বোঝা মাথায় তুলে নেবার জন্যেই তো মানুষের জন্ম, কারো বোঝা হয়ে

থাকার জন্যে নয়। চিফ্ জাস্টিস বি. পি. সিনহা আমায় প্রশ্ন করেছিলেন আপনার অটুট যৌবনের গুপ্ত কথাটা কি বলুন তো ললিতবাবু ? তাতে আমি জবাব দিয়েছিলাম, নিজের চতুর্দিকে সদাসর্বদা তারুণ্যেব বিকাশ; বৃদ্ধ হয়েছি এ চিন্তা মনে ঠাঁই না দেওয়া। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি সময় নিজের প্রাপ্য ঠিকই গুণে নেবে। I am being lost to my self; আমি নিজেই নিজের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছি, এ অবস্থায় পৃথিবীব কে আর আমায় গ্রহণ করবে? কে আমার ভাব টানবে? তারপর, তুমি কোন্ প্রয়োজনে? বসো এখানে।'

ললিতলোহন নির্দেশিত চেয়ারে উশ্রী বসে পড়ে, তারপর বিনীত ও মোহযুক্ত গলায় উত্তর দেয়, 'পাশ করার পর আমি ওকালতি করব। আমার অনেক সৌভাগ্য আপনাকে দেখতে পেলাম, আপনাব সঙ্গে কথা বললাম। আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সফল হতে পারি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বইলেন ললিতমোহন, পবে উত্তর দিলেন, 'আমি বিশেষ রক্ষণশীল নই, কিন্তু অনুভব করি বয়েসের দিক থেকে এক শতাব্দীর মানুষকে পরের শতাব্দী দেখতে নেই, তাতে পরবর্তী যুগেব সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত কোনোমতে এড়ানো যায় না। তবু আমি আশা করছি তুমি সফল হবে, অবশ্য যদি সব অবস্থাতেই মনেপ্রাণে সৎ হযে থাকতে পার।'

উশ্রী বলে, 'তা তো ঠিকই!'

ললিতমোহন চিন্তিতের হাসি হাসেন, 'ঠিক তো বটেই, কিন্তু বর্তমান যুগের সঙ্গে আমার এ কথা বোধহয় খাপ্ খায় না? যে জীবনে কোনো নৈতিক বন্ধন নেই, তাই তো আজ সবচেয়ে বেশি উন্নত! আসলে নীতি শব্দটাই সম্পূর্ণ আপেক্ষিক, স্থান কাল এবং পাত্র ভেদের ওপর নির্ভর করে। তবু যেন আমার মনে কোথাও একটা সংশয় থেকে যায়।'

কি যেন বলতে যায় উশ্রী, কিন্তু লক্ষ্য করে, ভাবের দিক থেকে ললিত-মোহন যেন আর ইহজগতে নেই, পরলোকে প্রস্থিত ব্যক্তি তিনি। অগত্যা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে উশ্রী বিদায় নেয়।

৬

ললিতমোহন ঘোষের জীবন থেকে বাঁচার প্রেরণা চলে গিয়েছিল, তারপর আর বেশিদিন বর্তমান থাকেন নি তিনি। তাঁর যত কাহিনী তা যেন এখানকার আইন জগতের ইতিহাস। নতুন উকিলদের গল্পের বিষয়বস্তু।

ললিতমোহনের ব্যবহারজীবী জীবনের অনেকখানি দেখেছিলেন বার লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক তিনকড়ি সোম। তারপর দেখেছেন তাঁর পুত্র বর্তমান গ্রন্থাগারিক সুনীল সোম। পিতা এবং পুত্র মিলিয়ে বার লাই-ব্রেরির একটি পরিপূর্ণ শতাব্দী। একটানা কাজ করে গেছেন তিনকড়ি সোম একষট্টি বছর ধরে, তারপরই সুনীল সোম উনিশ শ' ছত্রিশ সাল থেকে।

শরৎ-মাতুল সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় তিন কড়ি সোম একটি বিশিষ্ট চরিত্র ; সে বই উশ্রী পড়েছে। বার কয়েক পড়ার ফলে অনেক অংশই তার প্রায় কণ্ঠস্থ। এই আদালতেরই উকিল ছিলেন উপেন্দ্রনাথ, পরে অবশ্য সাহিত্যের আকর্ষণে তিনি পেশায় ইতি দিয়েছিলেন।

ললিতমোহন ঘোষ উশ্রীকে ওকালতির ব্যাপারে মুক্তকণ্ঠে উৎসাহ দিতে পারেন নি, সময়গত সংস্কার এ বিষয়ে তাঁকে পরাঙ্মুখ করেছিল। কিন্তু প্রায় একই কথা গাইলেন পরবর্তী কালের আনন্দি ঝা। যাটের কোঠা পেরোন নি তিনি, বাংলা বলেন পরিষ্কার। উশ্রীর সেদিন মাত্র ন'দিনের উকিল-জীবন, যেদিন আনন্দি ঝা যেচে তার সঙ্গে আলাপ করেন।

টিফিনের ঘণ্টায় বার লাইব্রেরিতে বসে আছে উশ্রী, পাশের চেয়ারে এসে বসলেন আনন্দি ঝা। উশ্রী যে চেয়ারে বসে তার এক পাশে ধীরেন গুপ্ত না বসলে স্থানাভাব সত্ত্বেও অনভ্যাসের সংকোচবশত ছু'-পাশের চেয়ারে কোনো উকিলই বসেন না।

উশ্রীর পাশে বসে ছেড়া কোটের পকেট হাতড়ে এক মুঠো বিড়ি বের করলেন আনন্দি ঝা। বিড়িগুলো টেবিলের ওপর ছড়িয়ে গুনে নিলেন স্বগত বললেন, 'পকেটের ফুটো গলে পাঁচটা পড়ে গেছে, আজ বাড়ি থেকে ডিবে আনতে ভুলে গেছি। যাক, কত কি তো আমার জীবন থেকে পড়ে গলে গেল!' একটা বিড়ি ধরান আনন্দি ঝা, তারপর প্রশ্ন করেন, 'তোর নাম কি রে বোকা মেয়ে?'

এ সম্বোধনে উশ্রী অবাক একটু, বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থেকে জবাব দেয়, 'উশ্রী মুখার্জি।'

'বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' উশ্রী ঘাড় নাড়ে।

'হাজব্যাণ্ড কি করে?' খুবই দ্রুত প্রশ্ন আনন্দি ঝাব, যেন বিরোধী পক্ষের সাক্ষীকে জেরা কবছেন।

'ডাক্তার।'

আনন্দি ঝা কুঞ্চিত চোখে উশ্রীর মুখের দিকে তাকান, 'ইস্যু?'

উশ্রী বিব্রত ও বিরক্তিপূর্ণ গলায় উত্তর দেয়, 'একটি ছেলে, একটি মেয়ে।' এ তথ্য সে জানায় না, তারা যমজ সন্তান।

বিড়ি মুখে নিয়ে আড় চোখে উশ্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন আনন্দি ঝা, 'দুটো ইস্যু? দেখে মনেই হয় না তোর বিয়ে হয়েছে, তাছাড়া তুই তো খুবই সুন্দরী? এ মনোহারিণী সাপ যে কোনো সন্ন্যাসীকে দংশন করে কাবু করতে পারে। তোকে দেখলে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভেঙে যেত, স্বর্গ থেকে কোনো অপ্সরাকে নামতে হতো না। প্রেম করে বিয়ে নাকি?'

উশ্রী এবার অধিকতর বিরক্ত, কিন্তু রাগ চেপে রেখে শান্ত ও ঠাণ্ডা গলায় বলে, না।'

উশ্রীর আপাত অদৃশ্য ক্রোধ অভিজ্ঞ আনন্দি ঝার দৃষ্টি এড়ায় না, কিন্তু তা গ্রাহের মধ্যে না এনে তিনি বিস্ময় ব্যক্ত করে প্রশ্ন করেন, 'তবু তোর স্বামীর দেখছি তোর ওপর বিশ্বাস তো খুব?'

সমস্ত দেহে আকস্মিকতার বেগ নিয়ে উশ্রী উঠে দাঁড়ায়, 'আমি যাচ্ছি,

কাজ আছে একটু।'

আনন্দি ঝা খপ করে উশ্রীর হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে দেন, 'বোস বোকা মেয়ে, কোর্টে এসেছিস, কত রকম কথাই তোকে শুনতে হবে। গায়ে গণ্ডারের চামড়া না থাকলে ভালো উকিল হওয়া যায় না!'

'আমার সত্যিই কাজ আছে।' বলার পর উশ্রী তার নরম ও শ্রীময়ী মুখে এক চিলতে হাসি টেনে আনে।

আনন্দি ঝা বিশ্বাস বা গ্রাহ্য করেন না। বলেন, 'শোন্ বোকা মেয়ে, By itself bar is a very bad word; বার অত্যন্ত নোংরা শব্দ। বার ক'রকম হয় জানিস তো? মদের ভাঁটি হলো বার, বারবেলা, বার-বণিতা, তাদের বাড়া আমাদের এই উকিলী বার। A dane of all evils and every sort of sin। তুই মরতে এখানে এসে জুটলি কেন? এ যে শয়তান আর শয়তানীর ঘাঁটি। পাপেব কুণ্ড! রাবণ সীতা-হরণ কবে আনাব পর মন্দোদবী বলেছিল, মজালে রাক্ষস কুল, মজিলা আপনি। আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি বোকা মেয়ে, এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালা, নয়তো সব মজিয়ে ছাড়বি, নিজেও মরবি।'

সীমাহীন বিবক্তি ও দুরন্ত ক্রোধে উশ্রীর অন্তরাত্মা জ্বলে ওঠে, মুখাবয়বে রক্তিমাভা, ব্যাগ খুলে রুমাল বার করে ঘর্মাক্ত মুখ মোছে সে, তারপর তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে বলে, 'এমন কথা কেউ তো আমায় বলেন নি কোনো-দিন? আপনার মুখেই প্রথম শুনছি।'

আনন্দি ঝা উত্তর দেন, 'ওরে বোকা মেয়ে, তুই যাদের কাছে গেছিস, কথা বলেছিস, সবাই প্রতিষ্ঠিত উকিল। প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর সকলেই খুব ভালো ভালো কথা বলে। আমিও অনেক শুনেছি। অনেক আশা আর প্রফেসানাল এথিকস নিয়ে বার-এ ঢুকেছিলাম, এখন আমার বৃদ্ধা বারাঙ্গনার অবস্থা। তবে একটা কথা কি জানিস, গরীবের অভিজ্ঞ দৃষ্টি খুব তাড়াতাড়ি ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।'

টেবিলের ওপারে যুবক-দর্শন অ্যাসিসটেন্ট পাবলিকপ্রসিকু্যটার সুকুমার সরকার, আনন্দি ঝা'র দু'একটা কথা তাঁর কানে গেছে, তিনি বলে ওঠেন, 'কি বড়দা, সারমনাইজিং? উপদেশ দিচ্ছেন নাকি? সাবধান মিসেস

মুখার্জি ! বড়দাকে আমরা বলি সুয়োমটো, অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ। ওঁর সর্বদাই গায়ে পড়া উপদেশ।'

উশ্রী স্মিত দৃষ্টিতে সুকুমার সরকারের দিকে তাকায়। ওপর আর নিচ দু-পাটির দাঁত চেপে অদ্ভুত স্বরে কথা বলেন ভদ্রলোক ! কেন ? এ কি মুদ্রা দোষ ?

উত্তরটা জানে না উশ্রী। কিন্তু প্রশ্ন করলেই সুকুমার সরকার বলতেন, 'বুঝলেন না মিসেস মুখার্জি, ছেলেবেলায় কনভেন্ট স্কুলে পড়েছি, আজ-কালকার মাউন্ট অ্যাসেসির মতো দিশি মেমসাহেবদের কনভেন্ট নয়। বিলিতি আমলের কনভেন্ট, দিদিমণিরা মেড ইন ইংল্যাণ্ড। মুখে চাবি পুরে দিয়ে উচ্চারণ শেখাতেন। কথা বলতে গিয়ে মুখ থেকে চাবি খসলেই কালো কান আমাদের রাঙা মুলো হয়ে যেত। আমার মতন দাঁত চেপে উচ্চারণ করুন তো, ইনডিসপেনসিবল ?'

সুকুমার সরকারের দিকে চেয়ে দেখলেন আনন্দি ঝা, 'ওরে আমার বোকা ছেলে, পঞ্চাশ বছরেও ডাঁসা পেয়ারা সেজে থাকলে কি হবে, তোরও দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমি কি মন্দ কথা বলছি ? এ সংসারে যেমন শংকরাচার্য আছে, তেমনি তার পাশাপাশি চার্বাকও রয়েছে, কাকে বিশ্বাস করবি ? কলকাতার বার লাইব্রেরি ক্লাবের ছেঁড়া কাগজের খাতায় দু'জন উকিল দুটো কবিতা লিখেছেন দু'টোই দু'ভাবে সত্যি। প্রথমটা লিখেছেন বিখ্যাত কে. পি. খৈতান, দ্বিতীয়টা আমারই মতন এক নাম না জানা আনন্দি ঝা। শুনবি ?' শেষ কথাটা উশ্রীকে লক্ষ্য করে।

হ্যাঁ-ই বলা উচিত, তাই উশ্রী ঘাড় নাড়ে।

হাতের বিড়ি ফেলে দিয়ে আনন্দি ঝা গলা খ্যাঁকারি দেন। শোন্ তবে।

'We mean to live, free,
Strong and pure,
Protect our honour with our might,
And boldly stand, till truth and light,
And justice in the land endure !

ধর্মাধিকরণের পবিত্রতার কথা অনেক মুনি ঋষিই তো বলে গেছেন।

তা-বড় তা-বড় ন্যায়াধীশ আর ব্যবহারজীবীদের উক্তি। কিন্তু এর পরও একটা আছে, তা এই নাম না জানা উকিল আনন্দি ঝা'র সমাধিলিপি। তার পবিত্র স্মৃতিফলক!

Here lies a lawyer
Let him lie still.
He lied for his living
He lived while he lied
And when he could lie no longer
He lied down and died!

মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে, এখানে শুধু মিথ্যে নিয়ে বাঁচা, আর মিথ্যে নিয়ে মরা, বুঝলি বোকা মেয়ে? সাবধান, খুব সাবধান!'

আনন্দি ঝা'র এই মুহূর্তের চেহারা উশ্রীকে কেমন বিহ্বল করে তোলে। মনে হয় এখুনি বার লাইব্রেরি থেকে উঠে বাড়ি পালিয়ে যায়। নিজের সংসারে। নিশ্চিন্ত জীবনের শান্ত পরিসরে। অর্থের প্রয়োজন নেই তার। খ্যাতিলাভের মোহ নেই।

বি. এ. পাশের পর ভাস্করের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। ব্লকে ডাক্তারের চাকরি ভাস্করের। সেখানে গ্রাম্য পরিবেশে একাই থাকত সে। ব্লকের ডাক্তার, কোয়ার্টার ভালোই, তবু সেখানে উশ্রীকে নিয়ে যায় নি। বাড়িতে একা সময় কাটে না, তাই তার আইন পড়া। এবং খুব সহজে পাশ করেছে বলে শুধু খেয়ালের বশেই ওকালতি করতে আসা। এতখানি সাবধানতা নিয়ে কোনো খেয়ালই পূর্ণ করার স্পৃহা থাকে না। উশ্রী পালিয়ে যাবে। স্থির নিশ্চিত!

৭

এক চুমুক চা ও একটান সিগারেটের শিথিল ধূম মৃদু আয়াসের সঙ্গে উদ্‌গিরণ, আবার এক চুমুক চা এবং—। ভাবসমহিত অলস ভঙ্গিতে প্রবীরকুমার বলে, 'জানো অবি, শিল্পীকে কখনো সাংসারিক বন্ধনে জড়াবে না, সে তার সঙ্গে শত্রুতা করা। এতে তার শিল্পের স্বাভাবিক প্রবণতা শুকিয়ে যায়। তোমার উচিত এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে সহ-যোগিতা করা।'

'কথাটা কি তোমার ?' বাইরে বেরুবে অবন্তী, শাড়ি পরা হয়ে যেতে এ ঘরে এসে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় নিচু করে নিপুণ হাতে কুঁচিটা ঠিক করছিল, ঘাড় তুলে প্রশ্ন করে, তারপর আবার মাথা নিচু করে।

'শুধু আমার কেন ? যে কোনো প্রকৃত শিল্পীর একই বক্তব্য। আমাদের মেন অ্যাকটর সুস্থিরকুমারও এই কথা বলেন। দু'বছর আগে তিনি কোথায় ছিলেন, কেউ নাম পর্যন্ত জানত না, আর আজ ডির্ভোস হয়ে যাওয়ার পরে কোথায় উঠে গেছেন! বাংলাদেশের অপেরা বলতে সুস্থির-কুমার। নাটকে শিশিরভাদুড়ী অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম কেউ আর করে না। মানে একটা সাংস্কৃতিক যুগ।' চা শেষ, সিগারেটটা বাকি আছে একটু, কথার শেষ দিকে উত্তেজনার বশে তাতে ঘন ও সুদীর্ঘ টান দিয়ে প্রবীরকুমার সামনের আগুনের ভাগটা গন্‌গনে করে তুলেছে।

মুখের ওপর পাউডার পাফ্ বোলাচ্ছে অবন্তী, 'বিয়ের আগে কি এ কথাটা তোমার মনে হয় নি?'

প্রবীরকুমার জবাব দেয়,'হবে না কেন ? অনেক জিনিসই সারা জীবনের মতো গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে তারও প্রয়ো-জন হয়ে পড়ে।'

'এ-ও কি তোমার ঐ সুস্থিরকুমারের কথা ?' প্রশ্নের শেষে অবন্তীর

ঠোঁটে বাঁকা হাসি বিঁধে থাকে।

অবন্তীর হাসিতে অবিশ্বাসের প্রস্তাবনা অনুমান ক'রে প্রবীরকুমার বিরক্ত গলায় বলে, 'সুস্থিরকুমার কেবল তোমার আমার নয়, সারা দেশের। তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে হলে বলা উচিত আমাদের সুস্থির-কুমার। আজ এ দেশে তাঁর কদর প্রাইম মিনিস্টারের চেয়ে কম নয়। অবশ্য শিল্প সংস্কৃতি কাকে বলে, যারা তা বোঝে তাদের কাছে। তুমি উলঙ্গ শরীরে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার দিকে তাকিয়ে দেখারও সময় নেই সুস্থিবদার। অথচ তিনি যে কামমুক্ত সন্ন্যাসী তা নয়, সুরা এবং নারীতে তাঁর আসক্তি যে কোনো প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মতোই। কিন্তু সময় নেই, কৃষ্টির ডাকে মজে আছেন।'

এবার বেরুতে হবে অবন্তীকে, ঘবের কোণ থেকে ছোট ছাতাটা তুলে নিয়ে প্রবীরকুমারের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে আপাতত শেষ কথার মতো প্রশ্ন করে,'তুমি কি চাও, ডিভোর্স? আমাব তাতে অমত নেই।'

'না।' শান্ত গলায় প্রবীরকুমাব জবাব দেয়, সুস্থিরদার ডিভোর্স কেসের সময় ফাইল নিয়ে আমাকেই উকিল বাড়ি আর আলিপুর কোর্টে দৌড়তে হতো, ডিভোর্সের আইন আমি খুব ভালো জানি। সেকসন থার্টিন হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট। অ্যাডাল্ট্রি গ্রাউণ্ডে তোমায় ডিভোর্স করতে পারি,হাতে এক কোটি প্রমাণ আছে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তা করব না। জয়ন্ত আমায় যে চিঠিগুলো আর অন্যান্য মেটিরিয়াল দিয়েছে, তা দেখলে তুমি চমকে উঠবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল অবন্তী, কিন্তু প্রবীরকুমারের কথা শুনে স্থির হয়ে দাঁড়ায় সে, তারপর হাতঘড়ির ওপর এক নিমেষ চোখ বুলিয়ে নিয়ে দৃষ্টি আবার প্রবীরকুমারের দিকে ফিরিয়ে শান্ত কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ যতি রেখে প্রশ্ন করে, 'তুমি কি আমায় ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ?'

অভিজ্ঞ খল নায়কের মুখভঙ্গি করে প্রবীরকুমার, 'ছি ছি, তা কেন, দু'এক দিনের জন্য নিরিবিলি শান্তির সংসার করতে এসেছি। তোমায় ঘৃণা করি আর যা-ই করি, এসে অবধি এক রাত্তিরও আমি আলাদা শুই নি। কিন্তু পাঁচশ'টা টাকা আমার খুবই দরকার, আজই কলকাতা

ফিরব, তার আগে চাই।' সোহাগের কথা আর প্রয়োজনের কথার মাঝে যথারীতি বিরতি দেয় প্রবীরকুমার।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রবীরকুমারের কথায় বিশেষ আমল দিচ্ছিল না অবন্তী, যদিও প্রচণ্ড ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু অর্থের দাবি উঠতে নিজেকে যেন নির্মূল উদ্বাস্তুর মতো বোধ হতে লাগল তাব। এবার সে অসহায়ভাবে বলে, 'এত টাকা আমি কোথায় পাব? যা পোস্টাপিসে জমিয়ে রেখেছিলুম ছ'মাস আগে এসে সব তুমি তুলে নিয়ে গেলে।'

সিগারেট ধরাল প্রবীরকুমার, অবন্তীর কৈফিয়তে আমল না দিয়ে ধীরে সুস্থে বলল, 'তোমার আর খরচ কি? ছেলেপুলেও নেই যে তার জন্যে টাকা খসবে। তখন তুমি রাজি হওনি, কিন্তু আমি বুদ্ধি করে অ্যাবরসান করিয়ে দিয়েছিলুম বলে আজ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে পারছ। এরও একটা রিওয়ার্ড আমার প্রাপ্য।'

বিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অবন্তী কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা আনার চেষ্টা করে বলে, 'কিন্তু টাকা আমার নেই।'

অবিশ্বাসের বশে ঘাড় নাড়ে প্রবীরকুমার, মুখেও অনুরূপ হাসি, 'এ কথা তুমি প্রতিবারই বলেছ। না থাকে ডাক্তারের কাছে নাও, ব্লকের ডাক্তার, ওদের চুরির পয়সা, তার ওপর মাগ নেই, ছেলে নেই। তোমার সঙ্গে তার যা সম্পর্ক তাতে মাসে মাসে হাজার টাকা করে দেওয়া উচিত। পরস্ত্রী নিয়ে ফুর্তি করবে, উপুড় হস্ত হবে না, এটা কোনো ভদ্রতা নয়! ডিভোর্সের সময় সুস্থিরদা স্ত্রীর গুজরাঠী প্যারামোরের বিরুদ্ধে সত্তর হাজার টাকা খেসারৎ ডিক্রি পেয়েছিল, সে ডিক্রি জারি করতে হয় নি, গুজরাঠী ভদ্রলোক এক কথায় দিয়ে দিয়েছিল, পরে সুস্থিরদার বউকে কেপ্‌ট হিসেবে নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে রেখেছে। আমিও ডিভোর্স কেস করলে কোন্ না পঁচিশ ত্রিশ হাজারের ডিক্রি পাবো? তখন পারবে ঐ ডাক্তার এক কথায় অত টাকা ফেলে দিতে? এর চেয়ে মাঝে মধ্যে কিছু কিছু দিয়ে যাওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ? তুমি বুঝিয়ে বলো, আজ আমার টাকা চাই। পরশু থেকে নতুন বই নামবে, কাল ফাইনাল রিয়ার্সাল, তার আগে আমায় কলকাতা পৌঁছতে হবে।'

আর সাড়া শব্দ না তুলে অবন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবন্তীর যাওয়া-পথের দিকে তাকিয়ে প্রবীরকুমার শেষ হুঁসিয়ারি দেও-য়ার মতো গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে বলে, 'আজ তুপুরের মধ্যে টাকা এনে দিও, বুঝলে তো অবি, আমার আজই কলকাতায় না ফিরলে নয়। নয়তো কে আর বাড়িঘর ছেড়ে বাইরে চলে যেতে চায়?'

উত্তর দিল না অবন্তী।

অবন্তী আর দাঁড়াল না। বাড়িতে বসে থেকে শ্যামলের সঙ্গে ঝগড়া করবে সে সময় হাতে নেই। আটটা বেজে গেছে। পর পর তুদিন দেরি হয়েছে, আজ তৃতীয় দিন, আজও হবে। আটটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে হাজিরা খাতায় সই করে গতকালের কাজের হিসেব দেওয়া নিয়ম। অন্য সময় বি. ডি. ও-র টিকির দর্শনও তুর্লভ, কিন্তু সকাল বেলার এই সময়টা তিনি ঘুম ভাঙা চোখে কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে অফিসের চেয়ারে বসে খোঁয়াড়ি কাটাতে আসেন।

পরশু দেরি হওয়ার জন্যে বি. ডি. ও. কিছু বলেন নি, একবার আড় চোখে তাকিয়ে খবরের কাগজের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। কাল তাঁর আড় চোখের দৃষ্টি বেশ সন্দিগ্ধ হয়েছিল, বললেন, 'হাজরির খাতায় সই করে সময় লিখে দেবেন, পাশে দেরির কৈফিয়তও লিখবেন।'

অফিসের ঘড়ির সময় দেখে অবন্তী লিখল আটটা চল্লিশ, কিন্তু কৈফিয়ৎ, কি লিখবে, সারারাত শ্যামল অর্থাৎ অভিনয় জগতের প্রবীরকুমারের পৈশাচিক জুলুম? ভোগের সময় সে যে অসম্ভব ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে সর্ববিধ আচরণ করে তা প্রতি মুহূর্তেই টের পাওয়া যায়। দরকার যত না, তার হাজার গুণ অতিরিক্ত আদায়। এবং সে আদায়ের পন্থা বিচিত্র সব নিষ্ঠুরতা।

পরদিন সকাল হয়েছে টের পেলেও অবন্তীর বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা থাকে না। অধিকন্তু তার একার বাড়িতে প্রবীরকুমারের মতো অভ্যা-গতের উপস্থিতি, সেই জন্যেও দেরি হয়ে যায়। তাকে চা দেওয়া, সে আজ নাট্য জগতের কত বড় অভিনেতা এ ফিরিস্তি শোনা, তারপর

তার টাকার আব্দার। কিন্তু এ কৈফিয়ৎ অফিসের খাতায় লেখা চলে না। লিখতে হলো, মাথার যন্ত্রণায় সারারাত ঘুমোতে পারে নি।

কাল যখন কৈফিয়ৎ লিখতে হয়েছে আজও হবে। কি লিখবে, একই কথার পুনরাবৃত্তি করবে কি না, ভাবতে ভাবতে অবন্তী রাস্তা চলে।

শ্যামলকে আজকাল স্বামী বলে মনে হয় না অবন্তীর। স্বামিত্বের কি বা বজায় রেখেছে সে? অশন বসন ভূষণ, এর কোন্ দায়িত্ব সে পালন করছে? অবন্তীর দেহ থেকে সুখ খুঁটে নেওয়া, দু'চার মাস অন্তর বাড়ি এসে টাকা আদায় করা, এই তার স্বামিত্বের অধিকারের দিক। এ আর সহ্য হয় না, কিন্তু ছাড়ারও উপায় নেই।

কাগজে কলমে অবন্তীর পরিচয় একজন সম্ভ্রমশীলা বিবাহিতা রমণী, শ্যামল সেই পরিচয়ের সাইনবোর্ড। তার সঙ্গে দাম্পত্যের সম্পর্ক আছে বলেই মুখের ওপর কেউ কিছু বলতে পারে না। ঐ সাইনবোর্ড নামিয়ে দিলেই সব মান খসে পড়বে।

শ্যামল অবন্তীর শুচিতা সম্পর্কিত গুডউইল। একান্তই নিরুপায় হয়ে না পড়া পর্যন্ত তাকে ছাড়া যায় না। বিশেষত দুনিয়ার অর্থনৈতিক বাজারে যাকে একা চলতে হয় তার পরিচিতি স্বরূপ এ ধরনের আবরণ না থাকলেই নয়। কিন্তু এই সাইনবোর্ডই মাঝে মাঝে মাথার ওপর ভেঙে পড়তে পারে। প্রতিমুহূর্তে বিবাহ বিচ্ছেদের হুমকি শোনা আর ব্ল্যাক-মেলিং এর ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কাল যখন হুকুম হয়েছে, আজও বি. ডি. ও. বলবেন, খাতায় দেরির কৈফিয়ৎ লিখতে। মাস ছয় হলো লোকটি এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, তারপর থেকেই ব্লকে যতেক অভূতপূর্ব নিয়মের আমদানি। বি. ডি. ও. লোকটি স্বার্থান্বেষী বা চোর নন, বিপদ এখানেই। অবন্তী শুনেছে ইনি বইটই লেখেন। হিন্দি সাহিত্য জগতে কবি হিসেবে কিছু নাম ডাক আছে। ছাত্ররা প্রায়ই তাঁর কোয়ার্টারে গিয়ে ঘিরে ধরে। বাইরের লোক-জন ও আসে। তিনিও কখনো সখনো ছুটি নিয়ে সাহিত্য সভা করতে যান। খবরের কাগজে নাম বেরোয়।

কিন্তু বি. ডি. ও-কে দেখে মনে হয় না কবি বা লেখক। তিনি যে শিল্পী,

প্রবীরকুমারের মতো এ কথা মনে করাবার চেষ্টাও করেন না। প্রবীর-কুমারের সাক্ষাত পাওয়ার পর সব শিল্পীকেই ভয় করতে আরম্ভ করেছে অবন্তী, মনে হয় স্বার্থে একতিল ঘা পড়লে ভাব জগতের নিবাস ছেড়ে জাগতিক পংকিলতার মধ্যে নেমে আসতে তারা মুহূর্তমাত্র দেরি করে না।

শুধু কৈফিয়ৎ লেখার কথাই নয়, পাঁচশ' টাকার চিন্তাটাও মস্তিষ্ক কুরে কুরে খাচ্ছে। শ্যামল অবশ্য সবচেয়ে সহজ ও সঙ্গত উপায় বাতলে দিয়েছে, ডাক্তারের কাছে টাকা চাও, সে দেবে না-ই বা কেন?

কিন্তু এ ভাবে কখনো চায় নি অবন্তী। চাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। এমনিতেই সম্পর্কটা এমন, মনে হয় যেন বৈষয়িক দেনা পাওনার। অনেকেরই তাই ধারণা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরকীয়া প্রেমের খেয়া কড়ির গুণে বেয়ে চলে। বিবাহিতা নারীর অপর পুরুষে আসক্তি, আর্থিক স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোনো মাধ্যমে চিন্তা করা যায় না। উপরন্তু সে পুরুষ যদি হয় উপার্জনশীল অবিবাহিত যুবক, অজস্র কাঁচা পয়সা রোজ-গারী ব্লকের ডাক্তার।

গতকাল তাঁর কাছে মৃদু ভর্ৎসনা শুনেছে, তারপর আজও অবন্তীর দেরি হবে ভাবতে পারেন নি বি. ডি. ও. ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ। সাহিত্য জগতে পরিচয় প্রদীপ নামে। দীর্ঘকায় ছিপছিপে সুঠাম চেহারা, কিন্তু মুখের ভাবে অহেতুক রুক্ষতা। হাজিরার খাতা রাখা থাকে তাঁর নিজস্ব চেম্বারে, এই নতুন নিয়ম।

ঘরে ঢুকে মাথা নিচু করে বি. ডি ও-কে নমস্কার জানিয়ে এক কোণে রাখা হাজরির খাতার দিকে অবন্তী এগিয়ে যাচ্ছিল, বি. ডি. ও. ডাকলেন, 'শুনুন এদিকে?'

অবন্তী এসে বি. ডি. ও-র টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

'আপনার রোজ দেরি হচ্ছে কেন?'

আজকের জবাব অবন্তীর তৈরি, 'আমার স্বামী খুব অসুস্থ।'

বি. ডি. ও-র চোখের দৃষ্টিতে ধারণা স্পষ্ট হয় অবন্তীর কৈফিয়ৎ তাঁর ঠিক বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু অনাস্থা প্রকাশ না করে তিনি প্রশ্ন করেন,

'আপনার স্বামী তো কলকাতার স্টেজ আর্টিস্ট, না ?'
'হ্যাঁ', অবন্তী ঘাড় নাড়ে,'দু'দিন হলো অসুস্থ শরীরে এখানে এসেছেন।' তারপরই সংশোধন করে নেয় সে, 'না, আজ তিন দিন।'

এবার কি অবন্তীর কৈফিয়ৎ বি. ডি. ও-র কিছুটা বিশ্বাস হয়েছে, তিনি সরলভাবে জিজ্ঞেস করেন, 'কি হয়েছে তাঁর ?' কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা ছাড়াও যেন ক্ষীণ সমবেদনার আভাস।

অবন্তী অচিরে নিজের মুখটা চিন্তাছায়াচ্ছন্ন করে তুলে জবাব দেয়, 'বুকের কি একটা যেন, কলকাতার বড় ডাক্তার দেখছেন।'

'যান, সময় দেখে খাতায় সই করুন, কৈফিয়ৎ ঐ লিখবেন।' খবরের কাগজের অন্তরালে বি. ডি. ও. মুখ ডোবালেন।

হাজিরার খাতায় কৈফিয়ৎ লিখতে লিখতে অবন্তীর একটা কথা মনে হলো। ওখানে দাঁড়িয়েই সে বুকের মধ্যে অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করল। দুনিয়ার বাজারে যাকে অহরহ একা চলতে হয় তার বেশি ভয়-বিলাসিতা মানায় না। ভয়, অর্থাৎ বাধা, এ বাধা দূরে সরিয়ে রাখতে না পারলে ঐ অতিরিক্ত বোঝা সমেত তাকে টেনে নিয়ে পথ চলার কেউ নেই। শ্যামল তার সহায় নয়, উটের পিঠের কুঁজের মতো দুর্বহ বোঝা। এবং আজীবনের দায়। হয়তো বা গুডউইল সাইনবোর্ডের মতো কিছুটা সম্পদও সে।

হাজিরা খাতায় কৈফিয়ৎ লেখার পর অবন্তী এসে বি. ডি. ও. ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের টেবিলের সামনে ইতস্তত ভঙ্গিতে দাঁড়াল,'স্যার—?'

খবরের কাগজটা একটুখানি দূরে সরিয়ে রেখে বিরক্তিপূর্ণ আকুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে বি. ডি. ও. তাকালেন, 'বলুন ?'

নিজের চোখ জোড়া অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল অবন্তী, কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যায়, তবু যতটুকু বলা প্রয়োজন ততটুকু কোনো মতে বলে সে,'আমার—আমার স্যার পাঁচশ' টাকা আজ লোন দরকার, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে।'

'কেন ?' বিরক্তিহীন গলায় বি. ডি. ও. প্রশ্ন করেন, উচ্চারিত শব্দে কোনো উত্তাপ নেই।

অবন্তী উত্তর দেয়, 'উনি আজ কলকাতায় ফিরে যাবেন, চিকিৎসার জন্য।'

বি. ডি. ও. উপযুক্ত পরামর্শ দেন, 'অসুস্থ শরীরে কলকাতায় যাবেন কেন, ব্লকের হাসপাতালে ভর্তি করে দিন?'

অল্পক্ষণ চুপ করে থাকে অবন্তী, তারপর বলে, 'কলকাতার একজন বড় ডাক্তার ওঁকে দেখছেন, উনি সে ডাক্তার বদলাতে রাজি নন।'

খুব পাতলা একটা হাসির রেখা বি. ডি. ও. ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের মুখের ওপর জেগে উঠি উঠি করছিল, কিন্তু তা তাঁর পদমর্যাদানুযায়ী গাম্ভীর্যের নিচে চাপা পড়ে রইল। হাসপাতালের প্রসঙ্গ তোলাই ভুল। অবন্তী কোনো মতেই চাইবে না তার স্বামীর সঙ্গে ব্লক হাসপাতালের ডাক্তারের যোগাযোগ বা সাক্ষাত হোক। পতি এবং অপর একজন পতি-তুল্য ব্যক্তির সহাবস্থান দূরের কথা, তাদের পরস্পরের সন্দর্শন, এ কোনো রমণীই চাইতে পারে না।

এতগুলি কথা চিন্তা করার পর বি. ডি. ও. বললেন, 'আপনার স্বামী তো কলকাতার স্টেজ আর্টিস্ট, তাঁর হাতে টাকা নেই? প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা স্যাংশন হতেই ছ'মাস। গভর্নমেণ্টের টাকা পাওয়ার ভরসায় সময় মতো কোনো কাজই করা যায় না। তাছাড়া আপনি আগে কখনো লোন নিয়েছেন কিনা তাও ভেরিফাই করতে হবে, এ তো চেক কেটে ব্যাংক থেকে টাকা তোলা নয়।'

বি. ডি. ও-র প্রশ্নের প্রথম অংশের জবাব দিল অবন্তী, 'অসুখের জন্যে উনি নিয়মিত কাজ করতে পারছেন না, কনট্রাকটের কাজ তো, স্টেজে নামতে না পারলে কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।' তারপর বলল, 'আমি স্যার আগে কখনো লোন নিই নি।'

'এখানে আপনার পরিচিত কেউ নেই, যে টাকাটা ধার দিতে পারে?'

প্রশ্ন করলেও বি. ডি. ও. জানেন এ ব্লকেই এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি যে-কোনো মুহূর্তে অবন্তীকে হাজার পাঁচশ' টাকা দিতে পারেন। অবন্তীর সঙ্গে তাঁর যা সম্পর্ক তাতে ঋণের প্রশ্ন উঠবে না। অবন্তীর দাবি আছে সেখানে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করার দরুন প্রতিদানের অলিখিত

শর্ত। ব্লকে সবাই এ বিষয়ে অবহিত। কিন্তু এত ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও এর জন্যে অবন্তী বা ডাক্তারকে কিছুমাত্র লজ্জিত হতে দেখা যায় না। লোকের চোখে এখন আর ওদের সম্পর্ক বেমানান নয়। কিন্তু অবন্তীর আর্টিস্ট স্বামীর কি এ সংবাদ অজানা? কেবল মাত্র পরস্পরের চোখের আড়াল স্বামী বা স্ত্রীর কাছে অপর পক্ষের জীবনে ভিন্ন সত্বার গভীর সংস্পর্শের কথা গোপন করতে পারে না।

বি. ডি. ও ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের প্রশ্ন শুনে অবন্তীর মন থেকে বিপন্ন আবেদিকার নিরীহ ভাবটা ঘুচে যায়, তবু কণ্ঠে ভিন্ন স্বর এসে যাওয়া সম্বন্ধে সাবধান থেকে সে বলে, 'এমন কেউ আমার আত্মীয় বা পরিচিত এখানে নেই স্যার, যার কাছে আমি টাকা ধার চাইতে পারি।'

এতখানি পরিষ্কার ও স্পষ্টোচ্চারিত জবাব শুনে বি. ডি. ও. কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। ডাক্তারের সঙ্গে প্রণয় সম্বন্ধ অবন্তী কি আধ্যাত্মিক পর্যায়ে তুলে রেখেছে? দৈহিক সম্পর্ক সত্ত্বেও দেহাতীত প্রেমের অভিধা! এ হয়তো অবন্তীর আত্মদোষ প্রক্ষালনের নৈতিক অজুহাত। মেয়েরা অনেক সময় এ ধরনের ভুল করে। অবন্তীর উচিত বিপথ-গামিনী বুদ্ধিমতী নারীর মতো নিজের ভবিষ্যৎ ভালোভাবে গুছিয়ে নেওয়া।

ডাক্তার এখনো অবিবাহিত। অল্পবয়সী যুবক। আর্টিস্ট স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে অবন্তী ডাক্তারকে বিয়ে করতে পারে। সে সম্মত না হলে তাকে বাধ্যতায় আনা যায়। তা যদি অবন্তী না চায় সে ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমস্বরূপ অর্থের সেতু—। এই সেতু উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তার তার জীবনের কূলে আসুক, যৌবন নিকুঞ্জে শান্তির আস্তানা অনুসন্ধান করুক। অবন্তীর প্রেমের যা স্বরূপ তাতে সবদিক দিয়ে ঠকে যাওয়ায় সার্থকতা নেই। অবৈধ প্রেমে প্রতারিত হওয়ার বাসনা না থাকাই উচিত।

কিছুক্ষণ পরে বি. ডি. ও. প্রশ্ন করেন, 'আপনার স্বামী কখন কলকাতায় যাবেন?'

অবন্তী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, 'আজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হতে হবে। তারপর ভাগলপুর গিয়ে রাত আটটায় ট্রেন ধরবেন।

'বেশ—।' বি. ডি. ও. কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, তারপর কোনোদিকে

না তাকিয়ে বললেন, 'বিকেল চারটের সময় আমার চাপরাশি গিয়ে আপনাকে পাঁচশ' টাকা দিয়ে আসবে। আপনি প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে লোনের জন্যে আজই দরখাস্ত দিয়ে দিন, টাকা পেলে আমায় ফেরত দেবেন। এ ছাড়া আর কোনো সহজ উপায় দেখি না।'

অবন্তীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'আপনি নিজে স্যার টাকা দেবেন!'

বি. ডি. ও. খবরের কাগজ টেনে নিয়ে তাতে চোখ ডুবিয়ে দিলেন। তারপর কতকটা সংকোচপূর্ণ স্বরে বললেন, 'এ তো আমার কর্তব্য। আপনি এখন নিজের কাজে যান, রিপোর্ট লিখে ফেলুন।'

বিস্ময়াহত অবন্তী তবু সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

৮

বি. ডি. ও-র কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে অবন্তী বড় ঘরটাতে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। তার মতো দু'একজন ফিল্ড স্টাফ ভিন্ন অফিসে আর কেউ এখনো আসে নি। আর সবার হাজিরার সময় সাড়ে দশটা। আগে দুপুর দুটো গড়িয়ে না গেলে কেউই বড় একটা এসে পৌছতো না। দু'দিন বাদ দিয়ে তৃতীয় দিন এসে হাজিরা সই করলেও মোটের ওপর চলে যেত। তবে যাদের চাকরির বেতনের সঙ্গে বাড়তি কাজের দরুন উপরি তাদের হাজিরা নিয়মিত। সত্যিকার অফিস চালাত তারাই।

ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ বি. ডি. ও. হয়ে আসার পর নিয়ম পাল্টেছে। অবন্তীকেও প্রতিদিন সকাল আটটায় হাজিরা সই করে অফিসে বসে গতকালের ফিল্ড সার্ভিস রিপোর্ট লিখতে হয়। সে রিপোর্ট বি. ডি. ও.-র ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তারপর তার ফিল্ড সার্ভিসের পদযাত্রা। প্রতিদিনের রিপোর্ট বি. ডি. ও. দৈনিক দেখেন। রিপোর্টের পাশে লাল কালিতে মন্তব্য লিখে আবার অবন্তীর টেবিলে পাঠিয়ে দেন। এ কাজ তিনি কখন করেন, তা অবন্তী দেখে নি। অফিসের প্রায় প্রতিটি ফাইলে তাঁর প্রাত্যহিক স্বাক্ষর। সবাই তটস্থ।

নিজের আসনে বসে অবন্তী রিপোর্ট লেখার কথা চিন্তা করতে লাগল। গতকাল সে কি কি কাজ করেছে, কোথায় কোথায় গেছে, কিছুই যেন মনে পড়ে না। অবশ্য প্রতিটি রিপোর্টে আট আনা ভেজাল। আগে থাকত পৌনে ষোলো আনা। নতুন বি. ডি. ও. আসার পর ভেজালের ভাগ কমেছে। কিন্তু কোনোদিনই তা একেবারে ঘুচে যাবে না। অবন্তীর কাজটাই এমনি, ভেজাল দেওয়া ছাড়া পরিবেশনের উপায় নেই।

উইমেনস্ ওয়েলফেয়ার সুপারভাইজার !

এ পদের অর্থ বুঝতেই অবন্তীর প্রায় পুরো একটা বছর কেটে গিয়েছিল। তবে আটকায় নি তাতে। চাকরির ব্যাপারটা সে ঠিক মতো অনুধাবন করতে না পারলেও মাসের পয়লা তারিখে পে-বিল তৈরি বন্ধ থাকত না। আগেকার বি. ডি. ও-দের অনেকেই ব্লকটাকে ঠাট্টার চোখে দেখতেন। ব্লকে মন্ত্রীর আবির্ভাব এবং সংবর্ধনা ভিন্ন কিছুই আর বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ভাবে চিন্তা করতেন না।

অবন্তীর কাজ ব্লকের অন্তর্গত সবকটি পরিবারের জেনানা মহলে বিচরণ করা। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও গৃহ-শিল্প সম্বন্ধে অবহিত করে তোলা। প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে সাহায্য দেওয়া। এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো। টিউব লাইগেশনে অনীহা দেখলে লুপ গ্রহণে উৎসাহিত করা। এখন এটাই প্রধান।

একটি ব্যাপারে অবন্তী বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। ব্লকে যতগুলি পরিবার, তাদের প্রতিটি সাবালিকা বিবাহিতা ও অবিবাহিতা নারীর কুলুজি তার তৈরি। উপরন্তু একটা বাড়িতে ঢুকলে সারা তল্লাটের নারী-কুল সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ। তারপর আর রিপোর্ট তৈরি আটকায় না। তবে এই নতুন বি. ডি. ও. প্রায়ই বাড়ি বাড়ি ঘুরে রিপোর্ট ভেরি-ফিকেশন করেন। আগেকার বি. ডি. ও-রা রিপোর্টের পাশে স্যাটিস-ফ্যাকটরি লিখেই ক্ষান্ত থাকতেন।

শ্যামল বাড়ি আসার পর অফিসে এসে হাজিরা সই করা, দেরির কৈফিয়ৎ, ও কাজের মিছে রিপোর্ট লেখা ছাড়া অবন্তী দুদিন আর কারো

বাড়িই যেতে পারে নি। সংসারের বাড়তি কাজ, রাত্তিরবেলা বৈধ দাম্পত্য জীবনের অঙ্গীকার স্বরূপ পৈশাচিক জুলুম ভোগ ও অফিসে হাজিরা, এরপর আর কারো বাড়ি গিয়ে গায়ে পড়া উপদেশ দেওয়ার মতো শরীর বা মনের অবস্থা থাকে না।

অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও তবু বেশ অভ্যস্ত হাতে কয়েকটি নাম ধরে নিয়ে অবন্তী রিপোর্ট লিখে চলেছে। আগামী বুধবার উর্মিলা হাসপাতালে এসে অপারেশন করাতে রাজি হয়েছে। তার ছুটিমাত্র মেয়ে, ছেলে নেই, সহজে সম্মতি দেয় নি। মঙ্গলবার আমায় নিজে গিয়ে তাকে এনে হাস-পাতালে ভর্তি করতে হবে। ইতিমধ্যে আবার সে মত পালটে না বসে। তাকে আরও বেশি টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আর সুযোগ সুবিধের কথা বলেছি।

গায়িত্রী এবার পঞ্চম শ্রেণীতে উঠতে পারে নি, সেই রাগে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ওকে বুঝিয়েছি সে পণ্ডিত বংশের মেয়ে, তার নিজেরও সেই পরিচয় থাকা দরকার। আবার স্কুল যেতে উপদেশ দিয়েছি। যদি যায় তাহলে হেডমিসট্রেসকে তার বিশেষ পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলব, যাতে সে এ পরীক্ষায় পাস করে যায়। গায়িত্রীর একটিমাত্র সন্তান, ছেলে। কিন্তু আর না হওয়াই ভালো, একমাত্র ছেলেকে ভালোভাবে মানুষ করতে পাববে। অপারেশনের কথা এখনো বলি নি, আগে সে আবার স্কুলে যাক, তারপর বলব। একসঙ্গে দু' তিনটি প্রস্তাব দিলে সব-গুলোই হয়তো অগ্রাহ্য করবে।

খুবই অন্যমনস্কভাবে রিপোর্ট লিখছে অবন্তী, কিন্তু নিপুণ অভ্যেসের দরুন কোনো ত্রুটি নেই। শ্যামলের অন্যায় জুলুমের খেসারৎ দিতে যে পাঁচশ' টাকা আজই প্রয়োজন তার বন্দোবস্ত অবিশ্বাস্য রকমে হয়ে গেছে। বি. ডি. ও. ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ অবশ্য টাকার খনি। অবন্তী শুনেছে তাঁর নিজের অন্তত হাজার বিঘে জমি। উপরন্তু দু'ভাইএর সম্মিলিত অর্থে তৈরি একটি সিনেমা হাউস। নিজেকে যাতে বেকার মনে না হয় তাই এই চাকরি। কিন্তু এসব তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, টাকা আছে বলেই কে আর সেধে পরোপকার করতে যায়! বরং নিজের অভিজ্ঞতায় অবন্তী

জেনেছে সাধারণ মানুষের তুলনায় ধনী ব্যক্তির পরোপকারের স্পৃহা অনেক কম।

বি. ডি. ও. এই উপযাচিত পরোপকারের দাম চাইবেন না তো ? অবন্তীর সঙ্গে ডাক্তারের যা সম্পর্ক, এবং তা সর্বত্রই এমন সুপ্রচারিত, যে তাকে একজন সহজলভ্যা নারী মনে করা অন্যায় নয়। সেদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে, বি. ডি. ও. যদি তাঁর কৃত উপকারের মূল্য চুক্তি চান, তা তাঁর নিজের পক্ষে কোনো অযৌক্তিক দাবি বিবেচিত হবার যোগ্য নয়।

কিন্তু এ হলো বি. ডি ও-র পক্ষের কথা, যদি এমন অবস্থা এসেই যায় সেক্ষেত্রে অবন্তীর করণীয় কি ? সে কি উপকারের মূল্যচুক্তি দিতে আত্ম-সমর্পণ করবে ?

অবন্তীর মনের ভেতরটা হঠাৎ ডাক্তার সম্বন্ধে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কেন রাগ, অবন্তী নিজের মনের ভেতরটা বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করে, অথচ হাতের কাজে বিরাম নেই। দুটো শেষ হয়েছে, অন্তত আরও তিনটি ভিজিটিং রিপোর্ট লিখতে হবে। গতকালের কাজের নিরিখ। এ কাজ চুকিয়ে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের ঋণের জন্য একটি দরখাস্ত। এই ধরনের দরখাস্ত সে আগে কখনো লেখে নি। কাকে সম্বোধন করবে, কি বয়ান হবে, তা জানে না। বড়বাবুর সাহায্য নেওয়া দরকার, কিন্তু তাঁর সাক্ষাত পেতে সাড়ে দশটা, তারপরও ফুরসৎ মতো ধরতে বেলা বারোটা। তার আগে বড়বাবু আর কারো নন, তিনি বি. ডি. ও-র বশংবদ !

কিন্তু এসব নয়, ডাক্তারের ওপর রাগের কারণটাই অবন্তী ভাববার চেষ্টা করছিল। অথচ ডাক্তার জানে না অবন্তীর হঠাৎ টাকার প্রয়োজন পড়ে গেছে। অবন্তী মরে গেলেও তার কাছে টাকা চাইতে পারত না, কিন্তু প্রয়োজনের কথা জানতে পারলে সে দেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করত। বিশেষত এ টাকা যখন ডাক্তারের নিজের সতীন বিদায়ের কাজেই দরকার।

বি. ডি. ও-র ঋণ শোধ করতে হবে, তিনি বলেছেন, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের লোন পেতে অন্তত ছ'মাস। অর্থাৎ টাকা আদায়ের ব্যাপারে তিনি মাস ছয় অপেক্ষা করতে রাজি। এই ছ'মাস যদি অবন্তী একটু কষ্ট করে চলে, বেতন থেকে কিছু আর ফিল্ড অ্যালাউন্সের সবটা আলাদা বাঁচিয়ে

রাখে, তাহলে ছ'মাসেই ঋণ শোধ হয়ে যাবে, যদি না ইতিমধ্যে তিনি সুদ হিসেবে, অথবা মূলের ঘর থেকে, অন্য কিছু চেয়ে বসেন। না, তেমন অবস্থায় পড়লে অবন্তী চাকরি ছেড়ে দেবে, বা ডাক্তারের কাছ থেকে টাকা চেয়ে ঋণ শুধবে।

শ্যামল এসেছে আজ তিনদিন, সে আসার পর থেকে ডাক্তারের সঙ্গে অবন্তীর দেখা হয় নি। ডাক্তার অবশ্যই শ্যামলের আগমন প্রস্থানের খবর রাখছে। আজ বিকেলে শ্যামল টাকা নিয়ে বিদায় হবে, যাবার আগে অবন্তীকে তার পাশে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বাধ্য করবে। বিশ্রাম, চিন্তা করলেই অবন্তীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। নিষ্ঠুরতার এত পথও সভ্য মানুষের জানা থাকে?

ডাক্তার নিশ্চয়ই আজ সন্ধ্যেবেলা অবন্তীর খোঁজ নিতে আসবে। সে এলে অবন্তী বলবে, তোমার সতীন এসেছিল, তাই এ ক'দিন দেখা করতে পারি নি। এই কথা বলে ডাক্তারের মনে একটা ঈর্ষার কাঁটা বিঁধিয়ে দেবে সে। ডাক্তার অবন্তীর বাড়ি আসে, অবন্তীও যায় তার নিঃসঙ্গ কোয়ার্টারে। নিরালা দুপুরে। কিংবা সন্ধ্যের নিঃসীম অন্ধকারে। এ দেখা সাক্ষাতের কোনো সাক্ষী তারা রাখতে চায় না, কিন্তু এই বর্ধিষ্ণু গ্রাম, আর আশপাশের আরও কয়েকটা গ্রাম যেন সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। তাদের মুখের ভাব দেখেই তা বোঝা যায়।

'মিসেস দত্তা!' ও পাশের টেবিলের ধারে বসে রিপোর্ট লিখছিল দুখারাম বৈঠা। অবন্তীর মতো সে-ও একজন ফিল্ড স্টাফ। ম্যাট্রিক পাস করে চাকরিতে এসেছিল, এখন প্রাইভেটে আই. এ. পাস। আগামী বছর বি এ. দেবে। তারপর কোনো একটা কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসে সংরক্ষিত আসনের ওপর অধিকারের জোরে অনেক উঁচুতে চলে যাবে। হয়তো একদিন আবার এখানেই বি. ডি. ও. হয়ে আসবে। এখন তার চাকরির পদ অবন্তীর পাশাপাশি। বসেও সমপর্যায়ের আসনে। অবন্তী তবু মাঝে মধ্যে ফিল্ড সার্ভিসে যায়, দুখারাম কভু নয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বাড়ি ফিরে গিয়ে ইংরেজি বা ইকনমিক্সের নোট মুখস্থ করতে বসবে। বি. ডি. ও. সবই জানেন, কিন্তু তাকে বিশেষ ঘাঁটান না। অন্তত

দুখারাম তাই বলে।

মুখে একফালি হাসি টেনে এনে অবন্তী দুখারামের কালো মুখাবয়বের দিকে তাকাল, 'কি বলছেন?'

সগর্ব মুখভঙ্গি করে দুখারাম বৈঠা বলল,'আপনার পতি এসেছেন, কাল বাজারে দেখলাম?'

মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল অবন্তী, 'হুঁ।'

'শুনলাম তিনি ফিল্মে নামতে চলেছেন, কোথায়, কলকাতা না বম্বে?'

এ কথা শ্যামল বা প্রবীরকুমার অবন্তীকে পর্যন্ত বলে নি, তাছাড়া সিনেমা সম্বন্ধে শ্যামলের মনোভাব খুবই বিরুদ্ধ, ওখানে নাকি প্রকৃত শিল্পীকে হত্যা করে তার মমি নিয়ে পরিচালক নিজের খুশি মতো ভেল্কিনাচ নাচায়! তাই যে ব্যক্তি প্রবীরকুমারের আদর্শ সে পর্যন্ত ছায়াছবির জগতে পা বাড়ায় নি।

কিন্তু দুখারামের কাছে এ প্রসঙ্গ না তুলে অবন্তী সংক্ষেপে বলল, 'কলকাতায়।'

'সেখানে কিন্তু না খেতে পেয়ে মরবেন।' দুখারাম অবন্তীকে সাবধান করে দেয়,'আপনার পতির অমন সুন্দর চেহারা তাঁকে বলুন বম্বে চলে যেতে Where there is mountain of money; টাকার পাহাড়!'

'তাই বলব, তবে—।' অবন্তী থেমে গেল।

'আর্টিস্টের খেয়াল, এই তো?'

'হুঁ।' অবন্তী হাসল।

'আমাদের বি. ডি. ও-ও তো আর্টিস্ট, কিন্তু লোকটা হাসতে জানে না, যেন পুলিশের হাবিলদার। ওর কবিতা আপনি পড়েছেন?'

'না।' অবন্তী সত্যি কথাই বলে। অফিসের কাজে সে হিন্দি লেখে, তবে হিন্দি সাহিত্য পড়ে না। বাংলাই বা কি পড়ে? কয়েকজন বড় বড় লেখকের নাম ছাড়া বাংলা সাহিত্যের সে বিশেষ কিছুই জানে না।

'আমি পড়েছি। লেখা পড়ে মনে হয় মানব দরদী, কিন্তু আমরা তো দেখি আমাদের জবাই করবার জন্যেই যেন আপিসে আসে। He is always after our heads! ও যদি দেখে আপনি ডুবে যাচ্ছেন,

আপনাকে ধাক্কা দিয়ে আরও গভীর জলে ঠেলে দেবে।'

'তাই নাকি!' অবন্তী শিহরিত গলায় বলে।

'যে কোনো ব্যাপারে ওকে অ্যাপ্রোচ করে আপনি দেখতে পারেন।' তুখারামের কণ্ঠস্বরে স্থির বিশ্বাসের নির্দেশ।

তুখারাম বৈঠার আস্থাপূর্ণ কণ্ঠস্বব অবন্তীর দু-কানের মধ্যে গরম সিসে ঢেলে দেয় যেন। অনাগত আশংকার অসহ্য যন্ত্রণায় মস্তিষ্ক প্রায় বিকল হতে বসে। তবু একটা কথা মনে হয় তার, এখুনি গিয়ে বি. ডি ও-কে বলে টাকাব প্রয়োজন নেই। কথাটা মনে হওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। বি. ডি ও-র কক্ষেব সুমুখে গিয়ে দাঁড়ায়। পর্দাটা বা হাতে সরিয়ে ঘবে উঁকি দেয় একবাব। বি ডি. ও-ব চেয়ার শূন্য, কখন যেন অফিস ছেড়ে চলে গেছেন তিনি। অবন্তী অসহায় চোখে শূন্য ঘবটার ভেতর তাকিয়ে থাকে।

৯

অবন্তীব অনুমানে ভুল নেই। ঠিক সন্ধ্যেব পব ডাক্তাব এলো। তার ঘড়ি-ধবা সময়ে। রাত আটটায়। আটটা বোধহয় এখন রাত বলা যায় না, খুঁজে পেতে দেখলে দিনেব আলোব ক্ষীণ রেশ বাইবে ইতস্তত দেখতে পাওয়া যাবে, যেখানে গাছপালা নেই, বাড়ি ঘরের ছায়া পড়ে অন্ধকার হয়ে যায় নি।

অবন্তীর মনে হলো বাধা না পেয়ে ডাক্তার আজকাল খুবই নির্ভীক হয়ে উঠেছে, অথবা মনে করেছে অবন্তী এমনি এক নিরীহ সর্পিনী যে কখনো ঘুরে দংশন করবে না। পরস্ত্রী সর্পিনী সমান, অথচ সেই সাংঘাতিক খেলায় ডাক্তার মেতে আছে। ক্রমশই ভয়ডরহীন হয়ে পড়ছে সে। অধিকন্তু বেহায়া ও নির্লজ্জ।

শ্যামল গেছে মাত্র তিন ঘণ্টা, তার গায়ের ঘ্রাণ এখনো অবন্তীর শয়ন-কক্ষের বাতাসে টের পাওয়া যায়, এই পরিবেশে ডাক্তার যেন সত্যি

সত্যিই সম্পূর্ণ বহিরাগত পুরুষ। তার সঙ্গে অবন্তীর কোনোকালে কোনো সম্বন্ধ নেই। এমনকি যৎকিঞ্চিৎ সৌজন্য সূচক পরিচয় পর্যন্ত নয়।

অভ্যস্ত ও অকুণ্ঠ পদক্ষেপে ডাক্তার ভাস্কর মুখার্জি ঘরে ঢোকে, মুখে সেই বিশেষ ধরনের হাসি, যা অবন্তী ভিন্ন অপর কারো কখনো দেখার সুযোগ হয় নি।

নিয়মমতো অন্য আসন ছেড়ে ডাক্তার অবন্তীর শয্যার দিকে এগিয়ে যায়, সাধারণত এখানেই তার উপবেশন বিশ্রাম ও শয়ন, কিন্তু ইতি-মধ্যেই তার দিকে প্রকৃত বিস্ময় ও বিরক্তিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে অবন্তী বলে ওঠে, 'আপনি, হঠাৎ যে?'

ডাক্তার ততোধিক বিস্মিত, 'মানে? তিনদিন তোমার দেখা নেই!'

অবন্তীর গলায় ঠাণ্ডা শ্লেষ, 'সংসার বলে আমারও তো কিছু একটা আছে! আপনার মতো আমি দায়দায়িত্বহীন মুক্ত পুরুষ নই যে যা প্রাণ চায় সবসময় তাই করে বেড়াতে পারব?'

বোধহয় একটা অপ্রিয় সত্য বলতে যাচ্ছিল ডাক্তার, কিন্তু সে ভাব অনেকখানি সামলে নিয়ে কতকটা আপাতদর্শন নিরীহ ধরনের জবাব দিল, 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম দিন তিনেক আগে অভিনেতা এসে-ছিলেন! সত্যি বলতে, তুমি যে বিবাহিতা একথা আমার তো মনে থাকে না!'

'কি মনে হয়, কুমারী?' অবন্তী ত্বরিত শব্দে ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্ন করে।

অবন্তীর ভাবভঙ্গি দেখে ডাক্তারের প্রথমটা ধারণা হয়েছিল, এ তার এক ধরনের প্রণয়লীলা, কিন্তু এতখানি সময় যাওয়ার পরও অবন্তীকে অপরিবর্তিত দেখে তার মনে হলো তাদের এই অবিধিবদ্ধ, কিন্তু নিরুপ-দ্রব সম্পর্কের মাঝখান দিয়ে কোনো আকস্মিক ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয়ে গেছে। আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে ডাক্তার প্রশ্ন করে, 'তোমার আজ হঠাৎ কি হয়েছে বল তো অবন্তী?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।' অবন্তী দাঁড়িয়েছিল, এসে খাটের ওপর বসল। সারা বিছানার এখনো লণ্ডভণ্ড অবস্থা, সাড়ে তিন ঘণ্টা

আগে এখানে যে বিপুল খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে তার সাক্ষ্য মুছে ফেলতে সে ভুলে গিয়েছিল যেন। বিছানায় এসে বসার পর বিছানার অবস্থা নজরে পড়ে। হাতে করে আস্তে আস্তে চাদরটা টেনে ঠিক করতে থাকে সে, যেন ডাক্তারের দৃষ্টি এদিকে না আসে।

অবন্তীর প্রশ্নের শুকনো জবাব, না সেইসঙ্গে আবও কিছু দেওয়া প্রয়োজন? ডাক্তার চিন্তা কবে, অবন্তীর পাশে গিয়ে বসে একহাতে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে একটা চুমু দিয়ে বলবে কি, তোমাকে আমার কুমারী বলেই মনে হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে এর চেয়ে অনেকখানি, অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ে অসংখ্য বার এগিয়ে গিয়ে থাকলেও এখন যেন সাহসের কোথায় একটু ঘাটতি পড়েছে। প্রথমটা বাধা পড়েছিল, তাই এবারেও বিছানার দিকে এবং অবন্তীব পাশে এগিয়ে না এসে অদূরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখা নিচু টুলটাতে গিয়ে বসল সে, তারপর বলল, 'আমার কাছে তুমি চিরদিনই কুমারী। ওঃ, তোমার বিছানাব অবস্থা কি হয়ে রয়েছে?'

বাঁ হাতে প্রায় **নিস্তব্ধ সঞ্চারে** চাদর টানছিল অবন্তী, যেন নিজের অজান্তেই, তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়ে গম্ভীর মুখে বসে রইল। ইচ্ছে হচ্ছিল উত্তর দেয়, এটা বিছানা নয়, সুখী দম্পতিব রতিযুদ্ধ ক্ষেত্র। তা না বলে একটু মিথ্যের আশ্রয় নিল সে, 'ভোরবেলা উঠে অফিসে দৌড়তে হয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে পাঁচ বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো, তারপর আর সময় পাই নি।' কথাগুলো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল অবন্তী, এবার সোজাসুজি ডাক্তারের চোখের দিকে তাকাল সে, 'আচ্ছা, আমি যদি কুমারী তো আমায় বিয়ে করছেন না কেন আপনি?'

এ প্রশ্নের সুযোগ অবন্তী ইতিপূর্বে বহুবার পেয়েছে, কিন্তু নিজের ইচ্ছে-তেই প্রসঙ্গের পাশ কেটে থেকেছে সে। প্রথমটা এই ভয় অথবা ভাবনা ডাক্তারের মধ্যেও ছিল। কিন্তু অবন্তীর আচরণই বরাভয়স্বরূপ; ক্রমশ এ চিন্তার ছায়া অবধি ডাক্তারের মন থেকে ঘুচে গিয়েছিল। আজ আকস্মিক প্রশ্ন শুনে যেন থতমত খেল ডাক্তার, 'আইন রাজী হবে?' অবন্তী বলে, 'সে ব্যবস্থা তো এগিয়ে এসে আপনারই করা উচিত।'

অবন্তী আজ বড় বেশি রূঢ়, অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী ও বাস্তববাদী। প্রথমাবধি যে ধরনের কথা বলছে তাতে সে নিজেই মনে মনে খুব বিস্মিত! অতএব তার কথা শুনে ডাক্তারের বিস্ময় কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ কথা চিন্তা করতে গিয়ে অবন্তী প্রায় নিজের অজ্ঞাতে হেসে ফেলে, যদিও সে হাসির রং অত্যন্ত ফিকে, সুরও চিন্তাক্লিষ্ট।

অবন্তীর ছোট্ট হাসি ঘরের নতুন এবং অসহ্য বদ্ধতাপূর্ণ আবহাওয়ায় পরিচিত ও অভ্যস্ত প্রাচীন পরিবর্তন এনেছে যেন। ডাক্তার ভেতর ভেতর হাঁফ ছেড়ে এবার অবন্তীর কাছে এগিয়ে এলো, তাকে দু-হাতে তুলে দাঁড় করিয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ঠোঁট ও গালে চুমু দিতে দিতে বলল, 'তিনদিন তোমায় দেখতে পাই নি, ছুঁতে পাই নি। জানো অবন্তী, দুটো রাত আমি ঘুমোই নি পর্যন্ত, যে মুহূর্তে শুনেছি অভিনেতা এসেছে। মাথার মধ্যে এতসব আজেবাজে চিন্তা ঘুরছিল যা তোমায় পর্যন্ত বলা যায় না। আমার শুধু মনে হতো অভিনেতা তোমায় দিন-রাত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ঐ বিছানাটা দেখে আমার মনে জ্বালা ধরে যাচ্ছিল!'

অবন্তী স্থির করেছে আজ থেকে নিজেকে কঠিন অবরোধে ঘিরে রাখবে, ডাক্তারকে আর কোনোদিন তার নাগাল পেতে দেবে না। তাই ডাক্তারের কথায় আমল দিল না সে, ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল, 'কই, আমার কথায় উত্তর দিলেন না?'

'কোন্ কথা?' আহত কণ্ঠস্বরে ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

অবন্তীর দুটি চোখে অস্বাভাবিক অগ্নিরেশ, 'আমায় বিয়ে করছেন না কেন?'

'তুমি তো আগে কখনো বল নি?' ডাক্তার অচিরেই প্রতিপ্রশ্ন করে, যেন অবন্তীর প্রহার এইভাবে তাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে সে।

ডাক্তারের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায় অবন্তী, ডান হাতখানা তুলে খাটের বাজুতে আশ্রয় করে, তারপর ডাক্তারকে

বাচনিকভাবে আক্রমণ করে সে, 'সব আমাকেই বলতে হবে? বেশ, এখন বলছি, যতদিন না আমায় বিয়ে করে সসম্মানে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলছেন, ততদিন আমার কাছে আসবেন না। আপনার ওপর আমি কোনো দায় চাপাচ্ছি না, যদি আমায় সত্যিই ভালোবাসেন আমায় বিয়ে করুন, নাহয় মনের মতন পাত্রী দেখে তাকে বিয়ে করুন। আপনি ভদ্রঘরের ছেলে, এভাবে আপনার জীবন কাটানো উচিত নয়। আমার কথা নয় নাই ভাবলেন। অভিনেতার স্ত্রী, তার চরিত্রদোষ থাকতে পারে, কিন্তু আপনার নিজের খানিকটা সামাজিক মর্যাদা আছে, সম্মান আছে।'

এরপর অবন্তী সে ঘরে আর দাঁড়াল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ডাক্তার, তারপর নিজের মনের সর্বাঙ্গে খানিকটা বিস্ময় ও অপমান মেখে সে-ও বেরিয়ে গেল। বাইরে গ্রীষ্মের রাত, এখনো যেন বিশেষ আঁধার হয় নি।

১০

'উকিল তো পয়সায় দু'গণ্ডা কিনতে পাওয়া যায়, যে কোনো কোর্টের বটতলাগুলো দেখিস নি? কালকেউটের মতন উকিল গিজ্‌গিজ্‌ করছে, দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে, কাছে গেলে ভয় ধরে যায়!' কোন্ এক প্রসঙ্গে যেন কাটিহার রেল স্টেশনের এ এস এম. পিতার কাছে শোনা কথাটা ক্লাসের মেয়েদের কাছে বলে প্রচুর হাসিভরা বাহবা কুড়িয়েছিল কাটিহার কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী উশ্রী গাঙ্গুলী।

'মনে কর যদি উকিলের সঙ্গেই তোর বিয়ে হয়?' প্রশ্ন করেছিল কেতকী। হাতের পাতার সাহায্যে নিজের গলায় বেড় দিয়ে উশ্রী অনেকখানি জিভ বার করেছিল, 'তাহলে এইভাবে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা। To be hanged by neck till death!'

'আর তুই নিজেই যদি উকিল হোস্?' এ জিজ্ঞাসা অনুরাধার।

'না—।' এবার একটা খুব খারাপ কথা বলে ফেলেছিল উশ্রী, 'তার-চেয়ে সোজাসুজি মার্কেটে নেমে পড়া ভালো, তাতে কুল-মান গেলেও পেট তো ভরবে।'

'উকিল মানে কি তাই?'

উশ্রী গম্ভীর গলায় বলে, 'আমি মেয়ে উকিলের কথা বলছি।'

আর কথা এগোয় নি তারপর।

উশ্রী প্রায় মনস্থির করে ফেলেছে। উকিল বর অথবা উকিলের পেশা, এর কোনোটাই সে কখনো গ্রহণ করবে না।

ভাস্করের সঙ্গে বিয়ের সময় উশ্রী একুশ পূর্ণ হয়ে বাইশ। কাটিহার কলেজে তার পছন্দ মতো বিষয়ে অনার্স পড়ার ব্যবস্থা ছিল না, তাই সাদামাঠা ডিশটিংশন সমেত বি.এ. পাস। ইচ্ছে ছিল কলকাতায় গিয়ে এম. এ পড়া, যদি অনার্স না থাকা সত্ত্বেও ভর্তি হওয়া যায়, নচেৎ ভাগলপুর। কিন্তু কোনোদিকেই এগুতে পারা যায় নি, কারণ অগ্নিসমা রূপের বাধা।

উশ্রী অবশ্য নিজেকে তেমন রূপসী মনে করে না। মা আর ছোটমাসির মাঝখানে তাকে বসিয়ে দিলে মধ্যিখানটা অন্ধকার হয়ে থাকবে, সে কারো চোখে পড়বে না। কিন্তু পথ চলতে, পাড়া বেড়াতে বা কলেজ যেতে মা বা ছোট মাসিকে কখনো তো পাশে পাওয়া যায় নি, তাই অনেকেই নানা প্রসঙ্গে তার মনে একটা ধারণা গজিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, সে সত্যিকার সুন্দরী। অবশ্য যৌবনের নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চাশ পারসেন্ট নম্বর আগেভাগে বসিয়ে দিয়ে তারপরই রূপের বিচার আরম্ভ হয়, সেদিক থেকে উশ্রীর রূপ আশি পারসেন্ট। ঈষৎ চাপা নাক, পাঁচ ফুট আধ ইঞ্চি উচ্চতা, যা অ্যাভারেজের চেয়ে কিছুটা কম, তার জন্যে কত আর কাটা যাবে, পনেরো? আর অস্পষ্ট ভ্রু'র দরুন পাঁচ। সাকুল্যে কুড়ি বাদ। তাহলেও তো বিশেষ সম্মানের লেটার নম্বর আশি!

অতএব বি এ. পাসের পর উশ্রীর আর এম এ. পড়া হয় নি। অধিকাংশ মেয়েরই তো উচ্চশিক্ষা ও সঙ্গীত সাধনা বিয়ের বাজার তৈরির জন্যে, উশ্রীর সে বাজার স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাস করার সময়ই প্রস্তুত, তবু

কতকটা নিজের জিদের ফলেই সে বি. এ. পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পেরে-ছিল। মা'র বিরোধিতা গ্রাহ্য করে নি। বাবার নিস্পৃহাও মনে দাগ দেয় নি। বি. এ পরীক্ষা দেওয়ার পর চারিদিক থেকে এত বেশি সম্বন্ধের জোয়ার আসতে লাগল যে তারই মধ্যে একটা ভালো কূল বেছে নিয়ে ভেসে পড়া ছাড়া কোনো উপায় রইল না। বাপের বাড়িতে মেয়েরা তো চিরকালই আঘাটার নৌকো, সে পাঁচশ' বছর আগের উপাখ্যান, বা বিশ শতকের ছ'দশক পারের ইতিকথা—যাই হোক! তাই বিয়ের ব্যাপারে উশ্রী আর না বলে নি।

এবং একটা উপযুক্ত ঘাট বেছে নেওয়ার সকল সুযোগও উশ্রী পেয়েছে। উশ্রীর ঠিক ওপরই কোনো বোন নেই, নিচেও না, এবং সবচেয়ে বড় যে দিদি, বলতে গেলে বাপের বাড়ি সে কখনো আসে না, দৌত্য করতে মা'কেই এগিয়ে আসতে হয়, কিন্তু তাতে হয়তো কন্যার মনের ঠিক তথ্যটা পাওয়া যাবে না, তাই মা রেবতীদেবী এ ব্যাপরে একটা মাধ্যম খুঁজে বার করেছিলেন। ললিতা পুরকায়স্থ, যার পাকানো শরীরের জন্যে কলেজের মেয়েরা লুকনো নাম দিয়েছিল মিস ঝিংলি, উশ্রীর সহপাঠিনী ও প্রতিবেশিনী, তাকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি।

ললিতা আসতে রেবতীদেবী প্রশ্ন করেন, 'একটা কাজ করতে পারবি মা?'

ললিতা প্রথমেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়, তারপর বলে, 'বলুন মাসিমা।'

রেবতী দেবী ললিতার সুমুখে দুটো ফোটো এগিয়ে দিলেন, দুটিই যুবকের ছবি। 'উশ্রীর সম্বন্ধ এসেছে, রোজই তো গাদা গাদা আসছে, কিন্তু তেমন পাত্র আর কই মা, যার হাতে মেয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়? এই ধুতি পরা ছেলেটি উকিল, বর্ধমানে ওকালতি করে, সেখানে বাড়ি। জমি জায়গা বাপের অনেক, তবে পাঁচ ভাই। আর আজ-কাল মেয়েরাও তো সম্পত্তির ভাগ পায়? তিন বোন। এর চেহারাটা দেখেই আমার বেশি পছন্দ, নয়তো—। আর এই হাওয়াই সার্টপরা ছেলেটি ডাক্তার। ব্লকে চাকরি করে। দেখতে শুনতে এও কিছু মন্দ না,

তবে যার যেমন পছন্দ। আমাদের বিয়ের সময় কে-ই বা এত মেয়েদের মত জিজ্ঞেস করত, কিন্তু সে দিন তো আর নেই। তুই মা এই ফোটো দুটো নিয়ে উশ্রীর মত একটু জেনে আয়।'

'উশ্রী আছে বাড়িতে?' ললিতা তেতো গলায় জিজ্ঞেস করে, নিজের কণ্ঠস্বর তার নিজেরই কানে অরুচিকর।

ললিতার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে রেবতীদেবী প্রশ্নসূচক ভাষায় বলেন, 'বাড়ি থাকবে না তো যাবে কোথায়? এ মুখপোড়া শহরে কোনো আইবুড়ো মেয়ের বাড়ির বাইরে পা দেবার উপায় আছে? আর উশ্রী—মেয়ের রূপ থাকা তো নয়, পেছনে শকুনির দল নিয়ে রাস্তা চলা। আমি তো মেয়েটাকে পার করতে পারলে বাঁচি, দিনরাত্তির এই শহরের যা সব ব্যাপার-স্যাপার শুনছি! তুই আর উশ্রী ছাড়া এখানে একটাও তো ভালো মেয়ে দেখি না? ও-সব বাড়ির মেয়েরা এ ব্যাপারে ব্যাটাছেলের বাড়া!'

ললিতা জানে কথাটা সর্বৈব মিথ্যে। এবং মিথ্যে যে, তা উশ্রীর মা'ও জানেন। থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় উশ্রীর রূপ যৌবনের কালনেমির লঙ্কাভাগ নিয়ে কলেজের ছেলেদের মধ্যে যে মারামারি, তার খবর কে না রাখে? এতে উশ্রীর পক্ষ থেকে প্রশ্রয়ও যথেষ্ট ছিল! আজও চন্দ্রকান্ত সিং বিশ্বাসঘাতকতা করলে উশ্রীর স্বহস্তে লেখা অন্তত এক ডজন চিঠি বার করতে পারে। নির্দোষিতার সাফাই গাইতে এসব চিঠি সে প্রিন্সিপালকে দেখায় নি। পুলিশকে পর্যন্ত না। তবে ঘটনাটা খড়ের আগুনের মতো জ্বলে উঠে একেবারেই নিভেছে।

চন্দ্রকান্ত একদিন উশ্রীকে লুকিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, এবং ভবিষ্যতে বিয়ে করবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঁচটা চুমুও খেয়েছিল। আর উশ্রীর কাছ থেকে একটা আদায়ও করেছিল সে। তবে উশ্রী ঠোঁটে চুমু খায় নি, গালে দিয়েছিল। এ সমস্ত কথা উশ্রী নিজে ললিতাকে বলেছে। তারপর ভূমিহার আর রাজপুত ছাত্রদের মধ্যে ঐ মারা-মারিটা।

এরই কিছুদিন পরে রাজপুত ছেলে চন্দ্রকান্ত সিং লেখাপড়া ছেড়ে

মিলিটারিতে চলে গেছে। উশ্রীর প্রথম পর্বের প্রণয় সম্পর্ক সেখানেই শেষ। অল্প বয়েসের ভালবাসা ভবিষ্যতে বৃহত্তর ব্যবধান সৃষ্টির জন্যেই আসে, এই নীতিতে সহমত হয়ে উশ্রী খুব সহজভাবে সে বিচ্ছেদ মেনে নিয়েছে। তাছাড়া মনে হয় তার মনটা যেন কুমোরের চাকের ওপর নরম মাটির তাল!

রেবতীদেবীর দক্ষিণ-উন্মুক্ত ঘরে মৌরসী পালঙ্কের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে উশ্রী। বুকের নিচে জোড়া বালিশ। চোখের সুমুখে একখানা আধখোলা উপন্যাস, বোধহয় পড়তে পড়তে সবেমাত্র পাতা মুড়েছে। সন্ধ্যে হয় নি, তবে সময়টা ঐ দিকেই গড়িয়ে চলেছে।

ললিতাকে এখনো স্পষ্ট দেখতে পায় নি উশ্রী, তবু সে ঘরে ঢুকতেই ডাকল, 'আয়?'

'তুই আমায় দেখলি কখন?' ললিতা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

'যখন মা'র সঙ্গে তোর পরামর্শ চলছিল, তখনই আড়ি পেতেছিলুম।' উশ্রী তখনো পর্যন্ত ললিতার দিকে তাকায় না। 'দেখ ললিতা, উকিলে আমারও রুচি নেই, ওরা বড় বেশি ভাগ্য ভাগ্য করে। আমার তো মনে হয় সব সময় যেন জ্যোতিষীর সামনে কুষ্ঠির ছক্ পেতে বসে রয়েছে। তার চেয়ে ডাক্তারই ভালো, চাকরি যাক বা প্র্যাকটিশ অচল হোক, ডাক্তারী ওষুধের ফ্রী স্যাম্পেল বিক্রি, আর মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখে পেট চালাতে পারবে। আমাদের অহীন ডাক্তার তো এই করে গাড়ি বাড়িও করেছে।'

'ফোটো—'

'ও আমি আগেই চুরি করে দেখেছি। ডাক্তারটার চেহারা একটু হাঁদা-গবা, মনে হয় ভবিষ্যতে খুবই পত্নীভক্ত হবে। তাছাড়া লোকটা সতী, দেখে তো মনে হয় না কোনোদিন কোনো মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে, বা গায়ে একটা মেয়ে মাছি পর্যন্ত বসেছে।' কথা বলতে বলতে এতক্ষণে উশ্রী উঠে বসে, তারপর ললিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'তোর কি মজা বল তো, এবার কেমন এম. এ. পড়তে যাবি, আর আমার এক বছরের মধ্যে মা হয়ে মেয়ের বিয়ে কি ছেলেমানুষ

করার চিন্তা আরম্ভ হবে !'

জবাব দিল না ললিতা, উশ্রীর কাছে এগিয়ে এসে তার হাতের একটা পাতা নিজের হাতের মুঠিতে চেপে ধরে কি যেন বলতে গেল, কিন্তু পরক্ষণে এই যুগলবদ্ধ হাতের পাতার দিকে বিশদ দৃষ্টি পড়তে হাতখানা অচিরে সরিয়ে নিল। উশ্রীর হাতের পাশে ললিতার হাত, বরাঙ্গনা উশ্রীর সান্নিধ্যে ললিতার আকর্ষণহীন নারীদেহ, যে কোনো অন্ধেরও বোধহয় এ বিপুল বিসদৃশ পার্থক্য চোখে পড়ে।

তাই উশ্রীর যেখানে যেচে বর আসছে, সেখানে বিবিধ ভঙ্গিতে পাসপোর্ট আর ক্যাবিনেট সাইজ ফোটো তুলিয়ে পিতামাতার আকুতি আবেদন পূর্ণ পত্রসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রেরিত হয়ে কোনো একটি স্থান থেকেও ললিতার তিলমাত্র সম্ভাবনা উঁকি দেয় নি। রূপ-যৌবনের বাজারে সে অচল, সেইজন্য খুব সম্ভব জীবনের সবচেয়ে অর্থময় ক্ষেত্রে সে চিরদিনের মতো অপূর্ণই থেকে যাবে।

মন থেকে নিজের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়ে ললিতা জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে আমি মাসিমাকে গিয়ে কি বলব ?'

মা যে উশ্রীর মতামতের অপেক্ষায় বসে নেই, এবং উকিল জাত সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা তা উশ্রীর অজ্ঞাত নয়। এদিক থেকে মা এবং তার নিজের মানসিক সিদ্ধান্তে ব্যবধান অথবা তারতম্য নেই। উশ্রী ঠোঁট উলটে অসহায় ভঙ্গি করে, 'কি আর বলবি, মা বাবার যা মত আমারও তাই। আমি যদি বলি, বিয়ের কথা এখন চিন্তা না করে আমায় এম. এ পর্যন্ত পড়িয়ে দিতে, তা কি কেউ শুনবে ? যার স্বাধীনতা নেই তার সব ব্যাপারে চুপ থাকাই ভালো, মিছিমিছি মাথা ঘামাতে গিয়ে মাথার যন্ত্রণা।' কথার শেষে সে ডান হাতের পাতায় মাথার দু'পাশের রগ টিপে ধরে।

নিজের দিকই চিন্তা করছে ললিতা, তদনুযায়ী প্রশ্ন করে, 'তুই তো পড়তে চাস, কিন্তু লেখাপড়া করেই বা কি লাভ ?'

'তবে তুই বা পড়তে যাচ্ছিস কেন ?' সর্পিনীর মতো শঙ্খগ্রীবা ঘুরিয়ে উশ্রী পাল্টা জিজ্ঞাসা করে।

ললিতা উদাসভাবে উত্তর দেয়,'ভবিষ্যতে নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান যাতে নিজেই করে নিতে পারি।'

'বিয়ে করবি না তুই?'

জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে ললিতা তার পরাজয় সম্ভাবনাপূর্ণ মুখখানায় ঔজ্জ্বল্য আনার চেষ্টা করে, তারপর উত্তর দেয়,'আমাকেই কেউ করতে চাইবে না।'

উশ্রী হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি বলছি ললিতা, দেখিস তোর খুব সুন্দর বিয়ে হবে।'

ললিতা গম্ভীর ভাবে বলে, 'অনেক ভবিষ্যৎ আগে থেকেই বোঝা যায়, আমার যা হবে তা ভালোই জানি।'

ললিতার মুখের ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্য নিভে গেছে, তার করুণ মুখভাব উশ্রীর মনটাকে গভীর ব্যথায় জর্জরিত করে তোলে।

১১

যে ব্যাপারে অবন্তীর ভয় তেমন কিছুই হয় নি। বি. ডি. ও. ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ ঋণের সুদ বা বিকল্প প্রথায় পরিশোধ, কিছুই চান নি। এমন কি অবন্তী যে তাঁর কাছে ঋণী তা স্মরণ পর্যন্ত করাবার চেষ্টা করেন নি তিনি। প্রায় মাসখানেক বিবিধ সন্দেহের দোলায় দোলার পর অবন্তীর স্বস্তির শ্বাস পড়েছে। তারপর টানা পাঁচ মাস ধরে মাস পিছু একশ' করে টাকা জমিয়েছে সে। আর শ'খানেক হাতেই ছিল তার।

এই পাঁচ ছ'মাসের মধ্যে অবন্তী শ্যামলের কোনো খবর পায় নি। এক লাইন পোস্টকার্ড পর্যন্ত না। কলকাতায় গেলে শ্যামলের হয়তো তাকে মনে পড়ে না। মনে পড়লেও, পরহস্তগত স্ত্রীকে কেউ ভালবেসে নিজের সমাচার শোনায় না, বা তার কুশল জিজ্ঞেস করে না।

এ সংবাদ শ্যামলের অজানা, ডাক্তারের সঙ্গে অবন্তীর আর কোনো

সম্পর্ক নেই। সে এখান থেকে যাওয়ার দিনই ঐ সম্পর্কের ইতি। অবন্তীকে হয়তো শ্যামলের মনে পড়ে না, কিন্তু যশস্বী অভিনেতা প্রবীরকুমারের অর্থের প্রয়োজনও কি ফুরিয়েছে? না, সে আজ সত্যিই একজন খ্যাতিমান ও ধনবান অভিনেতা?

কিন্তু শ্যামলকেই বা অবন্তীর আজকাল প্রতি নিয়ত মনে পড়ে কেন, সে কি অবন্তীকে নিজের পাশবিক শক্তির বলে জয় করে ফেলেছিল? সেই প্রাচীন ছেঁদো কথা, মেয়েরা পুরুষের চরিত্র মাধুর্যের বশীভূত হয় না, পশুশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে পরিতৃপ্ত হয়। এ ধরনের মন্তব্য শ্যামল কখনো কখনো করত।

কিন্তু শ্যামলের ঐ অবিবেক আচরণ, উপেক্ষা এবং সম্পূর্ণ দায়িত্বহীনতার দরুণ অবন্তী ঘৃণাই করত তাকে। এবং তার মনের সেই হতাশার রন্ধ্র দিয়ে ডাক্তারের পরকীয়া প্রণয়ের অনুপ্রবেশ। অবন্তী ভালবাসত ডাক্তারকে, এখনো বাসে। আজও তার মনে শ্যামলের তুলনায় ডাক্তারই কামনার আধিক্য।

শ্যামল শুধু এক বিভীষিকাময় কৌতূহল। সে যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল। দূরে থাকলে বরং তাকে স্মরণ করা যায়, অবন্তীর তরফের এই-টুকুই পত্নীত্বের কর্তব্য সাধন, কাছে থেকে সে উপায় নেই।

প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে, তবু মনে হয় গতকালেরই ঘটনা। অথচ ঐ দিনই শ্যামল এখান থেকে গেছে, অবন্তীর বাস্তব অনুভবে সে যাওয়া আজ কত যুগই অতিক্রম করেছে! এ যেন শ্যামলের অগস্ত্য বিদায়, ভবিষ্যতে সাক্ষাত হওয়ার কোনো নির্দেশই আর নেই।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ডাক্তার আসার পর থেকে নিজের আকস্মিক ভাবান্তরের অর্থ অবন্তী আজ অবধি বুঝতে পারে নি। কারণের অস্তিত্ব ভিন্ন কোনো কিছু ঘটে না। অবন্তী এখন উপলব্ধি করছে এ নিয়ম মেয়ে-দের ক্ষেত্রে খাটে না, বিশেষ করে যাদের শরীরে যৌবন বাঁধা। যৌব-নের নিরুচ্চার দম্ভ ভিন্ন প্রসঙ্গে এসে আকস্মিকতা বিজড়িত অর্থহীন ঘটনারূপে উম্মোচিত হয়।

কিন্তু তারপর ডাক্তার একটা খবর পর্যন্ত নিতে আসে নি। বিনা শুল্কে

এবং শর্তে এতখানি আদায় করে নেওয়ার পর সে যে এমন অকৃতজ্ঞ আচরণ করতে পারে, তা অবন্তীর দূর-চিন্তারও অগোচর। অবশ্য তার নিজের তরফ থেকেই কড়া নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু পরকীয়া সংসর্গের ব্যাপারে, কে আর লাল কালির নির্দেশ মেনে চলে ?

বি ডি ও-র টাকাটা কি অবন্তী অফিসেই ফেরত দেবে, কথাটা সে অনেকবার চিন্তা করেছে। কিন্তু বি ডি.ও তাকে অফিসে টাকা দেন নি, মুখবন্ধ খামে পিওনের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অবন্তীরও উচিত তাঁর বাড়ি বয়ে গিয়ে টাকা ফেরত দেওয়া। বাড়ি অর্থাৎ কোয়ার্টার। কিন্তু এই বি.ডি.ও-র আমলে অবন্তী কখনো তাঁর কোয়ার্টারে যায় নি। আগেকার একজন বি.ডি.ও. তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, একবার যাওয়ার পর আপ্যায়নের বহর দেখে সে দ্বিতীয়বার আর যায় নি। তাঁর কোয়ার্টারে স্ত্রী মজুত, কিন্তু তিনি সব অর্থেই অন্তঃপুরিকা। অবন্তীর মনে হয়েছে ড্রইংরুমে বসে বি.ডি.ও. যদি তার সঙ্গে অসঙ্গত আচরণে উদ্যত হন স্ত্রী-স্বামীর পুরুষোচিত অভিব্যক্তি প্রদর্শন অথবা ব্যবহারে বিঘ্নস্বরূপ আবির্ভূত হবেন না। আদর্শ নারীর যা শাস্ত্রসিদ্ধ পরিচয় !

রবিবার বিকেলটা বেছে নিল অবন্তী। বি. ডি. ও. ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ কোয়ার্টারেই উপস্থিত। বাইরের বারান্দায় বসে কিছু লিখছিলেন তিনি। পরনে ভাগলপুরী সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে কাঁধকাটা গেঞ্জি। দূর থেকে অবন্তী লক্ষ্য করল, অফিসে যেমন দেখায় তার চেয়ে তাঁর বয়েস অনেক কম এখন। বড়জোর পঁয়ত্রিশ ছুঁয়েছেন।

'আসুন !' বি. ডি. ও. ভুবনেশ্বর সিং আঙুল দিয়ে অবন্তীকে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন। 'কিছু দরকার ছিল, অফিসে বললেই তো পারতেন ?'

অবন্তীর মুখের ওপর চাবুকের ঘা পড়ল যেন, তবু অন্তরে তৃপ্তি বোধ হলো তার। এখানে আসার পর সে যেন অনেকখানি নিরাপদ। একটু ইতস্তত করে সে নির্দেশিত চেয়ারে বসে পড়ল, তারপর হাতের ব্যাগ খুলে বি. ডি. ও-র পাঠানো খামখানাই বার করে টেবিলের ওপর রাখল। এ খাম এতদিন তার কাছেই ছিল। মুখ খুলে টাকা বার করার

পর সযত্নে তুলে রেখেছিল, স্বার্থহীন পরোপকারের নিদর্শন। যদিও সে সময় তার মনে দ্বিধা ও শঙ্কা পুরোপুরি বর্তমান।

টেবিলের ওপর থেকে হাত তোলে নি অবন্তী, বলল, 'আপনার টাকাটা স্যার—'

'ওঃ', বি. ডি .ও. একটু হাসলেন, 'আপনার ব্যক্তিগত কাজ, আমি ভেবেছিলাম অফিস সংক্রান্ত কিছু! বসুন।' অবন্তী ইতিপূর্বে বসেছে, কিন্তু বি. ডি. ও এতক্ষণে দরাজ গলায় তাকে বসার অনুরোধ জানালেন। 'আপনি তো প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের লোন নেন নি?'

বিনীত ভঙ্গিতে অবন্তী উত্তর দেয়, 'না স্যার, অল্প অল্প করে টাকাটা জমিয়েছি।'

'ছ্যাটস্ গুড্! আপনার স্বামী কেমন আছেন?'

অবন্তী নিরুত্তরে মাথা নিচু করে রইল।

আশঙ্কিত গলায় বি. ডি. ও. প্রশ্ন করেন, 'তাঁর শরীর কি বেশি খারাপ?'

'জানি না।' অবন্তী খুব আস্তে বলে।

বি. ডি.ও-র মুখাবয়বে বিস্ময়ের আধিক্য, 'মানে?'

জবাব দেওয়ার আগে অবন্তীর মনে হয় নিজের মুখখানা অন্ধকারে বিলীন করে দেয়। সে স্তিমিত কণ্ঠে বলে, 'তিনি এখান থেকে যাওয়ার পর আর কোনো খবর পাই নি।'

'ওঃ!' কি যেন ভাবতে লাগলেন ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ।

'আমি তাহলে যাই স্যার?' অনুমতি চেয়ে অবন্তী উঠে দাঁড়াতে গেল। হাতের ইসারায় নিষেধ করেন ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ। 'একটু বসুন, আমার ডেরায় এসেছেন, এক কাপ চা না খাইয়ে আমি আপনাকে ছাড়তে পারি না। আমিও খাব, এখুনি চা আসবে। প্রতি ঘণ্টায় চা না হলে আমার লেখা হয় না।' যে প্যাডে লিখছিলেন তার দিকে অবন্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। 'একটা প্রবন্ধ লিখছি, আমাদের কাব্যে আর একবার তুলসীদাসের যুগ ফিরে আসা দরকার। আমি অবশ্য আধুনিক কবি, কিন্তু তবু মনে হয় আধুনিকতার নামে যেন দুর্বোধ্যতাই আমরা বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছি। কবিতাতেই যুগের স্পর্শ সবচেয়ে

আগে লাগে, কারণ কবিচিত্ত অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যুগটাও অবশ্য দুর্বোধ্য, তাতে কোনো ভবিষ্যতের নির্দেশ পাওয়া যায় না। সৃষ্টি মাত্রেই এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, তার জন্যে মাঝে মাঝে প্রাচীন জিনিসকে টেনে আনা দরকার, যদি বর্তমান থেকে সে নির্দেশ পাওয়া না যায়।'

অবন্তীকে দেখে গিয়েছিল রামরূপ, দু-পেয়ালা চা-ই নয়, বিস্কুটও কয়েকটা নিয়ে এলো সে।

কবি ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ বললেন, 'মিসেস দত্ত, আপনি সহজভাবে বসে চা খান। এখানে আমি কটা দিনই বা আর আছি?'

চায়ের পেয়ালা হাতে তুলেছিল অবন্তী, ঠোঁট ও টেবিলের মাঝপথে তার হাতখানা যেন থমকে পড়ল, 'মানে?'

চায়ে একটা চুমুক দেওয়ার পর ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ বলতে লাগলেন, 'চাকরি আমার পোষাল না, আমি গভর্নমেণ্টে রেজিগনেশন পাঠিয়ে দিয়েছি, অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশনের সঙ্গে নিত্যই সংঘর্ষ। আমার কি মনে হয় জানেন, আমাদের শক্তির মূল উৎসই হচ্ছে দুর্নীতি, যে সবদিক দিয়ে তাকে নিয়ে মানিয়ে চলতে না পারে তার একপাশে সরে থাকা উচিত। আমরা দু'ভাই মিলে একটা সিনেমা হাউস খুলেছিলাম, খুবই ভালো চলছিল, কিন্তু ঐ কারণে উঠিয়ে দিতে হলো। কিছু জমিজায়গা আছে, তা আর বেশিদিন থাকবে না। তবে আমি চাই আমার জমি যেন আজকের দিনের সত্যিকার দাবিদারদের হাতে গিয়ে পড়ে, যারা চাষবাস জানে আর ওটাকেই জীবন আর জীবিকা বলে মনে করে। এ সব দায় চুকে গেলে আমি লেখা নিয়েই থাকব, তাতে আর কিছু না হোক নিজের মনটা তো খুলতে পারব। আজ তারও কোনো জায়গা নেই!'

নিজের সুমুখে নতুন এক ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপকে দেখছে অবন্তী, বি. ডি. ও. ভুবনেশ্বর নয়, কবি-ভুবনেশ্বরকে, ইচ্ছে হয় সশ্রদ্ধ এবং সবিস্ময় দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথা শুনতে, কিন্তু তিনি বিরতি দিতে সে শুধু প্রশ্ন করে, 'আপনি কতদিন এখানে থাকবেন স্যার?'

'যতদিন ছাড়া না পাই, তবে আমার মনে হয় মাসখানেক তো বটেই, বেশিও হতে পারে।'

কয়েকটা কথা বলতে বলতে অবন্তী বেশ সহজ হয়ে এসেছে, প্রশ্ন করে, 'তাহলে কি ছুটি নেবেন ?'

'ছুটি অবশ্য পাওনা, কিন্তু কেন নিতে যাব ?' কথা বলতে বলতে বি. ডি. ও হাসলেন, 'যতদিন আছি আপনাদের জ্বালাতে তো পারব !'

বি. ডি. ও-র হাসির সঙ্গে নিজের হাসির মানান দিয়ে অবন্তী হাসল একটু, তারপর বলল, 'এবার আমি যাই স্যার ?'

ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ জবাব দিলেন না, অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছেন তিনি। মনের মধ্যে অবন্তীর মৃদু অস্বাস্তর ক্ষীণ আলোড়ন জাগে। এবার সে উঠে দাঁড়াল, 'স্যার—'

'বসুন একটু,' ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ বললেন, 'মিসেস দত্ত, আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করতে পারি ?'

অবন্তীর মুখ শুকিয়ে যায়, নিরুপায়ভাবে বসে পড়ে প্রশ্ন করে, 'বলুন স্যার ?'

হাতে পাকিয়ে সিগারেট খান ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ, চোখ নিচু করে সিগারেট পাকাতে পাকাতে কথা তুললেন, 'আপনার বিবাহিত জীবন সুখের নয়। সবাই জানে ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এ অবস্থায় একটা ব্যবস্থা করছেন না কেন ?'

'কিসের ?' অবন্তীর মুখ থেকে কথাটা স্পষ্ট উচ্চারিত হলো না।

ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ মুখে সিগারেট নিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি স্পর্শ করেন, 'আপনার স্বামী এসব কথা জানেন, তাঁর কাছে ডিভোর্স নিয়ে আপনারা বিয়ে করছেন না কেন ? ডাক্তার এ বিষয় কি বলেন ?'

কিছুক্ষণ নীরব অবন্তী, তারপর পাশ-কাটানো জবাব দেয়, 'তাঁর সঙ্গে আমার ছ'মাস দেখা হয় নি।'

'কার সঙ্গে ?'

'ডাক্তার—'

'বুঝেছি !' খুব জোরে ধোঁয়া ফেলেন ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ, সেই অবসরে একটা অপ্রিয় সত্য প্রকাশের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন, 'আপনি কি জানেন, ডাক্তার মুখার্জির বিয়ে প্রায় স্থির হয়ে গেছে ?'

অবন্তীর মুখ থেকে আচমকা একটা শব্দ বেরিয়ে আসে, 'মানে !'

'মানে, মাসখানেকের মধ্যেই তিনি বিয়ে করছেন।' বি. ডি. ও. এবার সিগারেট ফেলে দিলেন।

কতকটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে অবন্তী তাঁকে বলে, 'আপনি কোথায় এ কথা শুনলেন ? মিথ্যে—!'

অবন্তীর কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় আকৃষ্ট হয়ে ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ এক মুহূর্ত অবাক চোখে তাকালেন, তারপর ধীর কণ্ঠে বিশদ তথ্য দিলেন তিনি, 'কিছুদিন আগে ডাক্তার মুখার্জির খোঁজ খবর নিতে কাটিহারের এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে। প্রায় স্থির। আমি তাঁর সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত দিই নি, শুধু বলেছিলাম, অফিসে তাঁর কাজের রিপোর্ট ভালোই—যা সত্যি তাই। আজ যখন আপনি বললেন ছ-মাস যাবত স্বামীর খোঁজখবর পান নি, তখন মনে হলো ডাক্তার মুখার্জির বিয়ের খবরটা আপনাকে দেওয়া দরকার, কারণ আপনার স্বামী আর আপনাকে চান না বলেই আমার বিশ্বাস। মিসেস দত্ত, আপনি ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে দেখা করুন।'

ইতিমধ্যে অবন্তী নিজের সমগ্র উত্তেজনা মনের গভীরে অন্তরীণ করে দিয়েছে, সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে অকৌতূহলী এবং নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে সে শুধু বলে, 'আমি আমার স্বমীর জন্য অপেক্ষা করব।

'তা এখানে বসে হয় না,' ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের কণ্ঠস্বরে আশংকা এবং প্রচুর ব্যস্ততা, 'দেরি হলে হয়তো আপনার দু-কূলই ভেসে যাবে। আপনি আজই কলকাতায় চলে যান, দরকার বোধ করলে যে টাকা নিয়ে এসেছেন তা আপাতত ফিরিয়ে নিতে পারেন। ওখানে গিয়ে আপনার স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন, তিনি কি চান। যদি আপনাকে নিয়ে ঘর করায় তাঁর আপত্তি থাকে এখানে ফিরে এসে ডাক্তার মুখার্জিকে বলুন। মোটের ওপর কোনো দিকেই সময় নষ্ট করবেন না।'

অবন্তী চুপ করে রইল, জবাব দিল না। চোখ দুটিও সে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছে, যেন বি. ডি. ও-র সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় সম্ভব না হয়।

অবন্তীর মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে একটু জোরে কথা বলেন

ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, 'শুনুন মিসেস দত্ত, জীবনে নিশ্চয়তা আনতে গেলে প্রাচীন মূল্যায়ণ কিছু কিছু ভুলতেই হয়। তাছাড়া আপনিও তো তেমন রক্ষণশীল ছিলেন না, বরং অপর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে বেশ খানিকটা এগিয়েই গিয়েছিলেন। আজ যদি হঠাৎ নিজের বেপরোয়া প্রকৃতির রাশ টানতে যান তাহলে হয়তো সারা জীবনের মতো মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। আর একটা কথা,' ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ বিশেষ ভরসা দিয়ে বলেন, 'আমি আপনাকে সবদিক থেকেই সাহায্য করার জন্যে তৈরি। যদি ডাক্তার মুখার্জিকেই বিয়ে করতে চান, আর তিনি রাজী না হন, সে ভারও আমার।' ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের কণ্ঠে দৃঢ়তা, 'কি ভাবে অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জল খাওয়াতে হয় সে বিদ্যে আমার জানা।'

একটু হেসে অবন্তী প্রশ্ন ভঙ্গিমায় বলে, 'কিন্তু আপনি তো কবি?'

উত্তরে ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপও হাসেন, 'কবিতা আমি সবসময় চোখের জল বা ঘাসের শিশির দিয়ে লিখি না। আপনি আমার ওপর আস্থা রেখে দেখতে পারেন।'

এবার অবন্তী বলে, 'সে বিবাহিত জীবন কি সুখের হয় স্যার?'

ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ আবার সিগারেট পাকাতে আরম্ভ করেছিলেন, হাতের কাজে স্থগিত দিয়ে প্রত্যয়পূর্ণ দৃষ্টি তুলে তিনি অবন্তীর দিকে তাকালেন, 'না হওয়ার কারণ নেই, ডাক্তার মুখার্জির সংকোচ আর সংস্কার কাটিয়ে দিতে পারলে আপনাকে নিয়ে তিনি সুখীই হবেন। তবে তার আগে আপনি একবার কলকাতা ঘুরে আসুন, তাতে আপনার বিবেক বন্ধন মুক্ত হবে।'

অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই অবন্তী এবার উঠে দাঁড়াল, 'আমি এখন দুদিকে অপেক্ষাই করব স্যার, একটু চিন্তা করব।'

অগত্যা-সূচক সম্মতি দিয়ে ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ বললেন, 'বেশ, তাই করুন তাহলে। আপনাকে আর আটকাব না, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

•

বি. ডি. ও-র কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে এলো অবন্তী, ঘড়িতে তেমন

বড় সময়-নির্দেশ নেই, কিন্তু বেশ গভীর সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শীতকাল, তবু বিশেষ ঠাণ্ডা এখনো পড়ে নি। অবন্তীর গায়ে একটা সূতির ব্লাউজ, বাহু দুটি সম্পূর্ণ নিরাবরণ, তা সত্ত্বেও শীত বোধ হচ্ছে না। ঠাণ্ডা আমেজ শুধু।

মাঝখানে একটা ছোট মাঠ, ওপারে ডাক্তারের কোয়ার্টার। হাস পাতালের কাজ চুকিয়ে ডাক্তার বোধহয় এখন কোয়ার্টারে ফিরে এসেছে, যদি না কোনো প্রাইভেট কলে গিয়ে থাকে। সারা ব্লক জুড়ে ডাক্তারের পশার। আগে তো প্রায়ই বলত, 'এখান থেকে বদলি করলে চাকরি ছেড়ে দেব, চাকরিটা এখনই আমার খুব ক্ষতি করছে, বড় সময় নষ্ট।'

অর্থাৎ এই না-গ্রাম না-শহর অঞ্চলে ডাক্তার আজীবন থাকবে। এখানেই নতুন বৌ নিয়ে ঘর-সংসার করবে। কোনো না কোনো দিন ডাক্তারের বউকে দেখতে পাবে অবন্তী। হয়তো রোজই দেখবে ডাক্তারের শয্যা-সঙ্গিনী ও জীবন সঙ্গিনীকে। অবন্তী চাইলে এ পদ সে আজও পেতে পারে, এক কালে ডাক্তারের শরীর-সঙ্গিনী ছিল, সেই অধিকারে। কিন্তু ভিক্ষের হাত বাড়িয়ে কিছু নেবার প্রবৃত্তি নেই তার। এই ছ'মাস সে ডাক্তারকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে, তবু বার তিন চার চোখে পড়ে গেছে, অবশ্য বেশ দূর থেকেই, একবার আরও একটু কাছে, কিন্তু স্বকর্মে ব্যস্ত ডাক্তার দেখতে পায় নি।

ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ একটা কথা ভুল বুঝেছেন, ভবিষ্যতের সুখের জন্যে অবন্তীকে প্রাচীন মূল্যায়ন ছাড়তে বলেছেন, যদিও তারই কিছুক্ষণ আগে হিন্দি আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা দূর করার উদ্দেশ্যে তুলসী-দাসের পুনরাবির্ভাব কামনা করেছেন তিনি।

কিন্তু প্রাচীন মূল্যায়ন ফিরিয়ে আনা নয়, অবন্তীর মনে যে চিরন্তন নারীর অভিমান ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান, তা কবি ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের চোখে পড়ে নি। ডাক্তারের পত্নীত্ব কামনা করে তার দ্বারস্থ হওয়া অবন্তীর পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়। এর জন্যে ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের কোনো সাহায্যের দরকার নেই। এই মুহূর্তেই সে যদি ডাক্তারের কাছে যায়, তার সাধ্য নেই প্রত্যাখ্যান করে। তবু বি. ডি. ও. ভদ্রলোকের

ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, 'শুনুন মিসেস দত্ত, জীবনে নিশ্চয়তা আনতে গেলে প্রাচীন মূল্যায়ণ কিছু কিছু ভুলতেই হয়। তাছাড়া আপনিও তো তেমন রক্ষণশীল ছিলেন না, বরং অপর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে বেশ খানিকটা এগিয়েই গিয়েছিলেন। আজ যদি হঠাৎ নিজের বেপরোয়া প্রকৃতির রাশ টানতে যান তাহলে হয়তো সারা জীবনের মতো মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। আর একটা কথা,' ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ বিশেষ ভরসা দিয়ে বলেন, 'আমি আপনাকে সবদিক থেকেই সাহায্য করার জন্যে তৈরি। যদি ডাক্তার মুখার্জিকেই বিয়ে করতে চান, আর তিনি রাজী না হন, সে ভারও আমার।' ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের কণ্ঠে দৃঢ়তা, 'কি ভাবে অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জল খাওয়াতে হয় সে বিদ্যে আমার জানা।'

একটু হেসে অবন্তী প্রশ্ন ভঙ্গিমায় বলে, 'কিন্তু আপনি তো কবি ?'

উত্তরে ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপও হাসেন, 'কবিতা আমি সবসময় চোখের জল বা ঘাসের শিশির দিয়ে লিখি না। আপনি আমার ওপর আস্থা রেখে দেখতে পারেন।'

এবার অবন্তী বলে, 'সে বিবাহিত জীবন কি সুখের হয় স্যার ?'

ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ আবার সিগারেট পাকাতে আরম্ভ করেছিলেন, হাতের কাজে স্থগিত দিয়ে প্রত্যয়পূর্ণ দৃষ্টি তুলে তিনি অবন্তীর দিকে তাকালেন, 'না হওয়ার কারণ নেই, ডাক্তার মুখার্জির সংকোচ আর্দ্র [illegible]ওয়ালে কাটিয়ে দিতে পারলে আপনাকে নিয়ে তিনি সুখীই [illegible] চোখ রেখে আর আগে আপনি একবার কলকাতা ঘুরে [illegible]

বন্ধন মুক্ত হবে।'

অনুমতির অপেক্ষা [illegible] ?' ডাক্তারের কণ্ঠস্বরের অগাধ বিস্ময় গোপন থাকে না।

অবন্তী জবাব দিল না।

প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ ঘুরিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করে, 'তোমার কি এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই ?'

সঙ্গে সঙ্গে অবন্তী উত্তর দেয়, 'না।'

ডাক্তারের সর্বাঙ্গ যেন পংকিল অপমানের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সে যথাত্বরিত উঠে দাঁড়াল, আমি যাই তাহলে ?'

বড় সময়-নির্দেশ নেই, কিন্তু বেশ গভীর সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শীতকাল, তবু বিশেষ ঠাণ্ডা এখনো পড়ে নি। অবন্তীর গায়ে একটা সূতির ব্লাউজ, বাহু দুটি সম্পূর্ণ নিরাবরণ, তা সত্ত্বেও শীত বোধ হচ্ছে না। ঠাণ্ডা আমেজ শুধু।

মাঝখানে একটা ছোট মাঠ, ওপারে ডাক্তারের কোয়ার্টার। হাস পাতালের কাজ চুকিয়ে ডাক্তার বোধহয় এখন কোয়ার্টারে ফিরে এসেছে, যদি না কোনো প্রাইভেট কলে গিয়ে থাকে। সারা ব্লক জুড়ে ডাক্তারের পশার। আগে তো প্রায়ই বলত, 'এখান থেকে বদলি করলে চাকরি ছেড়ে দেব, চাকরিটা এখনই আমার খুব ক্ষতি করছে, বড় সময় নষ্ট।'

অর্থাৎ এই না-গ্রাম না-শহর অঞ্চলে ডাক্তার আজীবন থাকবে। এখানেই নতুন বৌ নিয়ে ঘর-সংসার করবে। কোনো না কোনো দিন ডাক্তারের বউকে দেখতে পাবে অবন্তী। হয়তো রোজই দেখবে ডাক্তারের শয্যা-সঙ্গিনী ও জীবন সঙ্গিনীকে। অবন্তী চাইলে এ পদ সে আজও পেতে পারে, এক কালে ডাক্তারের শরীর-সঙ্গিনী ছিল, সেই অধিকারে। কিন্তু ভিক্ষের হাত বাড়িয়ে কিছু নেবার প্রবৃত্তি নেই তার। এই ছ'মাস সে ডাক্তারকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে, তবু বার তিন চার চোখে পড়ে গেছে, অবশ্য বেশ দূর থেকেই, একবার আরও একটু কাছে, কিন্তু স্বকর্মে

প[illegible]ক্তার দেখতে পায় নি।

ভাবান্তরের কা[illegible]একটা কথা ভুল বুঝেছেন, ভবিষ্যতের সুখের জন্যে প্রথম দু-চারদিন পর্যন্ত ভা[illegible]ত বলেছেন, যদিও তারই কিছুক্ষণ কিন্তু তারপরই একদিন অবন্তীকে ত[illegible] করার উদ্দেশ্যে তুলসী-হলো, ঐ রমণীর মানসিক সত্ত্বা ইতিমধ্যে যেন অন্য [illegible]

হয়েছে। এ অনুমানের কোনো আপাত-দর্শন কারণ নেই। কিন্তু [illegible] নিজেকে সে অবন্তীর চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছে। বড় তাড়াতাড়ি এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অবন্তীকে ভাস্করের চেনা হয়ে গিয়েছিল। যে কোনো নারী ও পুরুষের চিরন্তন বোধ নিয়ে মনে হতো তারা যেন পরস্পরের জন্যে প্রতীক্ষিত নারী-পুরুষ। চির পরিচিত যুগল-জুটি। প্রকৃতপক্ষে সেই বিধিনিবিদ্ধ দাম্পত্য জীবন, যার স্থিতি এক

প্রতি অবন্তীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।
শ্যামল ফিরবে না। কোনোদিনই নয়। তার জন্যে অবন্তী অপেক্ষা করবে, এ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। শ্যামল আজ সত্যিই তার কাছে অবান্তর। সে যদি ফিরে আসে অবন্তীর জীবনের দুর্বহতা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি তার মৃত্যু সংবাদও অবন্তীর পক্ষে শুভ বার্তা।
বাড়ি ফিরে এসে অবন্তী দেখল ডাক্তার তার জন্যে অপেক্ষা করছে। এতদিন পরে আকস্মিক দর্শন, তবু নিজের মনটাকে সে বিস্ময়ভাবাপন্ন হতে দিল না, সাদা মাঠা গলায় প্রশ্ন করল, 'কতক্ষণ এসেছেন আপনি?'
অবন্তীর ভাবান্তরহীন কণ্ঠস্বর শুনে ডাক্তারের মনের ভেতরটা যেন অসহায়তায় পূর্ণ হয়ে উঠল। অনুভব হয়, যতখানি নির্ভীকতা নিয়ে সে এখানে উপস্থিত হয়েছিল তা যেন নেই আর। নিজেকে সহজ করে রাখার প্রয়াস জারি রেখে সে উত্তর দেয়, 'আধঘণ্টা হবে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'
অবন্তী দ্বিতীয় চেয়ারটায় বসল, 'বি. ডি. ও-র কাছে।'
পকেট হাতড়ে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে ডাক্তার বলে, 'তোমায় একটা খবর দিতে এসেছি অবন্তী।'
'কি?' প্রশ্ন করলেও এ খবরের অনুমান অবন্তীর আছে।
'আমার বিয়ে প্রায় স্থির হয়ে গেছে।' ডাক্তার এবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাল, অবন্তীর চোখে চোখ রেখে আর কথা বলা যায় না।
'জানি।'
'কবে [illegible]?' ডাক্তারের কণ্ঠস্বরের অগাধ বিস্ময় গোপন থাকে না।
অবন্তী জবাব দিল না।
প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ ঘুরিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করে, 'তোমার কি এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই?'
সঙ্গে সঙ্গে অবন্তী উত্তর দেয়, 'না।'
ডাক্তারের সর্বাঙ্গ যেন পংকিল অপমানের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সে যথাত্বরিত উঠে দাঁড়াল, আমি যাই তাহলে?'

অবন্তী সহজ সম্মতির ঘাড় নাড়ল। তারপর ডাক্তারকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো সে।

ঘরে ফিরে এসে অবন্তীর মনে হলো প্রচণ্ড শীতে সর্বাঙ্গ জমে যেন পাথর হয়ে গেছে!

১২

অবন্তীর বাড়ির সুমুখ থেকে কয়েক পা বেশ স্বচ্ছন্দভাবে হেঁটে আসার পর ডাক্তার ভাস্কর মুখার্জি এবার থমকে দাঁড়াল। বহিরাবরণের সহজ ভাব ভঙ্গি এখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। প্রায় ছ-মাস যাবত সে চিন্তা করছে অবন্তীর সঙ্গে একবার দেখা করবে, এবং তার চরম অভিমত ও ইচ্ছে জেনে নেওয়ার পর নিজের বিবাহের ব্যাপারে এগুবে।

অবন্তী অবশ্য ছ-মাস আগেই ভাস্করকে পূর্ণ স্বাধীনতার ছাড়পত্র দিয়েছে। কিন্তু সেদিনকার ব্যবহার এতই অভাবিত এবং আকস্মিক, যে সেই অভিমত তার আন্তরিক ইচ্ছাপ্রসূত বোধহয় নি। তখন থেকে ভাস্করের মনে হয়েছে দু-চার দিনের ভেতরই অবন্তী আবার কোনো নিঝুম নিস্তব্ধ সন্ধ্যালগ্নে তার কোয়ার্টারে এসে আগেকার মতোই উদিত হবে। তার-পর মান অভিমান ও সোহাগ আদরের পালা সম্পূর্ণ হলে সেদিনকার ভাবান্তরের কারণ সে নিজেই ব্যক্ত করবে।

প্রথম দু-চারদিন পর্যন্ত ভাস্করের এ ধারণা ও বিশ্বাস বেড়েই চলেছিল, কিন্তু তারপরই একদিন অবন্তীকে তার অলক্ষ্যে দূর থেকে দেখে মনে হলো, ঐ রমণীর মানসিক সত্বা ইতিমধ্যে যেন অন্য কোথায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এ অনুমানের কোনো আপাত-দর্শন কারণ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে সে অবন্তীর চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছে।

বড় তাড়াতাড়ি এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অবন্তীকে ভাস্করের চেনা হয়ে গিয়েছিল। যে কোনো নারী ও পুরুষের চিরন্তন বোধ নিয়ে মনে হতো তারা যেন পরস্পরের জন্যে প্রতীক্ষিত নারী-পুরুষ। চির পরিচিত যুগল-জুটি। প্রকৃতপক্ষে সেই বিধিনিষিদ্ধ দাম্পত্য জীবন, যার স্থিতি এক

টানা তিন-চার বছর। এবং সে সম্পর্ক এই গ্রাম্য সমাজেও প্রায় স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল, কারও চোখে আর অনভ্যাসের পীড়ন রাখে নি। অবন্তীর কাছে আসা-যাওয়া নিশীথ রজনীর গোপন অভিসার বলে মনে হতো না আর।

এর যা কিছু ব্যতিক্রম তা অবন্তীর স্বামী শ্যামল এসে পড়লে, শুধু তখনই এই সত্যটা ভাস্করের মনকে পীড়িত করত, অবন্তী পরস্ত্রী। সে ভাস্করের অসম্পর্কিত অপর একজন পুরুষের শয্যা গ্রহণ করছে। তিন চারদিনের বেশি শ্যামল থাকে নি কখনো, এবং সেই রাত্রিগুলি ভাস্করের বিনিদ্র রজনীর যন্ত্রণাময় কথিকা। জাগরিত অবস্থাতেও চোখের সুমুখে মর্ম-বিদারী চিত্রের আবির্ভাব, যাতে শুধু দুটি চরিত্র, অবন্তী আর শ্যামল। মনের চোখ জোড়া ফিরিয়ে নিলেও চিন্তা আরও গভীরভাবে ঐদিকেই ঘুরে যায়। তীব্র কৌতূহল ও বিরাগের সঙ্গে আবার সেই অনাকাঙ্খিত আলেখ্যদর্শন!

শ্যামল বিদায় নেওয়ার পর অবন্তী কিন্তু এক মুহূর্তও দেরি করত না। সূর্য পাটে যাওয়ার আগেই ভাস্করের কোয়ার্টারে তার বিনীত সসংকোচ উদয়, 'আপনি আমার ওপর খুব রাগ করে আছেন, না?'

বিস্মিত হবার চেষ্টা ভাস্করের। ঔদার্য এবং উপেক্ষা। 'কেন বল তো?'

'আমি কি করব বলুন?' হয় পেছন থেকে এসে অথবা সামনে বা পাশ থেকে ভাস্করকে জড়িয়ে ধরে অবন্তী। ঐভাবে হয়তো তার মান অভি-মান ঈর্ষা এবং কদিনের অনিদ্রা-জনিত দুর্বলতা সব শোষণ করে নিতে চায় সে। তারপর বলে, 'ও লোকটা এসে পড়লে বাড়ি থেকে বেরুবার উপায় থাকে না, হয়তো রাস্তায় বেরিয়ে চ্যাঁচামেচি করবে। যে কিছু পায় না সে নিজের অধিকারের জন্যে সবচেয়ে বেশি গোলমাল করে তো, দেখেন নি আপনি?'

এরপরও অবন্তীর বোঝাবার প্রয়াস, এই তিন-চারটি দিন শ্যামল বুভুক্ষু ভিখিরির মতো কাটিয়ে গেছে, হাজার অনুরোধ উপরোধেও অবন্তীর ধরাছোঁয়া পায় নি। অবন্তী এখন প্রাণ-তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত। নারীত্বের বিধি নিষেধ ভুলে প্রণয়-বাসনায় উপযাচিকা। নানা ভাবভঙ্গির সাহায্যে এত-

গুলি নির্জলা মিছে তথ্য নিবেদন করার পর অবন্তী বলে, 'ওঃ, একটু ভালো করে আদর-টাদর করুন তো, এমন অভ্যেস করে দিয়েছেন, একটা দিন কাছে আসতে না পেলে ভালো লাগে না। কারো নিশ্বাসের সঙ্গে নিশ্বাস না মিললে আমার মনে হয় যেন আমার দম নেবার বাতাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে!'

এই ধরনের কথাবার্তা, কিংবা এমন উৎকণ্ঠিত অনাবৃত আত্মপ্রকাশ অবন্তীর কিন্তু সাধারণত হয় না। শ্যামল এখানে এসে কয়েকদিন থেকে চলে যাওয়ার পর ভাস্করের সঙ্গে দেখা হলেই তার আন্তরিক চাহিদার রূপ এমনি করে প্রকাশিত হয়।

অবন্তীর ষোল আনা অভিনয় টের পেতে ভাস্করের অসুবিধে নেই। তবু নিজের ঈর্ষার গায়ে মিছে সান্ত্বনার মলমের প্রলেপ ভালোই লাগে। অবশ্য ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিক ভাস্কর একথা বিশ্বাস করে, অনেক সময় অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষপূর্ণ পরিস্থিতিতে দাম্পত্যবিধির প্রকাশ উত্তম-রূপেই হয়, কারণ আসঙ্গ শুধু পরস্পরকে তৃপ্ত করার অভিপ্রায় নয়, নিঃশেষ এবং ধ্বংস করার বাসনা।

বরাবরই শ্যামল চলে যাওয়ার পর অবন্তীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত ভাস্করের পক্ষে রাজকীয় মর্যাদাসহ সবকিছু গ্রহণের অবসর। পরের সন্ধ্যে থেকে এ দুর্লভ প্রাপ্য আর জোটে না। তখন অনেক আয়াসপূর্ণ সঞ্চার সঙ্গে আহরণ করতে হয়। উপরন্তু হয়তো অবন্তীর তাৎক্ষণিক মনমর্জি অনুযায়ী কিছু রূঢ় ভর্ৎসনা বা ব্যঙ্গবিদ্রূপ। তবে নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে বিহার করতে গেলে সর্বদা নিজের মর্যাদা রক্ষা হয় না। এ সূত্র অস্বীকার করতে হলে ওপথে পদার্পণ না করাই সঙ্গত।

এমন হয়েছে, সন্ধ্যের পর দেখা করতে এসে সম্পূর্ণ আক্ষরিক সাক্ষাত সেরেই অবন্তী বাড়ি ফিরে গেছে। ভাস্করের পক্ষ থেকে কিছুক্ষণ থাকার অনুরোধ বা আকুতি সে আমল দেয় নি। তার সারাদিনের প্রতীক্ষা, নিয়মিত সান্নিধ্যের সহজ কামনা ব্যর্থ। বাকি রাতটা নিশ্চুপ ক্ষোভ এবং আত্মদাহের আগুনে দগ্ধ হয়ে শেষ হয়েছে। তেত্রিশ বছর বয়সের সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনটাকে ঘোর অর্থহীন ও অপরিমেয় শূন্যতায় পূর্ণ বলে

মনে হয়েছে তখন। সেই সঙ্গে এক ধরনের উপায়হীন ও প্রতিকারহীন অপমানবোধ।

ভাস্করের তখন মনে হয়েছে এই সময় অবন্তীকে হাতের কাছে পেলে তার মাথার সুদীর্ঘ বেণী ফাঁসির মতো গলায় জড়িয়ে দিয়ে খুন করতে পারে। উনত্রিশ বছর বয়সেও অবন্তীর অত ঘন আর ভ্রমরকৃষ্ণ চুল কেন? প্রায় দশ বছর ধরে অপর এক পশুপ্রকৃতি পুরুষের দ্বারা ভোগ করা শরীরে এমন অক্ষয় যৌবন কেন, যে সব ঐশ্বর্যের অধিকার চিন্তায় অবন্তী এতটা দাম্ভিক হয়ে উঠেছে? এতখানি যৌবনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। শুধু যৌবন দিয়েই সান্নিধ্য সুখের মাত্রা নির্ণয় হয় না। অবন্তীর প্রেমহীন দাম্ভিকতা তার দেহ ও মনে অনির্বাণ অতৃপ্তি ও জ্বালাময় আগুন ধরিয়ে দেয়। মনে পড়ে না অবন্তী একদিনের জন্যেও তাকে পরিতৃপ্ত করেছে কি না!

পরের দিনই অবন্তীর স্বাভাবিক আবির্ভাব। ভাস্করের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে অপরিমিত সময় অবস্থান। উত্তপ্ত উদার সম্ভাষণ। ভাস্কর তখন মনে করতে বাধ্য হয়েছে অবন্তীর অনিঃশেষ যৌবনের মতোই তার অপরিসীম ভালবাসা তাকে আবরিত করে রয়েছে। এ ধরনের ভালবাসার সত্বভোগ একাধিক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। অবন্তীর জীবনে শ্যামলের সংস্পর্শের চিন্তা শুধু বিভীষিকাময় স্বপ্নবিলাসিতা। তারা পরস্পরকে চেনে না পর্যন্ত!

হয়তো বা এর পরই কোনো এক সন্ধ্যেয় অবন্তীর বাড়ি গিয়ে ভাস্কর তার সর্পিল শীতলতার সাক্ষাত পেয়ে দু'মুহূর্তের মধ্যে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসেছে। চোখের সম্মুখে তার সশরীর এবং পূর্ণপরিচিত উপস্থিতি সত্বেও অবন্তী চিনতে পারে নি। ভাস্করের মনে হয়েছে ঐ দাম্ভিকতার মানসিক অন্ধকারই অবন্তীর চোখে পরিচয়ের আলো ফুটতে দেয় নি।

'আমি আজ উঠছি তাহলে?'

তৎক্ষণাৎ জবাব, 'আসুন।' এর বেশি কথা বলে নি অবন্তী।

অবন্তীর একমাত্র উদ্দেশ্য, নারী হিসেবে সে যে অত্যন্ত মহার্ঘ, তাকে পাওয়ায় সর্ব প্রাপ্তির স্বাদ, না পাওয়ায় সর্বস্ব ক্ষয়, তা ভাস্করকে সদা-

সর্বদা স্মরণ করিয়ে বাখা। সেইজন্যেই তাব এই পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার। কথাটা ভাস্কব না বোঝে এমন নয়, তবু অবন্তীব ভাবভঙ্গিব নিয়ত পবি-বর্তনেব দরুন তা ভুলে যায় সে।

কিন্তু সেদিনেব ব্যাপাবটা সম্পূর্ণ অন্যবকম। আগাগোড়াই আলাদা। অন্যান্য বাব শ্যামল চলে যাওয়াব পব অবন্তীই প্রথম এসে ভাস্করেব সঙ্গে দেখা কবে। বিবিধ সোহাগ ও উপচাবে অভিমান ভোলায়। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ভাস্করের মন থেকে ঈর্ষাব কাঁটাটা সে তুলে ফেলে দেয়। ঐ কাঁটা বুকে বিঁধে, অতটা অভিমানেব ভাব মনেব ওপব চাপিয়ে, জীবন বসে টইটম্বুব সাগব পাড়ি দেওয়া যায় না। অবন্তী যা কবে নিজেব সুখের জন্য কবে, ভাস্করের পবিতৃপ্তিব জন্যই শুধু নয়।

এবারও শ্যামল এখানে আসাব পব ভাস্করেব সমস্ত চেতনা অবন্তীর বাড়ির ওপব গিয়ে নিবদ্ধ হয়। তাব আসা থেকে যাওয়া প্রতিটি নির্ঘণ্ট ভাস্করেব নখদর্পণে। কদিন থেকে মনেব উৎক্ষেপ বড় দ্রুত হয়ে উঠেছিল, সেদিন তাই শ্যামল চলে যাওয়াব পব অন্যান্য বাবেব মতো সে আর অবন্তীব অপেক্ষা কবতে পারেনি, নিজেই তাব বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল। নিয়ম মতো অবন্তীব সোহাগ দেখানোব পালা, কিন্তু হলো বিপরীত। এতখানি বৈপরিত্ব তাব পূর্বেকাব কোনো আচরণেব সঙ্গে মেলে না। ভাস্কব শুধু বিস্মিত নয়, তাব মনে হয়েছে এতদিনকাব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চিবদিনের মতোই বিলুপ্ত। তবু নৈরাশ্যমুখী আশা নিয়ে অবন্তীব জন্যে কিছুদিন অপেক্ষা কবেছে সে।

অবন্তী বলেছে, হয় আমায় বিয়ে করুন, নয় সম্পর্ক ত্যাগ করুন। তাকে বিবাহ করার কথা ভাস্কর কখনো চিন্তা কবে নি। তবু এ সমস্যা দেখা দিলে সে পিছিয়ে যেত না। কিন্তু এখানে তার কিছু কবণীয় নেই। বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত অবন্তীর সঙ্গে তাব বিয়ে হতে পারে না। আইনের এ বাধা সরাতে পারে শ্যামল অথবা অবন্তী স্বয়ং তাদেরই একজনকে জজের আদালতে বাদীর ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে উভয়েই উদাসীন।

এই দ্বিধাযুক্ত পরিস্থিতির মাঝে ভাস্করের বিবাহের কথাটা এগিয়ে

চলেছে। অবন্তী অধ্যায় জীবন থেকে চিরদিনের মতো সরে গেছে বলেই বিশ্বাস। তবু শেষ মুহূর্তে একটা দায়িত্ব বোধ, নৈতিকতার মানসিক পীড়ন।

মনে হয়েছিল সেদিন অবন্তী যা-ই বলে থাকুক না কেন, যা-কিছু দাম্ভিক উক্তি, ভাস্করের অন্যত্র বিবাহ, এ সাংঘাতিক খবর পেলে সে আর স্থির থাকতে পারবে না। অবন্তীর পত্নীত্বের একটা পরিচয়পত্র আছে, তার অতিরিক্ত কিছু না। এ অভিজ্ঞান নিয়ে সারাটা জীবন কাটানো অসম্ভব। অবশ্যই সে নিজের একটা সুষ্ঠু ও সম্মানজনক ভবিষ্যৎ খুঁজবে। একই সুযোগ বার বার আসে না।

মেয়েরা সাধারণত স্বার্থান্বেষী, অবশ্য তা না হলেও নয়। ত্যাগের অভি-মানে ভূষিত হতে গেলে ভবিষ্যতে অনেকখানি সামাজিক গ্লানি অঙ্গে মেখে যেতে পারে। প্রেম অপ্রেমের প্রশ্ন বাদ দিয়েও যে কোনো মেয়ের জীবনে নিরাপত্তার চিরন্তন জিজ্ঞাসা। অবন্তী চাইবে না তার ভবিষ্যৎ চিরদিন অসহায় ও সর্বজনচক্ষে ব্যঙ্গাত্মক হয়ে থাকুক।

এই চিন্তার জন্যই বিয়ের ব্যাপারটা অনেকখানি এগিয়ে গেলেও ভাস্কর এখনো পাকা কথা দিতে পারে নি, শুধু কন্যা পক্ষের চাপেই এতটা বিস্তার।

খবর শুনে অবন্তীর চোখ বা কপালে একটা রেখা পড়ল না, মুখটা রক্ত-শূন্য হলো না, বরং ভাস্করের অনুমানই আহত। অবন্তীর পক্ষে এতখানি উপেক্ষা জমা হয়েছে এ সংবাদ থাকলে সে আজ সেখানে নিজের নৈতিকতা যাচাই করতে যেত না।

অবন্তী বলল, 'আগেই শুনেছি।' অথচ এ খবর এখনো পর্যন্ত এখানে রাষ্ট্র হয় নি, শুধুমাত্র বি. ডি. ও জানেন। পাত্রী পক্ষ তাঁর কাছে পাত্রের বিষয় জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। বি. ডি. ও কি বলেছেন তা ভাস্করের জানা নেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর থেকেই পাত্রীপক্ষের উদ্যোগ আয়োজন পূর্ণবেগ হয়েছে।

একটা কথা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ভাস্করের স্মরণ হলো। বাড়ি ফিরেই অবন্তী বলেছিল, 'বি. ডি. ও-র কোয়ার্টার থেকে আসছি।' বি ডি. ও.

কখনো অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে কোয়ার্টারে দেখা করেন না। উপরন্তু আজ রবিবার, সন্ধ্যে উত্তীর্ণ। আর অবন্তী নারী। সুন্দরী যুবতী! এতক্ষণে ভাস্কর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা সিগারেট ধরাল, অথচ মনের কোথায় জ্বালা ধরে গেছে যেন!

অবন্তীর এ উপেক্ষা সকারণ। আকস্মিক নয়, পূর্বসংকল্পিত প্রস্তুতি ছিল তার। ছ'মাসের অদর্শনে অবন্তীর স্থির যৌবন অনভিষিক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে নি। হয়তো এর সূত্র ছ'মাসের বহু আগেই রচিত।

স্বস্তি, সেইসঙ্গে বিচিত্র বেদনা বুকে নিয়ে ডাক্তার ভাস্কর মুখার্জি নিজের কোয়ার্টারে ফিরল। পূর্ণ সম্মতি জানিয়ে কাটিহারের পাত্রীপক্ষকে আজই চিঠি লিখবে। তারা বহুদিন থেকে অপেক্ষায় রয়েছে।

১৩

মাঝখানে আর একটা রবিবার গেছে, তারপর আরও চারদিন। অর্থাৎ ঠিক এগারো দিন আগে অবন্তী ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের কোয়ার্টারে পাঁচশ' টাকার উপযাচিত ঋণ শোধ করতে গিয়েছিল। সে ঋণ শোধ হয়েছে, কিন্তু অবন্তীর মন থেকে দেনার বোঝা যেন কিছুতেই নামতে চায় নি।

তারপরও প্রায় প্রতিদিন বি ডি.ও-র সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। বি.ডি ওর ঘরে গিয়ে সে নিয়মিত হাজরি খাতা সই করেছে, তবে আর কোনোদিন দেরির কৈফিয়ৎ লিখতে হয় নি। মাঝে মাঝে বি.ডি.ও. তাকে নিজের ঘরে ডেকে কাজকর্মের ব্যাপারে জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। কোনো কোনো বিষয় নিয়ে বিরক্তি অথবা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে অবন্তী একটি দিনও সেই সন্ধ্যের আকস্মিকভাবে পরিচিত মানুষটির সাক্ষাত পায় নি।

বি. ডি. ও-র কক্ষে হাজরি সই করে অফিস ঘরে এসে গতকালের কাজের রিপোর্ট লিখতে বসল অবন্তী। ইতিমধ্যেই আজ অফিসে উপ-

স্থিতের সংখ্যা বেশি এবং আবহাওয়াও যেন এত সকালেই খুব ব্যস্ততা-ময়। ওয়েলফেয়ার সুপারভাইজার দুখারাম বৈঠা ছাড়া বড়বাবু ও জন-দুই কেরাণীও উপস্থিত।

অবন্তীর মনে হলো ব্লকে কোনোমন্ত্রী আগমনের সূচনা। এ প্রস্তুতির সঙ্গে তার নিজের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। এসব ওপর মহলের ব্যাপার। ওদেরই মাথাব্যথা। তার কাজ শুধু যথাসময়ে অফিসে হাজির হওয়া। আগেকার দিন হলে অসুবিধে ছিল, কিন্তু ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ বি.ডি.ও হয়ে আসার পর সময়ানুবর্তিতা মজ্জাগত হয়ে গেছে। একা অবন্তীর নয়, সবারই। অফিসের চেয়ার টেবিলগুলো পর্যন্ত যেন সময় বুঝতে শিখেছে, যথা সময়ে তারাও ব্যবহারকারীদের দেহের স্পর্শে ক্যাঁচ কোঁচ করে!

ও পাশের চেয়ারে একটু শব্দ হলো, 'দেবীজী ?'

অবন্তী তাকিয়ে দেখল ওয়েলফেয়ার সুপারভাইজার তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

'কিছু বলছিলেন নাকি ?' মুখে হাসির রেখা টানে অবন্তী।

'চলো মুসাফির, গাঁটরি উঠাও; Strike the tent!' অর্থপূর্ণ হাসি হাসে ওয়েলফেয়ার সুপারভাইজার দুখারাম বৈঠা।

অর্থ বুঝতে পারে না অবন্তী, মুখ ও চোখ দুটিতে বিস্ময় ফুটিয়ে তোলে সে, তারপর প্রশ্ন হয়, 'মানে ?'

'দেখে বুঝতে পারছেন না, এই বি.ডি.ও-টি গেলেন!' কথার শেষে দুখা-রাম আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসে।

বড় একটা লেজার খুলে বসেছিলেন বড়বাবু মুরারী যাদব, এবার মাথা তুলে অবন্তীর দিকে তাকালেন, 'আপনি এখনো শোনেন নি দেবীজী, বি.ডি.ও. রিজাইন করেছেন, কাল দুপুরে গভর্নমেণ্টের অনুমতি চলে এসেছে ?'

একটা আকস্মিক আঘাতে অবন্তীর ভেতরটা মুচড়ে উঠল যেন, তবু ব্যথা গোপন করে সে সাধারণ স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'উনি কবে যাচ্ছেন ?'

'আজ বেলা বারোটায় অঞ্চল অধিকারীকে চার্জ বুঝিয়ে দেবেন, তারপর

নতুন বি. ডি.ও. যবে আসেন। স্টেটের ব্যাপার তো, হয়তো বছর গড়িয়ে যাবে, ততদিন এই মুরারী যাদবই আসল বি. ডি. ও।' বেশ আত্ম-প্রসাদের হাসি হাসেন মুরারী যাদব।

'শ্রীমতীজী', ওয়েলফেয়ার সুপারভাইজার ডুখারাম বৈঠা বলে,'আপনারা সকলে মিলে কিন্তু আমায় একদিন পেট ভরে মিঠাই খাওয়াবেন।'

'কেন বলুন তো?'

দরাজ গলায় ডুখারাম উত্তর দেয়, 'বুঝলেন দেবীজী, বি. ডি. ও যাওয়ার পেছনে আমি। গত শ্রাবণে চল্লিশ মাইল পায়ে হেঁটে গিয়ে দেওঘর বৈজনাথধামে বাবার মাথায় গঙ্গাজল ঢেলেছিলাম, বি. ডি. ও-কে তাড়াও বাবা! কিন্তু এখনওঁর বদলির কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তাই বাবার চাপে পড়ে ইস্তফা দিতে হলো। নয়তো কবে কোথায় শুনেছেন, বি ডি.ও-র চাকরিতে কেউ ইস্তফা দেয়?'

ডুখারাম বৈঠার কথা শুনে অবন্তীর মনে হচ্ছিল নিজের চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে তার গালে একটি চড় মেরে বলে, 'চুপ করুন আপনি, আর একটিও কথা শুনতে চাই না, সাট্ আপ্!' কিন্তু এদের দলের একজন হিসেবে মনের এ ভাবখানা সম্পূর্ণ চেপে রেখে সে মৃদু হেসে প্রশ্ন করল, 'ওঁর ওপর এত রাগ কেন আপনার, কি অপরাধ করেছেন?'

'অপরাধ?' ডুখারাম বৈঠা বলে, 'উনি সাবর্ডিনেটদের দেখতে পারতেন না, সবসময় চেষ্টা, কি করে তাদের বিপদে ফেলা যায়। এখানে আর বেশিদিন থাকলে আমার বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া ঘুচে যেত। তার ওপর আমার মতন যারা পিছড়ি জাতি, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস, তারা তো একে-বারেই চক্ষুশূল। নেহাত গভর্নমেন্ট আমাদের ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখে, নয়তো আমার চাকরি উনি কবে খেয়ে বসতেন। এখানে এসে অবধি আমায় পাঁচটা ওয়ারনিং দিয়েছেন, কৈফিয়ত তলব তো রোজের ব্যাপার।'

ডু'জনের কথার মাঝে এবার কথা বলেন বড়বাবু মুরারী যাদব, 'য়্যায়সী বাত্ নঁহী হ্যায়। বি. ডি. ও. একটু ঘমন্ডী, এই যা। গর্ব বড় বেশি। চাকরি ছাড়ার কারণ, মানি, রুপায়া। বি. ডি. ও-র যা মাইনে তার চেয়ে

বেশি স্টেট ব্যাংকের পিওন পায়। ছ'নম্বর কারবার ছাড়া চলতে পারে না। এ বি. ডি. ও-র সে গুণ নেই। তো চলবে কি করে ? আর সিনেমা হাউস আছে, হাজার বিঘে জমি আছে, এগুলো দেখা শোনা করলে চাকরির বিশগুণ পাবে।'

অবন্তী কোনো মন্তব্য করল না, মনে মনে হাসল। সিনেমা হাউস বা হাজার বিঘে জমির হিসেব-কিতাব সেদিনই তাকে ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ নিজে দিয়েছেন। তাছাড়া লোকটি কি সত্যিই দাম্ভিক ? একথা ঠিক, অফিসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস কারো নেই, সে তাঁর অতি উন্নত ব্যক্তিত্ব। আর তিনি কি সত্যিই অধঃস্তন কর্মচারীদের শত্রু ? অফিসের কারো সঙ্গে ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের ব্যক্তিগত স্বার্থের সূত্র-বন্ধন নেই, এটিই এদের আসল ক্ষোভ।

সামনের লেজারটা বন্ধ করে বড়বাবু একপাশে সরিয়ে রাখলেন, তারপর পকেট থেকে পান-জর্দার ডিবে বার করে মুখে পান পুরলেন। কালো পাতি পীলা পাতি মিশ্রিত জর্দা। এক মিনিট পরে উঠে গিয়ে জানলার ওপারে পিক্ ফেলে নিজের জায়গায় এসে বসলেন তিনি। ছোটবাবু তখনো একটা মোটা খাতায় মুখ ডুবিয়ে রয়েছেন, এতক্ষণের মধ্যে একটি কথাও বলেন নি। ছোটবাবুকে উদ্দেশ্য করে বড়বাবু বললেন, 'অত কি দেখছেন, খাতা-পত্র বন্ধ করে চলুন বাড়ি যাই। চার্জ পেপার আমার তৈরি হয়ে গেছে, বকেয়া কাজ তো কিছু নেই। একশ'টা ব্লক ঘুরে এলেও আমাদের মতন এমন অফিস কেউ খুঁজে পাবে না, যেখানে একটাও পেনডিং ফাইল নেই।'

ছোটবাবু শংকিতস্বরে উত্তর দিলেন, 'তবু—। কি জানি যাবার আগে যদি একটা খোঁচা দিয়ে যায় ?'

'খোঁচা আবার কি ? এ বি. ডি. ও-র মতন এমন কানিং লোক আজও দেখি নি। কাল দুপুর পর্যন্ত রেজিগনেশনের কথা আমাদের জানতে দেন নি, পাছে অফিসের কাজে ঢিলে পড়ে যায়।'

উঠতে চাইলেও বড়বাবু চুপ করে বসে রইলেন। বি. ডি. ও. এখনো অফিস ছেড়ে স্নানাহারের জন্যে যান নি, এই অবস্থায় তাঁর নিজের চলে

যাওয়াটা দৃষ্টিকটূ দেখাবে। যদিও বড়বাবুর অফিস আসার সময় দশটা, তবু চার্জের কাগজ পত্র তৈরি করার জন্যে একবার যখন এসে পড়েছেন, তখন হঠাৎ চলে যাওয়া ভালো দেখায় না। অন্তত এই শেষ দিনটা।

বড়বাবু মুরারী যাদব আবার দু-খিলি পান মুখে পুরলেন, অন্যমনস্কভাবে চিবুতে চিবুতে কথা বললেন তিনি, 'আমাদের উচিত বি.ডি.ও-কে ফেয়ার-ওয়েল দেওয়া। উনি—'

'উচিত! Why sir?' দুখারাম বৈঠার বেশ তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন, অর্থাৎ প্রশ্নাকারে প্রতিবাদ তোলে।

'যে অফিসার যান, তাকেই তো দেওয়া হয়।' জবাব দেন বড়বাবু।

'সেটা বদলির ব্যাপারে, ইস্তফায় তো নয়।'

বড়বাবু বলেন, 'এর আগে কেউ তো আর ইস্তফা দেন নি। অফিসার চলে যাচ্ছেন, সেইজন্যেই ফেয়ারওয়েল। আপনার মত কি শ্রীমতীজী?'

অবন্তী স্টেটমেণ্ট লিখছে, গতকাল কি কি কাজ করেছে তারই ফিরিস্তি। আজ সে স্থির করেছে এ তথ্যে একটিও মিথ্যে লিখবে না। অবশ্য আজ-কাল মিছে কথা লেখার দরকারও হয় না। চব্বিশটা ঘণ্টাই মনে হয় অবসর। ঘড়ির প্রতিটি মুহূর্ত দুর্বহ। প্রকৃত তথ্যেই ডায়রি উপচে পড়বে, কিন্তু মিথ্যেটা এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে যে নিজের অগোচরে এসে পড়ে।

এ ডায়রি বি. ডি. ও-র টেবিলে যাবে বেলা ন'টায়। তিনি দেখবেন কিনা কে জানে! আবার পরবর্তী বি. ডি. ও-র আমলে কোন্ নতুন নিয়ম চালু হবে কে বলতে পারে? মিথ্যেতেই অভ্যেস, তবু অবন্তী আজ চিন্তা করে করে সত্যিই লিখছে।

বড়বাবুর প্রশ্ন শুনে অবন্তী ঘাড় তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, তারপর অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে জবাব দিল, 'আপনার যখন ইচ্ছে রয়েছে তখন ফেয়ারওয়েল দিলেই হয়। কবে দেবেন?'

'আজ তো নয়ই, এখনো চার্জ দেন নি। নেমনতন্ন করতে গেলে ভাববেন কারাপটু করবার চেষ্টা করছি! কাল-পরশু দিলেই হবে।' বড়বাবু বিষণ্ন হাসলেন, 'আমি নিজের তরফ থেকে ওঁকে একটা লাঙল উপহার দেব।'

'লাঙল, তার মানে ?' প্রশ্ন তুখারাম বৈঠার।
বিষণ্ণ হাসি হেসে বড়বাবু উত্তর দেন, 'চাকরি ছাড়ার পর কিছু একটা করা চাই তো, জমিজায়গা আছে, ক্ষেতে গিয়ে লাঙল চালাবেন।'
মনের মতো কথা পেয়ে তুখারাম বৈঠা সজোরে হেসে ওঠে, 'দ্যাটস্ দ্য রাইট প্লেস ফর হিম ! আমি লাঙলের ফলাটা দেব আর আপনি দেবেন কাঠ।'
বড়বাবু বলেন, 'সত্যিকার বি. ডি. ও-র প্লেস অবশ্য এইসব জায়গা। এরকম বারোটা অফিসার পেলে দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে। কিন্তু উনি যখন থাকবেনই না !'
তুখারাম বৈঠা বোধহয় প্রতিবাদ করতে যায়, তার উপক্রম বুঝতে পেরে অবন্তী বলে, 'বি ডি. ও. তো সাহিত্যচর্চা করেন। এবার থেকে হয়তো পুরোদমে তাই করবেন ? এ যে বি. ডি. ও-র নিজেরই মনোগত ইচ্ছে, তা অবন্তী ভাঙে না।
সাহিত্য ! বড়বাবু মুরারী যাদব অবাক্ স্বরে বলেন, 'কি যে বলেন আপনি শ্রীমতীজী, আমাদের দেশী কবিতা আবার সাহিত্য ? ওসব বস্তু নিজের টাকা খরচ করে ছাপাতে হয়, বই করে বন্ধুদের উপহার দিতে হয়। আমার চাচেরা ভাই তিতলি ছদ্মনামে কবিতা লেখে, মোহনকুমার যাদব তিতলি। কবি। আটখানা বই। তার সাহিত্য মানে বছরে হাজার বারোশ' টাকা দণ্ড। নেহাত ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলি, জমি জায়গা দুধের ডেয়ারী ফার্ম, এইসব আছে, তাই চলে যায়। নয়তো তিতলি কবির পেছনে পাওনাদারের ওয়ারেন্ট ঘুরতো।'
অবন্তী হেসে ফেলে, তারপর হাসি সামলে নিয়ে বলে, 'আমাদের বি. ডি ও-র কিন্তু নাম আছে।'
'শ্রীমতীজী, দেবীজী, নাম না বদনাম ? কবিতা করতে গিয়ে চাকরি খোয়ালেন ! আমি তো এরপর বদনামই করব।'
প্রসঙ্গে বিরতি দিয়ে অবন্তী আবার রিপোর্ট লেখায় মন দেয়। বড়বাবুর আন্তরিক ক্ষোভ উপলব্ধি করে সে। অথচ বড়বাবু ও বি. ডি. ও. ভিন্ন ধাতু। বড়বাবুর চুরির পরিমাণ পাহাড়পর্বত। এই বি. ডি. ও আসার

পর তাতে একটুখানি ভাঁটা পড়েছিল। তবু বি. ডি ও-র বিদায় পর্ব তিনি খুশিমনে নিতে পারছেন না। বাহ্যিকভাবে না হলেও তাঁর মনের মধ্যে হয়তো একটা পরিবর্তন ও সংশোধনের ক্রিয়া চলছে।

পিওন মোহর সিং ঘরে ঢুকল। বড়বাবুর টেবিলের কাছে কি একটা কাগজ নিয়ে গেল সে। কাগজটা হাতে নিলেন বড়বাবু, পড়ার আগেই বললেন, 'আজও কাগজ! ন'টা বেজে গেছে, আর তো মাত্র তিনঘণ্টা। তারপর এ আপিসে ঢুকতে হলে তোমায় মোহর সিং-এর অনুমতি নিতে হবে।'

'দস্তখৎ কর্ দিজিয়ে বড়াবাবু, সাহেবকা অর্ডার।'

এবার কাগজ পড়লেন বড়বাবু, মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর, অথচ বেশ উজ্জ্বল! সই করার পর বললেন, 'এ কাগজে তোমাকেও সই করতে হবে মোহর সিং, কারো ছাড় নেই। আগে দেবীজীকে দেখাও, তারপর আর সবাইকে।'

অবন্তীর মন কৌতূহলী হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে ভয়ও খানিকটা, কি হতে পারে বি. ডি. ও-র শেষ নির্দেশ!

টাইপ নয়। বি ডি. ও ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের নিজের হাতে লেখা। আজ সন্ধ্যেবেলা অফিসের সকলকে লঘু জলপানের জন্যে তাঁর কোয়া-র্টারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রতিটি নাম স্পষ্ট অক্ষরে সম্পূর্ণভাবে লেখা।

অবন্তীরও!

নিজের নামের পাশে পরিপূর্ণ দস্তখত করল অবন্তী, বেশ খানিকটা সময় নিয়ে। কিন্তু তারপরও কাগজটা সে হাত থেকে সহজে ছাড়তে পারল না।

১৪

'His sad and sudden demise has deeply shocked us ; তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সভ্যরূপে ওকালতি বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন। যে কেউ তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছেন তিনিই ধন্য। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। এই প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি সংবাদ সংস্থা এবং একটি শোকতপ্ত পরিবার-বর্গের নিকট প্রেরিত হোক।'

আজ উশ্রীর কাছারি পৌছতে একটু দেরি হয়ে গেছে। দু'তিনটি কারণ মিলিয়ে বিলম্ব। গতকাল ছিল পনেরোই আগস্টের ছুটি, শ্রীপুর থেকে ভাস্কর এসেছিল। আজ সকাল দশটায় সে মোটরবাইক উড়িয়ে শ্রীপুর পাড়ি দিয়েছে। তারপর উশ্রীর কাছারি আসার প্রস্তুতি। এই জন্য অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে সে সিনিয়ারের অফিসেও যেতে পারে নি। ভদ্রতা করে নিজের অনুপস্থিতির কারণ জানিয়ে একটা লোক পাঠাবে তেমনও কেউ বাড়িতে নেই।

তারপর কাছারির পোশাকে সাজগোজ সেরে তৈরি হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে নিত্যদিনের মতো রিক্সার মড়ক। সময়ে কখনোই ওদের ধরা যায় না। অ-দরকারে রাস্তা চলতি মানুষের কানের কাছে এসে ঘন্টি বাজায়।

শেষ পর্যন্ত দেড়গুণ ভাড়ায় জুটল একটা, প্রতি মুহূর্তে চেন পড়া আধ-ভাঙা রিক্সা : বার লাইব্রেরির পাশে রিক্সা থেকে নেমে উশ্রী দেখল ঘড়িতে এগারোটা পঁয়ত্রিশ। ফার্স্ট অ্যাডিশনাল ডিসট্রিক্ট্ জজের কোর্টে জয়রামদাস হনুমানদাসের ইনসলভেন্সি মোকর্দমা চলছে। এক তরফে সিনিয়ার ধীরেন গুপ্ত, ও পক্ষে সুরজিৎ সিংহ।

ধীরেন গুপ্তর আরও দু'জন জুনিয়ারের সঙ্গে উশ্রী তৃতীয়। ঐ দু'জনের

একজন অবশ্য যথেষ্টই বয়স্ক, নিজেও সিনিয়ার। অধিকাংশ কাজ তিনিই করেন, ধীরেন গুপ্ত বসে থাকেন, প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে ওঠেন এবং প্রধান সাক্ষীদের জেরা করেন। এ কেসে উশ্রীর উপস্থিতি অবান্তর। সে না থাকলেও কাজ চলে যেতে পারে। বরং এ পক্ষের উকিলরা ভালোভাবে বসার জায়গা পান। উশ্রীর বেঞ্চিতে বসা মানেই প্রায় দু'জনের জায়গা আটকে ফেলা। ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে সে অবশ্য বিশেষ সংকুচিত নয়, কিন্তু সে পাশে বসলেই বাকি দুজন উকিল বেশ বিব্রত হয়ে পড়েন।
গাউন পরে উশ্রী জজের কোর্টে ধীরেন গুপ্তর সঙ্গে বসছে, খুব বেশি না বুঝলেও কাগজপত্র বই কেতাব নাড়াচাড়া করছে, সেই সুবাদে তার ফী দশটাকা। এটি যেন তার কাছে জয়রাম দাস হনুমান দাসের পূর্ব জন্মের ঋণ। ধীরেন গুপ্তর চেম্বারের নিয়ম, সর্বাগ্রে মুহুরীর তহুরী, তারপর জুনিয়ারের ফী এবং সর্বশেষ তিনি ; কারণ চালাক মক্কেলদের ফাঁকিটা সাধারণত নিচের দিক থেকেই শুরু।
উশ্রীকে বোধহয় অন্যমনস্ক দেখে জজ মল্লিক সাহেব একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মিসেস মুখার্জি, আপনি কি এ মোকর্দমা বুঝতে পারছেন ?'
উশ্রী ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'হ্যাঁ স্যার।'
'এটা তো প্রেসিডেন্সি ইন্সলভেন্সি আইনের অন্তর্গত মোকর্দমা ?'
জজ সাহেব পরীক্ষা করছেন ! উশ্রী জবাব দেয়, 'না স্যার।'
'না ! তবে ?'
উশ্রী বিনীত জবাব দেয়, 'প্রাদেশিক আইন—'
এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে জজ সাহেব আবার প্রশ্ন করেন, 'কোন্ সেকশনে প্রসিডিং চলছে ?'
'ধারা নয় আর চব্বিশ, স্যার।' কিঞ্চিৎ দ্বিধাযুক্তস্বরে উশ্রী উত্তর দেয়।
সপ্রশংস দৃষ্টিতে উশ্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে জজ সাহেব বলেন, 'ধন্যবাদ। আপনি দেখছি খুবই নিষ্ঠাবতী উকিল, ভবিষ্যতে আপনার উন্নতি অবধারিত। You will rise in near future !'
পরের দিনই মল্লিক সাহেব উশ্রীকে একটা কমিশন দিয়েছেন। একটি উইলের প্রবেট কেসে এক পর্দানশীন মহিলার বাড়ি গিয়ে দু' তরফের

উকিলের সামনে তার এজাহার নিতে হবে। শহরেই বাড়ি সেই সাক্ষীর। উশ্রীর ফী দিনপিছু বত্রিশ।

কাগজপত্র দেখে ধীরেন গুপ্ত বলেছেন, 'কমিশনের কাজ একটু দীর্ঘ হয়, দিন তিনেক চলবে। কমিশন করতে যাওয়ার আগে তোমায় আমি সব বুঝিয়ে দেব।'

আগামী রবিবার তারিখ ফেলেছে উশ্রী, দুপুর দুটো থেকে কমিশন বসবে। আইনের অর্থ অনুযায়ী উশ্রী তখন হাকিম। জজের প্রতিভূ! জজের সমানই সব ক্ষমতা। সিভিল প্রসিডিয়ার কোড্ ঘেঁটে এ প্রসঙ্গে উশ্রী পড়াশোনা সব সেরে রেখেছে।

বার লাইব্রেরির সিঁড়িতে উঠে উশ্রী লক্ষ্য করে হলঘরের সব দরজার কাচের পাল্লাগুলো ভেজানো। ভেতরে প্রায় দু'তিনশ উকিলের দণ্ডায়মান চেহারা দেখা যাচ্ছে। উকিল ছাড়া আর কেউ নেই ঘরটাতে। একটা দরজায় পাহারা রয়েছে লাইব্রেরির বুক সেকশনের সেকেণ্ড বেয়ারা ইদরিস, উশ্রীকে দেখে দরজা একটু ফাঁক করে বলল, 'আইয়ে ভিতর দিদি।'

সেই মুহূর্তে ভেতরে না ঢুকে উশ্রী দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করে, 'ব্যাপার কি ওখানে, সব দরজা বন্ধ কেন?'

'মিটিং চল্ রহা হ্যায়। সিনিয়ার লয়্যার ডেথ্ কর গয়ে হেঁ।'

আর কোনো প্রশ্ন করে না উশ্রী, দরজার আধ হাত ফাঁক দিয়ে নিজের শরীরটা তাড়াতাড়ি ভেতরে গলিয়ে নিয়ে কালো কোটের ভিড়ভর্তি হলঘরের একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

সভ্যরা সব দাঁড়িয়ে। মৃত্যুর শোক প্রস্তাব পড়ছেন বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুরজিৎ সিংহ। পাশে দাঁড়িয়ে লাইব্রেরিয়ান সুনীল সোম।

মৃতের নামটা কিন্তু উশ্রী এখনো শুনতে পায়নি। এখন নীরবতা পালন, কৌতূহল নিবৃত্তির উপায় নেই।

শোক প্রস্তাব পাঠ, সমর্থন এবং মৃতাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শান্তি

কামনার উদ্দেশ্যে সামগ্রিকভাবে দু-মিনিট নীরবতা পালনের পর বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুরজিৎ সিংহ বললেন, 'ডিসট্রিকট জজের চিঠি এসেছে, বেলা বারোটার সময় ফুল কোর্ট ডেথ রেফারেন্স শুনবেন, এখন পৌনে বারো, আপনারা অনুগ্রহ করে জজের এজলাসে চলুন।'

নীরবতা ভাঙল এবার। উকিল-সভ্যদের মধ্যে মৃদু শব্দে কথাবার্তা।

যে প্রবীণ অ্যাডভোকেটের পাশে উশ্রী এসে দাঁড়িয়েছিল, তিনি মুখের দিকে তাকিয়ে আন্তরিক সুরে দুটো কথা বললেন, 'আমরা খুবই দুঃখিত আর অবাক হয়েছি মিসেস মুখার্জি, ভাবতে পারি নি আজ কাছারি পৌঁছে এত বড় দুঃসংবাদ শুনতে হবে। আমি জানি আমাদের চেয়ে আপনার বেদনা আরও গভীর।'

কোনো উকিল হঠাৎ মারা গেছেন, বার অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সভ্যদের মতো উশ্রীও একটু দুঃখিত, কিন্তু তার দুঃখের গভীরতা আরও বেশি হওয়ার কারণ কি? কেমন সন্দেহ হলো উশ্রীর, অচিরাৎ একটা অনুপস্থিতি নজরে পড়ল।

আজ এখানে এসে উশ্রী সিনিয়ার ধীরেন গুপ্তকে দেখতে পায় নি। ইতিপূর্বে বার অ্যাসোসিয়েশনের অন্য দু-একটা মিটিং দেখেছে সে। সভাপতি সুরজিৎ সিংহের পাশে থাকেন আচকান পরিহিত প্রবীণ সম্পাদক ধীরেন গুপ্ত। আজ তিনি অনুপস্থিত, সেখানে সহ-সম্পাদক আবদুল মুজিব।

সতীর্থ মানুষের ভিড়েও উশ্রীর অন্তরাত্মা গভীর অসহায়তায় বিলীন হয়ে যায়। নিজেকে সে আর খুঁজে পায় না যেন। এতগুলি চেনা অচেনা মানুষের মাঝে নিজের যথার্থ উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না। যেন এই নতুন জগতে কে তাকে আজ একান্ত বিহারের জন্যে ছেড়ে দিয়ে গেল! আর এখানে থাকার কোনো অর্থ নেই। এবার থেকে প্রতিটি মুহূর্তই দুর্বিসহ।

একদা আনন্দি ঝা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, উশ্রী স্থির করেছিল আর এখানে আসবে না, কিন্তু তখন ধীরেন গুপ্তর উৎসাহ তাকে বরাভয় দিয়েছে। আর ঠিক সেই সময় হাইকোর্ট থেকে এসেছিলেন খ্যাতনাম্নী

ব্যারিস্টার শ্রীমতী সুশীলা প্রসাদ।

বয়স ষাট অন্তত। যৌবনের সৌন্দর্য সুষমা উপান্ত প্রৌঢ়ত্বের সম্ভ্রমপূর্ণ আকর্ষণ মহিমায় রূপান্তরিত। দূর থেকে কোনো এক উকিল নির্দোষ গলায় মৃদু কৌতুক করলেন, 'sweet sixty Sushila Prasad ; ষাটোত্তীর্ণা মধুমিতা সুশীলা প্রসাদ !'

কে আবার কথাটা তাঁর কানে তুলে দিয়ে এলো, সুশীলা প্রসাদ এগিয়ে এসে মন্তব্যকারীকে ধন্যবাদ দিলেন, 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার স্বামীর তো নিয়ত অভিযোগ, I am no longer sweet to him ; তাঁর কাছে আমার আর কোনো মাধুর্য নেই। আপনার মন্তব্য তাঁকে জানাব।' তারপর প্রবল আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি।

সুশীলা প্রসাদ এসেছেন ফতেপুর নাইন মার্ডার কেসে আসামীদের তরফে নিযুক্ত হয়ে। সরকার পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করবেন তিনি। তারপর আরগুমেণ্ট।

ধীরেনগুপ্ত বললেন, 'চল উশ্রী, তোমায় পরিচয় করিয়ে দিই। উনি হাই-কোর্টে প্রথম মহিলা, তুমি জেলা কোর্টে। সময় পেলেই কোর্টে গিয়ে মিসেস প্রসাদের জেরা শুনবে, আরগুমেণ্ট শুনবে। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, তারপর লেখাপড়া শিখেছেন, বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ে এসেছেন। ইয়েসটার্ডেজ সোসাইটি ওয়জ ভেরিমাচ এগেনস্ট হার। ঘরে বাইরে সংগ্রাম করতে হয়েছে।'

সুশীলা প্রসাদ প্রথমে স্মিত মুখে করমর্দন করলেন, তারপর বার লাইব্রেরি হলের সংলগ্ন গ্রীন রুম নামের ছোট ঘরখানিতে উপবিষ্ট আট দশজন নবীন ও প্রবীণ উকিলের সামনে উশ্রীর গাল টিপে আদর করলেন তিনি। এবং বললেন, 'আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি, আমার জাত এবার ওকালতিতে এগিয়ে আসছে। এঁরা কি সহজে নিজেদের মনোপলি ছাড়তে চান ! তবে এখানে জায়গা করে নেওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় নিজের মর্যাদা জ্ঞান, ধৈর্য আর কঠিন পরিশ্রম। Success is the long process of severe endurance ; ধৈর্যের সোপান বেয়ে ওপরে ওঠা ছাড়া উন্নতির আর কোনো সহজ পথ আমার জানা নেই। এখানে এসে যারা

খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে চায়, দুদিন পরে তাদের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এই তো দেখে আসছি!'

নিজের ব্যাগ খুলে সুশীলা প্রসাদ উশ্রীর হাতে দু-টুকরো চকোলেট দিলেন, 'এঁরা পান তামাক সেবন করেন, আর আমি চকোলেট চুষি।'

তিন চারদিন সুশীলা প্রসাদকে জজ-কোর্টে কাজ করতে দেখেছে উশ্রী, এমন আভিজাত্যময় সুরুচি সম্পন্ন অমায়িক অথচ তেজস্বিনী মহিলা সে ইতিপূর্বে দেখে নি। কল্পনায় পর্যন্ত ছিল না তার।

সুশীলা প্রসাদকে নিয়ে উকিল মহলে রসিকতাও আছে। উন্নত বক্ষা রমণী বুক চিতিয়ে সওয়াল করছেন, 'Your honour, I will now place my points,' তারপর প্রস্তুত হয়ে উন্নত ভঙ্গিতে বলেন, 'my first point is this, second point is this, and the third—' প্রতিপক্ষের কৌঁসুলী বলে উঠলেন, 'Stop there please, you can't show any third point; এ ব্যাপারে প্রকৃতি আপনাকে বঞ্চিত করেছেন।'

এ ধরনের বহু মন্তব্য উশ্রীকেও হয়তো শুনতে হবে। কিঞ্চিৎ আদিরসের মিশ্রণ না থাকলে নাকি উকিলের কৌতুক বা রসিকতা সম্পূর্ণ হয় না!

উশ্রী মুখে চকোলেট পুরেছে, সুশীলা প্রসাদ প্রশ্ন করেন, 'বয়েস কত তোমার?'

'চব্বিশ।' চকোলেটটা গাল বদল করে নিয়ে উশ্রী সহজ স্বরে উত্তর দেয়।

সুশীলা প্রসাদ বললেন,'পঞ্চাশ থেকে সত্তর, এই হলো উকিলের প্রকৃত জীবনকাল, তার আগে পর্যন্ত শুধু শিক্ষানবিশী। শিখতে অবশ্য আজীবনই হবে। তবু তোমার সামনে এখন অন্তত ছাব্বিশটা পরিষ্কার বছর। ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার বলেছেন, A lawyer shall be wedded to law alone and none else;' মৃদু রসিকতা করেন তিনি, 'জীবনের অর্ধাঙ্গ অথবা অর্ধাঙ্গিনী বলতে কেবল আইনই—অর্থাৎ আইন জ্ঞান আইন ধ্যান, আইন চিন্তামণি, বুঝলে?'

'হ্যাঁ।' উশ্রী সহাস্যে ঘাড় নাড়ে।

হেসে বললেন সুশীলা প্রসাদ, 'তবে যাও এবার কাজ কর, আর তোমায়

আটকাব না। কাজ যদি না থাকে তাহলে কোর্টগুলো ঘুরে ঘুরে দেখ, কি ভাবে সব চলছে। আইন আদালতের বহু ব্যাপারই কেতাবে লেখা থাকে না। এখানে বই পড়া জ্ঞানের চেয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেক বড়।' বিদায়ী করমর্দন করেন সুশীলা প্রসাদ।

১৫

বার অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের সামূহিক প্রবাহ ডিসট্রিকট্ জজের এজলাসের দিকে। সেই দলে উশ্রী, কিন্তু দলভুক্ত মানসিকতা নেই তার। উশ্রীর ঠিক সামনে দিয়েই হাঁটছে সুভাষ ঘোষ আর চিন্ময় ঘোষ, সিভিল কোর্টের মাণিক জোড় উকিল। এরা উশ্রীর চেয়ে বছর সাত সিনিয়ার। স্কুলে সহপাঠী, তারপর অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখানে এসে দেখা। একই দিনে।

বার লাইব্রেরিতে ফাইভ মাসকেটিয়ার্স নামে ছোট্ট যে দল তাতে কনিষ্ঠতম সভ্য এরা। বাকি তিনজন, সুরজিৎ সিংহ, ধীরেনগুপ্ত ও অকৃতদার প্রবীণ বৈদ্যনাথ ঘোষ। ধীরেন গুপ্ত অমায়িক এবং রসিক ব্যক্তি, সকলের সঙ্গেই সমান ব্যবহার।

কিন্তু সৌম্যদর্শন নাতিদীর্ঘ রায়বাহাদুর সুরজিৎ সিংহ অত্যন্ত রাশভারি। উকিল হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি সারা বিহার রাজ্য জুড়ে। হাকিমরাও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান ও সমীহ করেন। দুই পুত্র দুটি রাজ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি। অথচ ফাইভ মাসকেটিয়ার্স দলের অধিবেশনে তাঁকে চেনা যায় না। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। মুখভর্তি নীরব হাসির প্রবাহ সহ সুরুচিপূর্ণ রসিকতায় অদ্বিতীয়। ফাইভ মাসকেটিয়ার্স দলের একজন আজ প্রায় বিনা নোটিশেই চিরদিনের মতো দলত্যাগ করে গেলেন।

সুভাষ ঘোষ ও চিন্ময় ঘোষকে অনুসরণ করে উশ্রী জজ কোর্টে এলো। প্রাচীন আমলের সুপ্রশস্ত কক্ষ। সাধারণ মাপের প্রেক্ষাগারের সামিল। গোটা পঞ্চাশ চেয়ার ও তার পেছনে দু-সারি বেঞ্চি আগেই দখল হয়ে

গেছে। ওদিকটায় দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। মাঝখানে কাঠের রেলিং এ পারে হাত তুই উঁচু প্লাটফর্ম। প্লাটফর্মেই ভিড় জমছে এখন। উশ্রীও এসে সুভাষ ঘোষ ও চিন্ময় ঘোষের পাশে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়াল। ওরা তার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার।

কিছুক্ষণ পরে চিন্ময় ঘোষ বলল 'আপনি সামনে এগিয়ে যান না, ওখানে গেলে বসার জায়গা পেয়ে যাবেন।'

'ঠিকই তো আছি।' উশ্রী মৃত্ স্বরে জবাব দেয়।

চিন্ময় ঘোষ আবার বলে, 'কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন, এগিয়ে গেলে কিন্তু বসার জায়গা পেতেন।'

এবার সুভাষ ঘোষ বিরক্তিপূর্ণ চোখে চিন্ময় ঘোষের দিকে তাকায়, 'কথা না বাড়িয়ে তুমি বরং গিয়ে একটু জায়গা করে দাও, উনি সংকোচ বোধ করছেন।'

'না, আমার কোনো সংকোচ নেই, তবে এখানে খানিকটা ফাঁকার মধ্যেই ভালো।' সময়োচিত ক্ষীণ হাসি হেসে উশ্রী জবাব দেয়।

অভিজ্ঞ অভিব্যক্তির সঙ্গে চিন্ময় ঘোষ মন্তব্য করে, 'যে প্রফেশনে এসে-ছেন সেখানে ফাঁকা জায়গা কোথাও পাবেন না। শিক্ষিত আর অবসর-প্রাপ্ত বেতো রুগীদের পুরো ভিড়টাই তো এখানে। যার নেই কোনো গতি সে-ই করে ওকালতি। সরকারের বেকার তালিকায় কিন্তু উকিলদের ধরা হয় না!'

উশ্রী বলে, 'ভিড় তো শুনেছি চিরদিনই?'

চিন্ময় ঘোষ ঈষৎ দীর্ঘ, পাতলা ও পিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত মাথা নাড়ে, 'হুঁ, এ কথা স্যার তেগবাহাত্বর সপ্রুর পিতৃদেব বলেছিলেন, Bar is crowded no doubt, but position at the top remains always vacant, কিন্তু ক্রমশই বুঝবেন, এখন টপ্ বলতে এমন কিছু আর নেই, যে নাকে মুখে সাধনার গ্যাসমুখোশ এঁটে আপনি হিমালয়ান টপে তেনজিং নোরগের মতন গিয়ে বিজয়-কেতন পুঁতবেন। বার এখন নির্লজ্জ টপলেস বিকিনি পোশাক!'

বিতর্কের সুরে উশ্রী বলে, 'শুনেছি আপনি গেজেটেড অফিসার ছিলেন,

রিজাইন করে ওকালতিতে চলে এসেছেন ?'

সুভাষ ঘোষ মন্তব্য করে, 'পাগলা কুকুর কামড়ে ছিল বলে, মাথা ফাটিয়ে দেখতে পারেন ওর মগজে এখনো দাঁতের দাগ আছে।'

পরিস্থিতি ভুলে উশ্রী হেসে ফেলে, তারপরই অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল সে। হঠাৎ খানিকটা কান্না তার দুচোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম করে।

জজ সাহেবের ডায়াসের দিকে উশ্রীর নজর পড়ল। খান পঁচিশ চেয়ার সাজানো হয়েছে। পেশকার ও দুজন চাপরাশির উপস্থিতি ছাড়া মঞ্চ এখন খালি। এজলাসের দেওয়াল ঘড়িতে বারোটা বাজতে দু-মিনিট। সারা কক্ষটিতে পূর্ণ-নীরবতা। সুভাষ ঘোষ আর চিন্ময় ঘোষের মুখ বেদনাময় গাম্ভীর্যে থমথম করছে। এতক্ষণ ওরা পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এখন সরে রয়েছে। যেন অচেনা। কিংবা ওদের সমচিন্তার যোগসূত্র ছিঁড়ে গেছে। যে যার স্বতন্ত্র ভাব-ভাবনায় মগ্ন।

ঘড়িতে বারোটার আওয়াজ। জজ এজলাসের পেছনে যুগল চেম্বারের দুটি দরজা। একটি দরজার পর্দা ভেতর থেকে তুলে ধরল কেউ। জুডি-সিয়াল অফিসাররা একে একে এজলাসে প্রবেশ করেন। পদ মর্যাদানুযায়ী অগ্রাধিকারে। সর্বপ্রথম ডিসট্রিকট অ্যাণ্ড সেসনস জজ।

তারপর ফার্স্ট অ্যাডিশনাল। অনুরূপভাবে সাব জজের সারি। মুনসিফ-বর্গ। সর্বশেষ রেজিস্ট্রার সিভিল কোর্ট।

এগজিক্যুটিভ অফিসাররা কেউ নেই। ম্যাজিষ্ট্রেসি পূর্ণত অনুপস্থিত। কোর্টে আসার পর উশ্রী লক্ষ্য করেছে জুডিসিয়ারি আর এগজিক্যুটিভে চাপা বিরোধের সম্পর্ক। প্রতিষ্ঠিত উকিলরা ওদিক সম্পর্কে নিস্পৃহ। বার অ্যাণ্ড জুডিসিয়ারি, হেড অ্যাণ্ড টেল অফ জাস্টিস। ম্যাজিস্ট্রেটও বিচার করেন, ক্রিমিনাল প্রসিডিয়ার কোডে সে ক্ষমতা দেওয়া আছে। উকিলরা চান এ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন, ম্যাজিস্ট্রেসির এলাকা থেকে বিচার ক্ষমতা বিলোপ। এমনকি জামিন দেওয়ার অধিকারটুকুও!

উকিলরা দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, বেঞ্চের সভ্যবৃন্দ আসন গ্রহণ করার পর তাঁরা বসলেন। আগে থেকে যাঁরা জায়গার অভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন

তাঁরা একই অবস্থায় রয়েছেন,পরস্পরের গা ঘেঁষে একটি বিরাট কৃষ্ণকায় শোকমূর্তির মতো।

গতকাল ছুটি গেছে, উপরন্তু এখন বেলা বারোটা, কোর্ট কাছারির ব্যস্ততম মুহূর্ত, কিন্তু আদালত কক্ষে স্থির নিশ্চুপ মধ্যাহ্ন। সুরজিৎ সিংহ আদালতকে সম্বোধন করলেন, 'your honour, most respected District and Sessions Judge and respectable members of the judiciary, today we have assembled here with heavy hearts, to make reference of sad and sudden demise of Dhiren Gupta—মহামান্য আদালত, আজ আমরা সর্বজন শ্রদ্ধেয়, আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রাচীন সভ্য ধীরেন গুপ্ত মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুর বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ন্যায়ালয়ে সমবেত হয়েছি। ধীরেন গুপ্ত মহাশয়ের জন্ম—'

সৌম্য গম্ভীর মুখে রেফারেন্স শোনার পর জজ সাহেব উত্তর দিলেন, 'President of the Bar Association and other most respectable members ; Bench And Bar are the two means without whose cordial co-existence and healthy meeting real justice cannot be achieved. In fact we are nothing but a single unit in this noble profession responsible for best welfare of the country ; ধীরেন গুপ্তর আকস্মিক মৃত্যু শুধু আপনাদের একার শোক নয়, আমাদের পক্ষেও বিরাট দুঃসংবাদ ! বিধি জগতের পক্ষে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। কিন্তু প্রকৃতির কাছে এ ধরনের প্রহার আমাদের মাঝে মাঝে খেতেই হয়। আঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি নিজের অস্তিত্বের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। তবু—'

মৃতাত্মার সম্মান ও চিরশান্তি কামনার উদ্দেশ্যে জজ সাহেব এবং তাঁর অধঃস্তন অফিসারবর্গ মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। ডায়াসের নিচে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ, তাঁদের পেছনে সিমেণ্ট-বাঁধানো উঁচু প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আরও কয়েকজন উকিল।

সারা কক্ষটি কালো কোটে আকীর্ণ। বেঞ্চ আর বার-এর জাতিগত পার্থক্য ও ব্যবধান ঘুচে গেছে। উশ্রীর মনে হলো চোখের সুমুখে কৃষ্ণবর্ণ গিরিশ্রেণী দেখছে সে, যেখানে তার নিজেরও সমগোত্রে অবস্থান এবং সম-অধিকারযুক্ত অস্তিত্ব। এই শোক-পরিস্থিতিতেও তার স্তিমিত এবং অসহায় চেতনা সগর্ব পুলকে ভরে ওঠে। সারা শরীরে মৃদু শিহরণ ও রোমাঞ্চ জাগে।

নীরবতার কাল দু'মিনিট, তারপর জজ সাহেব ঘোষণা করলেন, 'আজ বেলা তিনটে থেকে আদালতের সব কাজ স্থগিত হবে; As a token of respect to the soul of the eminent jurist, প্রখ্যাত আইনবিদের আত্মার সম্মানার্থে।'

উশ্রীর চিন্তায় হঠাৎ একটি প্রসঙ্গ উদিত হয়, এ অনুপস্থিতি এতক্ষণ তার নজরে পড়ে নি। নতুন করে মোক্তার আর ভর্তি হয় না। আইনের ক্ষেত্র থেকে এই স্তরটি বিলুপ্ত হতে চলেছে, নবীনের প্রবাহ নেই। তবু এখনো প্রবীণতা ও প্রৌঢ়ত্বের মোড়ক দেওয়া জন পঞ্চাশ মোক্তার। সিভিল কোর্টের এলাকা পার হয়ে খাল-পরিমাপ নর্দমার ওপারে এগ-জিক্যুটিভ বিভাগের দিকে মোক্তার অ্যাসোসিয়েশনের বাড়ি। ক্রমশ ক্ষীয়মাণ সভা সংখ্যা পঞ্চাশের মতো। তাদের এলাকা ঐ; খুঁটি, য়্যু, নো স্যার? খুঁটি ইজ এ পীস অফ্ ব্যামবো ঠোকা থাকে ইন দ্য গ্রাউণ্ড! বুশ সার্ট পরা হাকিমরা প্রায় বাধ্য হয়ে সেই বহস্ তন্ময় চিত্তে শোনেন। এবং নিষেধাজ্ঞাজনিত আদেশাদিতে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই ডিক্রি হয়ে যায়। অন্তত মক্কেলরা এই রকমই বুঝে থাকে। সত্যিকার পরাজিতের মুখেও সাময়িক বিজয়ের হাসি!

তবু মাঝে মাঝে খাল পার হয়ে ও পাড়ার মোক্তার এ পাড়ার গাউন-পরা হাকিমের এজলাসে এসে গাউন-পরা উকিলের পাশে বসে ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ দেয়, 'বলুন না স্যার, আসামী সম্পূর্ণই নির্দোষ, পুলিশ ঘুষ খেয়ে—।' ধীরেন গুপ্তর কাছেও উশ্রী কোনো কোনো মোক্তারকে বিনামূল্যে পরামর্শ নিয়ে যেতে দেখেছে। 'আমার মক্কেল স্যার বড় গরীব, একেবারে হাতে খোলা, পাছায় মালা, তাই আর সঙ্গে আনি

াম কি হবে এনে ? কিন্তু স্যার, এই কেসটার সঙ্গে সিভিল ডিসপিউট নিনো। দখল দেখাবার জন্যে আমি অনেকগুলো রসিদ তৈরি করিছি, সব এক্স ল্যাণ্ডলর্ডের, তবে ঠিক জাল নয়।' ধীরেন গুপ্ত ধৈর্য ধরে ক্তারের কথা শুনেছেন, এবং সুপরামর্শ ই দিয়েছেন। আইনের সূত্র বলছেন।

খালের ওপারই শুধু, গোত্র ভিন্ন হলেও জাত প্রায় একই, কিন্তু ধীরেন গুপ্তর শোকসভায় একজন মোক্তারও উপস্থিত হয় নি। বলতে গেলে একই জীবিকা, তা সত্ত্বেও চোখের সুমুখে এতখানি বিদ্বেষ অথবা বিরোধিতা উশ্রীর কেমন অসহ্য মনে হয়। জজ সাহেব উল্লেখ করলেন বেঞ্চ আর বার। বেঞ্চ পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেসি, এবং বার-সম্প্রদায়ে মোক্তার শ্রেণী আসে না কি, ওরাও তো শাসন এবং বিচার যন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ? এখনকার শান্ত পবিত্র আবহাওয়া উশ্রীর কেমন যেন একটু দূষিত বোধ হতে লাগল। এই সমানাধিকারের যুগেও এ অন্যায় ব্যবধান কি চিরদিনই থেকে যাবে? এই অহেতুক বিচ্ছিন্নতা— !

'চলুন, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?' এজলাস ছেড়ে বাইরে যাবার মুখে চিন্ময় ঘোষ উশ্রীকে প্রশ্ন করে।

জজের মঞ্চ খালি, জজ সাহেব এবং তাঁর অধঃস্তন সহকর্মীবৃন্দ, ট্রেন অফ্ জাস্টিস, জজ সাহেবের চেম্বারে প্রস্থান করেছেন। যেমন সারিবদ্ধ হয়ে এসেছিলেন তেমনি শৃঙ্খলার সঙ্গে চলে গেলেন তাঁরা। প্রায় সব উকিলই এজলাস থেকে বেরিয়ে গেছেন। মাত্র কয়েকজন বসে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে জজ সাহেব যাঁদের জামিনের দরখাস্ত শুনবেন, আপিল মঞ্জুর এবং নিম্ন আদালতের নথিপত্র তলব করবেন।

চিন্ময় ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে উশ্রী শুধু বলল, 'না, চলুন।'

এজলাসের বাইরে এসে চিন্ময় ঘোষ প্রশ্ন করে, 'এই বোধ হয় আপনি প্রথম ডেথ্ রেফারেন্স শুনলেন?'

উশ্রী মৃদু গলায় উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ।'

বার লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে উশ্রীর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চিন্ময় ঘোষ কথা বলে চলে, 'বছরে গড়ে দশটি রেফারেন্স। দীর্ঘ পুজোর ছুটির পর

ছু-তিনটি তো অবধারিত। সাত বছর ধরে এই আমরা দেখে ছিন, তত বুড়ো আনন্দি ঝা বলে, ষাট বছরের ওপর যারা তাদের সব জুড়ে বর্ণ রেফারেন্স করে রিটায়ার করিয়ে দাও, তবে যদি ওকালতির য়দি বং একটু ফেরে। কিন্তু ধীরেনবাবুর আশি বছর বয়সটা বয়সই মনে মা বং। না। উনি চিরদিনই আমাদের সবার সমবয়সী রয়ে গেলেন। ওঁর রূপ ব্য বয়সের জড়তা আসে নি, অমন সুন্দর হাতের লেখা, ভরাট গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ, দুঃখ-খেদহীন মনোভাব— !'

উশ্রী বাধা দিয়ে বলে, 'তা জানি।' এইভাবে বক্তাকে নীরব করে দেয় সে।

১৬

উশ্রী ফিরে এসে সেনট্রাল হলে বসল। বার লাইব্রেরি এখন অনেক ফাঁকা। ধীরেন গুপ্ত যে চেয়ারে সাধারণত বসতেন, সেটিতে কেউ বসে নি। ডান পাশের চেয়ারে উশ্রী বসত, সেখানেই বসল সে। কিছুক্ষণ এখানে থেকে বাড়ি চলে যাবে, তারপর নতুন করে চিন্তা করতে হবে। পরেশ বসুকে অবশ্য আগে থেকেই বলা আছে। ভাস্করের বাল্যবন্ধু এনজিনিয়ার প্রণবের দাদা পরেশ। সেই সূত্রেই ভাস্করের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, তবে বয়েসগত ব্যবধান অন্তত পনেরো বছর। তাঁকে দাদা বলে ভাস্কর।

কোর্টে আসার পর উশ্রীর সঙ্গে পরেশ বসুর বিশেষ দেখা হয় নি। বার লাইব্রেরির বাইরে ঘর ভাড়া নিয়ে এখানেও তাঁর অফিস। মিউনিসি-প্যাল ব্লকের মাসিক আট টাকা ভাড়ার ঘর। দু'তিনজন জুনিয়ার। দু-জন মুহুরী।

সিভিল ক্রিমিনাল দুই-ই করেন পরেশ বসু। ফৌজদারীতে তিনি অ্যাসিসটেন্ট পাব্লিক প্রসিক্যুটার। আগে একটি টার্ম দেওয়ানীতে অ্যাসিসটেন্ট গভর্ণমেন্ট প্লিডার ছিলেন, নিজেই সে পদ ছেড়ে দিয়েছেন। সরকার পক্ষের উকিলের যা ফীজের বহর তাতে সাধু সাজার

নাম উপবাস। একটি কম মূল্যের মোকর্দমা বিশদিন চললে পড়তো দৈনিক পাঁচ আনা।

পরেশ বসু নিজেই অতি ব্যস্ত উকিল, সিভিল ক্রিমিনাল রেভিন্যু, সর্ব বিভাগে নিপুণ সব্যসাচী। সরকারি তকমা আঁটার প্রয়োজন তাঁর নেই। তবু মাঝে মাঝে ডিসট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট বা জজের উপরোধের ফলে প্রায় অবৈতনিক পদের ঢেঁকি গিলতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রীফ এলে, এনগেজড্ আদার-ওয়াইজ, মন্তব্য সমেত ফেরত পাঠান তিনি। চুপ করে বসে আছে উশ্রী, ফার্স্ট অ্যাডিশনাল জজের এজলাসে জয়-রাম দাস হনুমান দাসের ইনসলভেন্সি প্রসিডিং চলছে, কিন্তু মক্কেল আজ ডাকতে আসে নি। অন্যদিন ধীরেন গুপ্তর সঙ্গে তাকেও করজোড়ে ডেকে নিয়ে যেত। বার লাইব্রেরি থেকেই পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সুদীর্ঘ ঝুলের কালো গাউন গায়ে চড়িয়ে ধীরেন গুপ্তর পাশাপাশি এজ-লাস পর্যন্ত হেঁটে আসত সে, মনে হতো যেন প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। আজ উপলব্ধি হলো এই ক'মাসে এক পা-ও এগুতে পারে নি। প্রথম দিনের তুলনায় এখন তার অবস্থা আরও অসহায়। অধিক অনিশ্চিত। সেদিন সবারই তাকে ঘিরে একটা কৌতূহল ছিল, আজ তা নেই। এই মুহূর্ত থেকে সে অজস্র উকিলের ভিড়ে গা-সওয়া উপস্থিতি।

এতক্ষণ উশ্রীর ঠিক লক্ষ্য হয় নি, টেবিলের অপর পারে আরও খানি-কটা বাঁ দিক ঘেঁষে আনন্দি ঝা আনমনে বসে বিড়ি টানছেন। দারিদ্র-ক্লিষ্ট জীর্ণ শরীর, গালে দশ বারোদিন না-কামানো খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। পরণের পোশাক উকিল নামটাকে পর্যন্ত লজ্জা দেয়। অথচ ধীরেন গুপ্ত বলতেন, 'আনন্দি ঝা খুব সৎ আর বুদ্ধিমান উকিল, এ পেশা যা চায়; কিন্তু ও যে কেন দাঁড়াতে পারল না জানি না। তবে একটা কথা মনে রেখ, অবস্থার বিপর্যয়ে পড়ে নিজের গ্রেড্ কখনো কমাতে নেই। এখানে ওপরে ওঠার সিঁড়ির ধাপগুলো খুব দূরে দূরে, কিন্তু নামার ধাপ একটা আর একটার গায়ে সেঁটে রয়েছে।'

'কি রে বোকা মেয়েটা, মন খারাপ করে বসে আছিস?' আনন্দি ঝা

উঠে এসে উশ্রীর পাশের চেয়ারে বসলেন,'কি ভাবছিস বল তো, কালও যে তোর পাশে ছিল, সে আজ নেই !'

'না-আ-আ !' উশ্রী একটু টেনে বলে।

আনন্দি ঝা'র কণ্ঠস্বর বেদনার্ত,'কোহিমা না কোন্ রণাঙ্গনে মৃত সৈনিক-দের মুখপাত্রস্বরূপ এক স্মৃতিফলক আছে ;

When you go home
Tell them of us
And say,
For their to-morrow
We gave our to-day.

বোকা মেয়ে, এই হল্ ঘরের চারটে দেওয়ালে দেখ, কত অয়েল পেন-টিং কত লাইফ সাইজ ছবি। বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার ; সে যুগের ভকীল আর অ্যাডভোকেট। রাজবাহাদুর, রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, নাইট-স্যার ! রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যনারায়ণ সিংহ, ও. সি. মল্লিক, সাহেব ব্যারিস্টার ও ডোনেল আর স্যার ভিনসেন্ট। ভাগলপুর জজসীপের বিরাট ক্ষেত্রাধিকার, মুঙ্গের মালদা দার্জিলিং পর্যন্ত। মাথার ওপর Statutory High Court of Judicature at calcutta ; ভারতের অন্যতম প্রাচীন আর বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কলকাতা হাইকোর্ট; সেই আমলের কথা। কেউ আর এদের মনে রাখে নি। ছুটির দিনে ভেনটিলেটার গলে হনুমানের দল এসে ঐ সব ছবির মাথায় বসে মিটিং করে। ছবিগুলো একে একে দেওয়ালের গা থেকে খসে পড়ছে। তিন-কড়ি সোম লাইব্রেরিয়ানের যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখা দু-শ' বছরের রেকর্ড উই পোকা ধরে শেষ হয়ে গেছে।'

আনন্দি ঝা বিরতি দিতে উশ্রী সখেদে বলে, 'তাই তো, কত ছবি, কিন্তু কি অবস্থা !'

উত্তর দেয় আনন্দি ঝা, 'এই তো নিয়ম ! এখানে সবাই চায় আগের জেনারেশন শেষ হয়ে যাক, আমি একটু এগিয়ে যাই। শেষ হওয়া মানে তার নামের ইতিহাস পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। আমরা সবাই

ইতিহাস হতে চাই, তাই পূর্ববর্তী ইতিহাসের রেশটুকুও মুছে না যাওয়া অবধি স্বস্তি পাই না। ধীরেন গুপ্ত মারা গেছেন, যারা তাঁর পরের ধাপ তাদের অনেকেই রাতারাতি প্রচুর ফী বাড়িয়ে দিয়েছেন। Death is a peculiar chain system of progress ; জীবন নয় রে বোকা মেয়ে সহযাত্রীর মৃত্যুই সবাইকে সত্যিকার উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। কথা শেষে ঘন ও গভীর নিশ্বাস পড়ে তাঁর।

উত্তেজনার পরিসমাপ্তিতে আনন্দি ঝা একটা বিড়ি ধরালেন, 'তারপর বোকা মেয়ে, এবার কি করবি বলে ভাবচিস ?'

'কি করি বলুন তো ?' উশ্রী তাঁকেই প্রশ্ন করে।

'সংসার।' তখুনি জবাব দেন আনন্দি ঝা।

সত্য গোপন করা মৃদু হাসি হেসে উশ্রী জবাব দেয়, 'সংসার ? সে তো আমার আছেই !'

ঘাড় কাত করে উশ্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দি ঝা মাথা নাড়েন, 'না নেই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোর প্রকৃত সংসার এখনো হয় নি। তুই—।' আনন্দি ঝা অকস্মাৎ থেমে গেলেন। শুধু তাঁর ঘাড়টা অত্যন্ত ধীরে না-এর ভঙ্গিতে নড়তে লাগল।

'আমি কি এখান থেকে পালিয়ে যাব ?' অন্যমনস্ক গলায় উশ্রী এবার নিজের মনে বলে, যেন আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন সে।

১৭

তিন চারদিন কাছারি যায় নি উশ্রী। যদিও কালো কোট আর বাদুড়ের ডানার মতো সারা শরীর ঢাকা কালো গাউনের মোহ তার সম্পূর্ণ ঘুচে যায় নি, কিন্তু কার ভরসায় কাছারি গিয়ে ওগুলো ব্যবহার করবে সে ? বার লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে থাকা, সকাল এগারোটা থেকে মধ্যাহ্ন সাড়ে তিনটে পর্যন্ত তিন চার প্রস্থ চা এবং সর্ব-নীতি চর্চা, যা প্রায় শতকরা সত্তরজন উকিলের নৈমিত্তিক কর্মতালিকা, তা একা মেয়ে উকিল উশ্রীকে মানায় না। ঐ প্রতিষ্ঠানের সভ্যা হলেও দলের একজন সে

কোনোদিনই হতে পারবে না।

আজ সন্ধ্যেবেলা ভাস্কর আসবে। যদি হঠাৎ তার বিশেষ কোনো কাজ পড়ে যায়, হাতে মরণাপন্ন রুগী এসে যায় কেউ, তাহলে হয়তো আজ না এসে কাল কোনো সময় দু-চার ঘণ্টার জন্যে দর্শন দিয়ে যাবে। তবে সাধারণত শনিবারেই আসে সে। রবিবার বিকেলের দিকে ফেরে।

ভাগলপুর থেকে শ্রীপুর মোটর সাইকেলে পঁয়ত্রিশ মাইল। দেড় ঘণ্টার পথ। ইচ্ছে করলে রোজই যাওয়া আসা চলতে পারে, কিন্তু সে ইচ্ছে ভাস্করের কোনোদিনই হয় নি।

শ্রীপুরে ভাস্করের কোয়ার্টারে উশ্রী থেকেছে বিয়ের পর মাত্র ন'টা দিন। স্বামী নামে পরিচিত, দাম্পত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত, একজন পুরুষকে জানা এবং বোঝার পক্ষে এই কটা দিনই যথেষ্ট। তারপর উশ্রীর নিজেরই আর ইচ্ছে হয় নি যে ওখানকার কোয়ার্টারে থাকে। ফুলশয্যা হয়েছিল ভাগলপুরের বাড়িতে, সেই রাত থেকেই সে টের পেয়েছে ভাস্করের হাবাগবা চেহারার আড়ালে যে পুরুষ সত্তা তাতে প্রাক্তন নারী সংস্পর্শের স্মৃতি ও সুরভি মাখানো।

এদিক থেকে উশ্রীও সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়, তবে সে নিক্তি নিয়ে পরস্পরের দোষের পরিমাপ করতে বসে নি। কিন্তু ভাস্করের এক দোষ, সে নিজেকে গোপন করতে পারে না। অপরাধ করে ফেলা জিনিসটা খুব বড় নয়, ওটা যে কোনো মানুষেরই অতি স্বাভাবিক প্রবণতা, সত্যিকার দূষণীয় যা, তা অপরাধ গোপন করতে না পারা।

ভাস্কর নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে, তাতে তার প্রায়শ্চিত্ত কিছু হলো না, কিন্তু প্রথমাবধি উশ্রীর মনটা বিষিয়ে উঠল। আর একটা তিক্ত ও অসহায় উপলব্ধি, উশ্রীর নিজের এমন কোনো পুঁজি নেই, যা পেয়ে নূতনত্বের স্বাদস্বরূপ ভাস্কর কৃতার্থ বোধ করতে পারে। প্রাক্তন সম্পর্ক ও জীবন সম্বন্ধে ভাস্করের অকুণ্ঠ অনাবরণ স্বীকারোক্তিই উশ্রীর যৌবন-দাম্ভিকতা ও নারী-চেতনার প্রথম পরাজয়।

বিয়ের দু'মাস পরেই শ্রীপুর ব্লক থেকে ভাস্করের বদলির আদেশ হয়েছিল, নানা অছিলায় কিছুদিন সেটা এড়িয়ে রইল সে, তারপর চাকরিতে

ন্স রয়েছে, সজলতার ভারে
ইস্তফার দরখাস্ত লিখল একটা। শ্রীপুরে
জানালেন, 'এসো মা,
জমেছে, তাছাড়া অন্য কারণও থাকা সম্ভব, এবং
ব্বারে হঠাৎ চলে
ধারণা, মুখে যাই বলুক, অবন্তীর চিন্তা ভাস্কর ছাড়তে প।
তার সঙ্গে আগেকার যোগাযোগ মানাভিমানের পালা চু।
মনের
আরও জারিয়ে উঠেছে, বিশেষত উশ্রী যখন একা ভাগলপুরের বা।
থাকে, ল-কলেজে ক্লাস করতে যায়, আর ভাস্কর শ্রীপুরে।

তবু উশ্রী বাধা দেয় নি, শুধু একজন নির্লিপ্ত স্ত্রীর মতো বলেছিল, 'চাকরি ছেড়ে দেওয়া খুবই সহজ, পাওয়া কঠিন; দরখাস্তটা পাঠাবার আগে একবার ভেবে দেখো।'

ভাস্কর উত্তর দিয়েছে, 'ভাববার কি আছে? আমার বাবা অবশ্য ডাক্তার ছিলেন না। তাঁর কাজ ছিল বাপ্ পিতামহের জমানো টাকা ওড়ানো, তা তিনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই করেছিলেন। কিন্তু তার আগের দু'তিন পুরুষ ডাক্তার, তাঁরা কেউ চাকরি করেন নি! আমার বাবা যদি ডাক্তার হয়ে দশ ঘর রুগী ছেড়ে যেতেন আমিও চাকরির ঘানিতে না ঘুরে উত্তরাধিকার সূত্রে চালিয়ে নিতে পারতাম। হাতের কাজ জানা মিস্ত্রি আর ইনজেকশানের ছুঁচ ফুঁড়তে পারা ডাক্তারের উপোস করতে হয় না। আমার পসার তার চেয়ে বেশি। ভাবনা তাদেরই, যাদের কাগুজে বিদ্যেটাই একমাত্র সম্বল, তা সে যত দামী কাগজই হোক না কেন। যে কালির আঁচড়ে কেরাণী হয়, সেই কালির আঁচড়েই কমিশনার। ওখানে ভাগ্য ছাড়া গতি নেই।'

যার এতখানি আত্মপ্রত্যয় তাকে বাধা দেওয়া যায় না। উশ্রীও দেয় নি। তারপরও ভাস্কর বলেছে, 'জানো উশ্রী, হাসপাতালে বহু ডাক্তার কসাইএর অধম, দোষ তাদের নয় ঠিক, পরিবেশটাই এমনি। ওখানকার ব্যাপার স্যাপারে শরিক হতে আমার প্রায়ই বিবেকে বাধে। There we are not Life Savers, but Life Taker's. এমন সব হীন কাজ! স্বাধীনভাবে থেকে আর কিছু না হোক আমার মনের শান্তিটুকু বজায় হবে।'

এরপর আপত্তির ক্ষীণ জিকির তোলা দূরে থাক, পরিপূর্ণ সম্মতিই তাকে

দিয়েছে উশ্রী।
চাকরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাস্করকে ব্লকের কোয়ার্টারও ছেড়ে দিতে হয়েছে। শ্রীপুরে বাড়িভাড়া নিয়ে উঠে গেছে সে। বাড়িটা পছন্দসই হয় নি। বছর দুই-এর মধ্যেই সে নতুন বাড়ি তুলে ফেলেছে। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী নতুন তৈরি বাড়ি উশ্রী মুখোপাধ্যায়ের নামে, যদিও সেখানে তার মাত্র চার রাত্রির বাস। এখনো কিন্তু উশ্রীর জন্যে দুটো স্বতন্ত্র ঘরে চাবিতালা, যেদিন এবং যখন খুশি সে যেতে পারে, কিন্তু যায় না।

ধীরেন গুপ্তর মৃত্যু-সংবাদ ভাস্কর এখনো পায় নি; জানে না, যার ঐশ্বর্যে গরীয়সী হয়ে উশ্রীর কাছারি যাওয়া-আসা, সে মর্যাদা ও ভরসার খুঁটি পরলোকে স্থানান্তরিত। এ খবর পেয়েও অবশ্য ভাস্করের কোনো লাভ বা ক্ষতি নেই, কিন্তু উশ্রীর তাকে ভিন্ন কারণে প্রয়োজন। ভাস্কর এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে সে অ্যাডভোকেট পরেশ বসুর বাড়ি যাবে। তাঁর চেম্বারে ভর্তি হওয়ার উমেদারীতে। পরেশ বসু কথা দিয়ে রেখে-ছিলেন, কিন্তু সে প্রয়োজন এত তাড়াতাড়ি দেখা দেবে তা বোধহয় তিনি চিন্তা করেন নি। উশ্রীও না।
সেদিন কাছারি থেকে ফিরে সন্ধ্যে নাগাদ উশ্রী যথেষ্ট সংকোচ নিয়ে ধীরেন গুপ্তর বাড়ি একবার দেখা করতে গেল। সেখানে কারো সঙ্গেই তার পরিচয় নেই। উকীল ধীরেন গুপ্তর চেম্বারে গেছে, বাড়ির অন্দরে নয়। যে কোনো উকিলবাড়ির এক নিয়ম, বহির্মহলে আগত অতিথিকে পরিবারের কেউ সাধারণত গ্রাহ্য করে না। বহিরাগত ব্যক্তি সর্ব অর্থেই বহিরাগত।
তবু ধীরেন গুপ্তর স্ত্রীকে উশ্রী দু-একবার দেখেছে, সামান্য দু-একটা কথাও হয়েছে, কিন্তু তা ঠিক পরিচয় নয়। এটুকু পরিচয়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে এবং শোক জ্ঞাপন করতে খুবই অস্বস্তি লাগে। কিন্তু মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে না এলে একটা জবাবদিহি থেকে যায়। ওঁর বাড়ির লোকজনই বা কি ভাববে এতে!
ধীরেন গুপ্তের সদ্য বিধবা স্ত্রীর মুখাবয়ব থেকে শোকপ্রবাহের চিহ্ন

তখনো মুছে যায় নি, রক্তজবা চোখদুটি ফুলে রয়েছে, সজলতার ভারে মুখখানি টস্‌টসে, তবু বেশ সহজ সুরেই স্বাগত জানালেন, 'এসো মা, ঘরে এসো।' উশ্রী কাছে গিয়ে বসতে বললেন, 'একেবারে হঠাৎ চলে গেলেন!'

'আমিও ভাবতে পারি নি—।' কি যেন বলতে গেল উশ্রী, কিন্তু মনের মতো শেষ শব্দ না পেয়ে বাক্য অসম্পূর্ণ রইল।

নিজেকে সান্ত্বনা দেন ধীরেন গুপ্তের বিধবা স্ত্রী, 'এই ভালো মা, কোনো রোগ ভোগ করতে হয় নি। একদিনের জন্যেও তিনি কাউকে টের পেতে দেন নি যে বয়েস হয়েছে। চেহারা একটুখানি বদলে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর কুড়ি আর আশি বছর বয়সে সত্যিকার কোন তফাৎ ছিল না। আমার দুঃখ, ষাট বছরেব মধ্যে একটা দিনও তিনি আমায় সেবা করার সুযোগ দেন নি।'

উশ্রী এখানে নীবব।

তিনি আবার বললেন, 'মুন্সী তোমাব বাড়ি চেনে তো?'

'হ্যাঁ।' উশ্রী ঘাড় নাড়ে।

'ছেলেরা অবশ্য যাবে, সে আলাদা কথা। কাজ চুকলে আমিই তোমায় একদিন খবর পাঠাতুম। উনি তাঁর লাইব্রেবি, অফিসেব চেয়ার টেবিল সব তোমায় দিয়ে গেছেন, অনেক আগেই একথা আমায় বলে রেখে-ছিলেন।'

বিব্রত বোধ করে উশ্রী, 'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

'না মা, ব্যস্ত নই, তবে যা করতে হবে, তা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলা ভালো।' ভদ্রমহিলা ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন, 'কেউ কি কোনো ব্যাপাবে অপেক্ষা করতে চায়? আজ বিকেলেই একজন উকিল এসেছিল, কুড়ি হাজার টাকায় লাইব্রেরি কিনবে—তেরোটা আলমারি র‍্যাক চেয়ার টেবিল নিয়ে!'

'তাঁকেই নয়—।' উশ্রীর কথা অসমাপ্ত থেকে যায়।

'ছিঃ মা!' ভদ্রমহিলা ভর্ৎসনা করে ওঠেন; 'উনি কি আমায় কোনো দুঃখ বা অভাবে রেখে গেছেন? ওসব জিনিস তোমারই। তবে অফিসে যে

চেয়ারটায় বসতেন, বল যদি, ওটা আমার ঘরে এনে রাখব, আর কেউ তো ঐ চেয়ারে কখনো বসে নি।'

প্রাপ্তির সম্ভাবনার মুখে এতখানি অসহায়তা উশ্রী ইতিপূর্বে কখনো বোধ করে নি। সে প্রায় চোরের দ্বিধা নিয়ে বলল, 'আমি এত জিনিসপত্র নিয়ে কি করব, আমায় শুধু খানকয়েক বই দেবেন।'

ভদ্রমহিলা ঘাড় নাড়েন, 'তা হয় না মা, শুধু ঐ চেয়ার ছাড়া বাকি সবই তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।'

'আপনার ছেলেদের মত্— ?' উশ্রী প্রশ্ন তুলতে যায়।

মধ্যপথে উশ্রীকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা বলেন, 'তারা তো পারলে এখুনি পাঠায়। বাপ বিষয়-সম্পত্তি কি রেখে গেছেন সে খোঁজ কেউ চায় নি, কোথাও কোনো ঋণ আছে কিনা তাই আমায় জিজ্ঞেস করছে। তাঁরই ছেলে তো! কিছু খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ওরা ঠিক করল, কালই বার লাইব্রেরিতে গিয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত আগাম চাঁদা দিয়ে আসবে, উনি তো বলেছিলেন ডিসেম্বর পর্যন্ত ওকালতি করবেন!'

'আমাকেও তাই বলতেন।' এতক্ষণে উশ্রী একটা সত্যিকার কথা বলার অবসর পায়।

অতীব শোক ও দুঃখের মধ্যেও ভদ্রমহিলা একবার ফিক্ করে মৃদু হাসি হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, 'কথাবার্তা তো বাড়িতে তিনি খুবই কম বলতেন, তাও শুধু কাজের কথা। তবু তুমি ওকালতিতে আসার পর আমায় একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, উশ্রী-তো মেয়েদের জন্যে রাস্তা খুলে দিয়েছে। বিয়ের আগে তুমি দু-এক মাস বেথুন কলেজে পড়েছিলে, এবার আস্তে আস্তে আই. এ., বি. এ. ল. পাস কর, তোমায় আমার জুনিয়র করে নেব, খুব শিগগির দাঁড়িয়ে যাবে। পঞ্চান্ন বছর ধরে উকিলের গিন্নি, যত জজ আসে প্রায় সবারই বয়স তোমার অভিজ্ঞতার চেয়ে কম।'

এক মুহূর্তের বিরতির পর তিনি প্রশ্ন করেন, 'ললিতমোহন ঘোষকে চিনতে ?'

'দেখেছি তাঁকে।' উশ্রী ঘাড় নেড়ে বলে।

ধীরেন গুপ্তর বিধবা স্ত্রী কৌতুকময় মৃদু হাসি হেসে বলেন, 'তাঁর আইনের

ব্যাখ্যায় একটু বিরোধ দেখালেই তিনি জজকে বলতেন, I started practice atleast one decade before your honour was born ; আমার ওকালতির বয়েস মহাশয়ের বয়সের চেয়ে অন্তত এক দশক বেশি।'

বৃদ্ধার পরিষ্কার এবং প্রত্যয়পূর্ণ ইংরেজি উচ্চারণ শুনে উশ্রী অবাক, বলে ফেলে, 'আপনি তো কলেজে পড়তেন ?'

ভদ্রমহিলা উত্তর দেন, 'শুধু ভর্তি হয়েছিলাম। বিয়ের সময় আমার উনিশ আর ওঁর চব্বিশ, সেই বছরই ওকালতি আরম্ভ। তখনকার গাউন শেষ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করেছিলেন। আমার জন্যে রইল ঐ গাউন আর তোমার দেওয়া চেয়ার। মাঝে একবার মাস আটেকের জন্যে মুন্সিফ হয়ে দ্বারভাঙ্গায় গিয়েছিলেন। উনি আর রায়বাহাদুর সুরজিৎবাবু, তখন তাঁদের তিরিশ একত্রিশ করে বয়স। দুজনেই পালিয়ে এলেন, বললেন, হাকিমের চাকরি না গলায় ফাঁসি। দু'জনে খুব বন্ধুত্ব, তবে সুরজিৎবাবু সরকারের পক্ষে কাজ করতে ভালবাসতেন, আর উনি চির-দিনই বিপক্ষে, সেই অ্যানারকিস্ট আমল থেকে, তখন ফৌজদারীতেও যেতেন।'

ধীরেন গুপ্তর স্ত্রীর কাছে আরও কিছুক্ষণ রইল উশ্রী, ভদ্রমহিলার শোক এবং স্মৃতি মেশানো কথাগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগছিল তার। সাধারণ সব কথাবার্তা, অথচ অপরিসীম আন্তরিকতার সঙ্গে বলার দরুণ প্রতিটি কথা যেন অপূর্ব ভাবে মহিমান্বিত। সে সময় উশ্রীর হঠাৎ মনে হচ্ছিল, সে নিজে কি জীবনে ভাস্করের সম্বন্ধে অতখানি মরমী হয়ে উঠতে পারবে ? না, এ ভাব অবন্তী তার সঙ্গে খানিকটা ভাগ করে নিয়েছে, এবং আজও সে ঐ পুঁজি আগলে রয়েছে।

উশ্রী বাড়ি ফিরল। রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে, ভাস্কর এখনো শ্রীপুর থেকে এসে পৌঁছয় নি। উশ্রীর মনে হয়, আজ আর সে আসবে না, এলে আগামীকাল রবিবার সকালে। এবং মাত্র দু-চার ঘণ্টার জন্যে। এখন বিবাহিত জীবনের পঞ্চম বছর, কিন্তু প্রথমাবধি এমনিই কাটছে। ভাস্করের স্বল্প সময়ের জন্যে আসা-যাওয়া তার মনে বিপরীত বোধ আনে

না, বা দৃষ্টিতে অন্যায় অথবা অস্বাভাবিক ঠেকে না। তা এতই অভ্যস্ত! বরং সে বাড়ি এসে বেশিক্ষণ থেকে গেলে উশ্রীরই তাকে অবাঞ্ছিত মনে হয়। তার দর্শন পর্যন্ত অস্বস্তি জাগিয়ে তোলে!

১৮

এইটুকু আপ্যায়ন; 'এসো ভাস্কর, অনেকদিন তোমায় দেখিনি, ভালো আছ তো?' তারপরই পরেশ বসু উশ্রীর দিকে তাকালেন, 'এমন দিনে তুমি আমার অফিসে এলে যেদিন আমার নিজেরই হাতে ভিক্ষের ঝুলি। আমি তো রবি ঠাকুরের কবিতার অনাথ পিণ্ডদের মতন বলতে পারি না, ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা!'

পরেশ বসুর ক্ষোভের কারণ উশ্রী উপলব্ধি করতে পারে না, নিজেকেই যেন তার অপরাধী মনে হতে থাকে, অন্যায়বোধ জড়িত কম্পিত চোখের দৃষ্টি সে অন্যত্র ঘুরিয়ে নেয়, কিছু একটা বলা প্রয়োজন, কিন্তু কি বলবে, কোথা থেকে কথা আরম্ভ করবে, তাও ভেবে পায় না।

বিব্রত স্বরে ভাস্কর প্রশ্ন করে, 'কি হয়েছে আপনার পরেশদা?' বলার পর সে অফিস ঘরের চতুর্দিকে আর একবার ভালো করে তাকায়। তার-পর দরজার বাইরে চোখ ফেলে ওদিকের বারান্দায়।

ঘর ভর্তি মক্কেল, বারান্দার অবস্থাও তথৈবচ। প্রত্যেকের মুখে উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা। ঘরে ইতস্তত ছড়ানো নথিপত্র ও বই-এর স্তূপ। ঘর সম্পূর্ণ অগোছাল। দেওয়ালের ওপরদিকে চারটি কোনোই মাকড়শার জাল ছেয়ে রয়েছে। বলতে ইচ্ছে হয় অলক্ষ্মীর বাসা!

ঘরের চেহারা অধিকারীর ছন্নছাড়া স্বভাবের পরিচয়স্বরূপ যেন, অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে উশ্রী অথবা ভাস্করের বিশেষ কিছু জানা নেই। দেওয়ালের গায়ে হুকে ঝোলানো কালো কোট আর গাউন। কোটের পিঠ আর হাতায় ঘামের-নুন জমে সাদা হয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, যদিও কোটটা ছিঁড়ে এসেছে, কিন্তু তৈরি হওয়ার পর আর জল সাবানের স্পর্শ পায় নি। ঠিক তারই পাশে একটি সম্পূর্ণ অবয়ব মুসলমান ফকিরের মতো

কালো গাউনটা লম্ববান হয়ে রয়েছে।

'পরশু বিকেলে যখন ডিসট্রিকট্ ম্যাজিসট্রেট আদর করে ফোন করলেন, তখুনি বুঝলাম এক মাসের জন্যে আমার বারোটা বেজে গেল। আজ রবি, মঙ্গলবার থেকে বিক্রমাদেবী এম. এল. সি.-র হ্যাজব্যাণ্ড মার্ডার কেস খুলবে, থার্ড অ্যাডিশনাল জজ বি. কে. গুপ্তার কোর্টে। প্রধান আসামী বিক্রমাদেবী স্বয়ং, তাছাড়া আছে আরও ন'টা। ষড়যন্ত্রের ব্যাপার তো! পি পি সাহেব জজ কোর্টে বেল ম্যাটারের ফাইল আর আগুন লাগানোর ছোট সেসনস্ কেস নিয়ে বসে থেকে ল্যাজ নাড়াবেন, আর আমার ঘাড়ে নামিয়ে দিলেন সিন্ধুবাদের ভূত, ঐ সি. আই. ডি. কনট্রোলড কেস। যাতে আছে সাতচল্লিশটা সরকারি সাক্ষী, তিনটে অ্যাপ্রুভার, তার ওপর ডিফেন্স সাক্ষী কোন্ না একডজন? ভোর ছ'টা থেকে রাত বারোটা; ফী দৈনিক বিশ টাকা। এদিকে তোমার বৌদির প্রাত্যহিক পান দোষের ব্যয়ও তাই। বিশ টাকা। আমার চব্বিশঘণ্টার মজুরী ওঁর ঠোঁট রাঙানোতে বেরিয়ে যাবে, তারপর সংসারের বাকি চাকাগুলো ঘুরবে কিসের জোরে?' হাতের সিগারেটে গোটাকয়েক মোক্ষম টান দিয়ে পরেশ বসু জিজ্ঞাসু চোখে ভাস্করের দিকে তাকিয়ে থেকে কথা শেষ করেন।

ভাস্কর প্রশ্ন করে বসে, 'আজকালকার দিনে ঐ ক'টা টাকায় সরকারি উকিলের চলে কী করে?'

ব্যঙ্গসিক্ত গলায় পরেশ বসু উত্তর দেন, 'উনবিংশ শতাব্দীতে স্কেল বেঁধে ছিলেন দয়াময়ী ভারতেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া, তারপর সে যুগ পালটে রসাতলে গেছে, কিন্তু মহারাণীর শিলালিপির আখর বদলায় নি। তাই সরকারি উকিলদের অনেককেই একসঙ্গে তিনটে ফী নিতে হয়; সরকারের কাছ থেকে, যার বাড়িতে খুন-ডাকাতি হয়েছে তার কাছ থেকে আর আসামীর কাছ থেকে তো বটেই!'

হাতের পোড়া সিগারেট ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরেশ বসু সিগারেটের প্যাকেটটা ভাস্করের দিকে ঠেলে দিলেন, 'নাও ধরাও, আমাকেও আর একটা দিও।' তারপর উপস্থিত সমস্ত মক্কেলদের উদ্দেশ্যে

তাকিয়ে বললেন, 'এ শালারা আমায় জ্যান্ত গোরে না ঠেলে ছাড়বে না। অথচ ওকালতির প্রথম এগারোটা বছর আমার এমন কালসময় গেছে যে ভয়ে টেবিলের ওপর একটা মাছি পর্যন্ত এসে বসত না, I became so much known and famous as a killing lawyer; মাছিমারা উকিল। যে যাত্রী ট্রেনে মোটঘাট না নিয়ে চড়ে তাকে সবাই চোর বলে ভাবে। ব্রীফলেস উকিলের অবস্থাও তথৈবচ।'

সিগারেটে টান দিতে লাগলেন পরেশ বসু, সেই অবসরে এতক্ষণে উশ্রীর দিকে ভালো করে তাকালেন তিনি; 'দেখ উশ্রী, তুমি আমাদের ভাস্করের বউ, তাই তুমি বলেই কথা বলছি। কিন্তু আমার এত সময় নেই যে বসে বসে তোমায় আইনের এ.বি. শেখাব। তাছাড়া বিবাহিতা মেয়েদের পেছনে সময় দেওয়াটা আমি মূল্যবান সময়ের অপব্যয় বলে মনে করি। উপরন্তু দেখছ তো, রাত ন'টা বেজে গেছে এখনো অবধি শালাদের নড়ার নাম নেই। আমি যদি উঠে বাথরুমে যাই এরা পিছু নেবে। বাড়ির মধ্যে গিয়ে বৌএর সঙ্গে দুটো সোহাগের কথা বলি সেখানেও সব আমার চুমু পাবার জন্যে গাল বাড়াতে যাবে। ধীরেন গুপ্ত এমন অসময়ে টাঁসলেন যে ভাবতেই পারি নি এত তাড়াতাড়ি তুমি আমার ঘাড়ে এসে পড়তে পার। যাহোক, এসেছ যখন, ওয়েলকাম, সেই সুবাদে এই পত্নীস্থ ভ্রাতাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটু রিল্যাক্স করে নিচ্ছি।'

নিরাশাপূর্ণ ক্ষীণ স্বরে ভাস্কর বলল, 'আমরা তাহলে উঠি পরেশদা আপনার কাজের ক্ষতি হচ্ছে?'

পরেশ বসু হাতের ইসারায় বাধা দিলেন, 'নোঃ। ধীরেন গুপ্ত গেলেন, রায়বাহাদুর সুরজিৎও টু-ডে অর টু-মরো, আর নয়তো এবার রিটায়ার করবেন। সিভিল সাইডে রইলেন কে? নীরজদার স্বাস্থ্য ভালো না— অবস্থা এনি ডে গোছের। তারপর ফটিক মুখুজ্যে আর তারা সেন— দেখা যাক্। ওরা খাটছে তো খুবই! ক্রিমিনাল সাইড্ তো প্রায় ফর্সা, একমেব দ্বিতীয়ম বিনয় রায়।'

উশ্রী মাঝখানে বলে, 'বিনয়বাবু তো খুবই ব্যস্ত উকিল, নামও খুব?'

পরেশ বসু উত্তর দেন, 'বড় উকিলের ছেলে বড় উকিল হয় না, বিনয় রায় ব্যতিক্রম। ওর বাবা রায়বাহাদুর সুধাংশু রায় বিখ্যাত পাবলিক প্রসিকুটার ছিলেন। অ্যানারকিস্ট আমলে ইস্তফা দিয়ে ডিফেন্সে কাজ আরম্ভ করেন। বিনয় রায় কিন্তু বাপের জুনিয়ারি করে নি। কাজ শিখেছিল মোক্তার অনন্ত দ্যুবের কাছে।' পরেশ বসু কপালে হাত ঠেকালেন, 'অনন্ত দ্যুবেকে আমি আজও মনে প্রাণে প্রণাম করি, অমন সৎ আর আইনজ্ঞ মানুষ উকিলদের মধ্যেও খুব কম দেখেছি। যা বলছিলাম, বিনয় রায়ই ফোজদারীর শেষ গৌরবময় উকিল, তারপর, Lawyer Lawyer every where, but none to rely ; সর্বত্র উকিলের ভিড়, কিন্তু আস্থা রাখা যায়, তেমন কেউ আর রইবে না। এ ভরসা কেউ ফাঁসির আসামীকে দিতে পারবে না, দুর্গা বলে দড়িতে ঝুলে পড়, আপিলে খালাস করিয়ে নেব! ওকালতিতে মগজ বল, আর মেহনত বল, ওসব ফুঃ, সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী মা তারা। তিনি সদয় হলে তোমার গাড়ি বাড়ি, নচেৎ ঘাড়ে ঝুলি হাতে খঞ্জনী। 'কি উশ্রী, এখানে আসার আগে জ্যোতিষীকে কুষ্ঠি দেখিয়েছ তো ভাই?'

উশ্রী ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ এবং না অর্থেই ; মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি।

পরেশ বসু বলেন, 'দেখ একটা কথা বলি তোমায়, উকিল দু-জাতের। জাত জুনিয়ার, আর জাত সিনিয়ার। জাত জুনিয়ার, সিনিয়ারের পেছনে ল্যাংবোটের মতন ঘোরে, তারপর গাধাবোট ডুবলে সেও সাফ্। তুমি যদি জাত সিনিয়ার হতে চাও আমার চেম্বারে থাকো, তোমায় আমি ছোটখাট কেস দিয়ে তৈরি করে নেব। তাতে কাজ শিখবে, ফিল্ড তৈরি হবে। দরকার হলে আমি বা আমার অন্য জুনিয়াররা তোমায় সাহায্য করে দেব।'

'আমি, আমি কি পার?' দ্বিধাজড়িত স্বরে উশ্রী প্রশ্ন করে।

পরেশ বসু বরাভয় মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন, ভরসা দেন, ঠেকতে ঠেকতে শিখবে। নাপিত ভায়া কি নিজের মাথা মুড়িয়ে উত্তম-ছাঁট দিতে শেখে? I shall supply you heads ; মাথার যোগান আমিই তোমায় দিয়ে যাব—দেওয়ানী আর ফৌজদারী দুই-ই। তবে কিছুদিন

পরে যে কোনো একটা দিক বেছে নিও, আমার মতন হাসপাতালের আউটডোর ডাক্তার হয়ে থেক না। কোথায় যোগেনবাবু ?'

'এই যে স্যার।' যোগেন মুহুরী সামনে এসে দাঁড়াল।

পরেশ বসু তীক্ষ্ণ চোখে তাকান, 'কি হাঁপের টান ধরেছিল নাকি, মুখ নীল হয়ে রয়েছে ? দেখছি এবার আপনি মরে ফর্সা হবেন ! হ্যাঁ শুনুন, সেকেণ্ড মুন্সিফ কোর্টে কাল যে স্মল কজ স্যুট খুলবে সেটা উশ্রীকে দিন, আপনি একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। প্রথমেই ফৌজদারী দিলাম না, মক্কেলকে জেলে পাঠিয়ে বদনাম কিনবে। দেওয়ানীর ঘা যে পারার ঘা, তা তো জানে না, একবার ধরলে বংশ পরম্পরায় চলবে।' তারপর মক্কেলের দিকে তাকালেন তিনি, 'ওহে রঘুবীর প্রসাদ, তোমায় মেয়ে উকিল দিলাম, দু-তিনশ' টাকার ডিক্রি হয়ে গেলেও দুঃখ থাকবে না, মেমসাহেবের মুখ দেখে পুত্তুর শোকও ভুলতে পারবে। তোমরা এবার যেতে পার ভাস্কর, বুঝতে পারছি অন্দরমহলে পত্নী বিরহজর্জর হচ্ছে।'

ব্রীফ হাতে নিয়ে উশ্রী উঠে পড়ল।

সেই সঙ্গে ভাস্কর।

১৯

ঠিক এই অবসরে পরেশ বসু হঠাৎ এজলাসে এসে ঢুকলেন। কাঠগড়ায় সাক্ষী, বাদী স্বয়ং, নিচে উশ্রী দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, কিন্তু তার অসহায় গলদঘর্ম অবস্থা। কলম হাতে চুপ করে বসে আছেন মুন্সিফ, উশ্রী জেরার প্রশ্ন হারিয়ে ফেলেছে, তাকে প্রশ্ন রচনার সুযোগ দিচ্ছেন। উশ্রীর কানের কাছে যোগেন্দ্র মুহুরী ফিস্ ফিস্ করে কি পরামর্শ দিচ্ছে যেন। সাক্ষীর মুখে আত্মপ্রশংসার মৃদু হাসি।

পরেশ বসু এক নজরে অবস্থার জরিপ নিলেন, তারপর হাকিমের কাছে প্রার্থনা করলেন, 'স্যার, এজাহারটা একবার দেখতে পারি ?'

'ওঃ, সার্টেন্‌লি !'

এজাহার পড়ে পরেশ বসুর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। মূল সাক্ষ্যে যা বাদ পড়ে

গেছে তাই জেরায় টেনে এনেছে উশ্রী। সবিশেষ ড্যামেজিং! তবু চেষ্টা করা প্রয়োজন, আরও কিছু প্রশ্নের পর যদি শোধরানো যায়।

সবিনয়ে আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন পরেশ বসু, 'আমি কি আমার জুনিয়ারের বদলে সাক্ষীকে জেরা করতে পারি স্যার; যদি দয়া করে অনুমতি দেন?'

'বেশ তো!' মুন্সিফ অনুমতি দিলেন।

কয়েকটি প্রশ্নের পরই সাক্ষী বিপন্ন মুখভঙ্গি করে বলে, 'আপনি অত ঘুরিয়ে জেরা করছেন কেন উকিলবাবু?'

পরেশ বসু নিচু গলায় প্রায়-স্বগত ব্যঙ্গোক্তি করেন, 'না, ঘুরিয়ে প্রশ্ন করবে না, কোলে বসিয়ে দু-গালে প্রেম চুম্বন দেবে!'

তারপর গোটা দশ প্রশ্ন, সাক্ষী ভেঙে পড়েছে, সর্বশেষে একটি সাজেশন দিয়ে পরেশ বসু তাকে অব্যাহতি দিলেন।

That is all your honour; আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। দেড়টা বাজে, হাকিম চেম্বারে চলে গেলেন, 'আবার কাল শোনা যাবে, further tomorrow.'

পরেশ বসুও চেম্বারের দিকে চললেন, কোর্ট কম্পাউণ্ডে তাঁর নিজস্ব অফিস। সঙ্গে উশ্রী। চেম্বারে গিয়ে পৌঁছনোর মিনিট খানেকের মধ্যে কয়েক পেয়ালা চা-এর আবির্ভাব। উশ্রীর দিকে এক পেয়ালা এগিয়ে দিলেন পরেশ বসু। বাকি যারা, নিজেরাই টেনে নিল।

'শালা, কাছারি তো নয়, পাপের ডিপো; দু-নম্বরের চা!' পেয়ালায় ছোট একটা চুমুক দিয়ে পরেশ বসু মন্তব্য করলেন, 'রঘুবীর প্রসাদটা গেল কোথায়, উশ্রীর ফীজ দিয়েছে?'

'আসছে এখুনি।' মুহুরী যোগেন্দ্র বলে।

'পনেরোর বেশি নিও না, প্রথম থেকে চড়া দর হাঁকলে ভবিষ্যতে বাজার জমতে দেরি হবে।' পরেশ বসু উশ্রীর দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন, তারপর সেই দু-নম্বরের চা পরম তৃপ্তির সঙ্গে চুমুক দিতে দিতে উপদেশের ভঙ্গিতে কথা আরম্ভ করেন, 'শোনো উশ্রী, অ্যাণ্ড মাই আদার কোলি-গস্, সাক্ষীকে জেরার সময় একটা কথা মনে রাখবে, কি প্রশ্ন করবার

চেয়ে, কি জিজ্ঞেস করবে না। সাক্ষীর জেরার ব্যাপারে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, এ মাতুলালয়-থিয়োরী চলে না। উত্তর ক্ষতি-কারক আসতে পারে, এমন সন্দেহের জায়গায় প্রশ্নই বাদ দিও। কোনো রিস্ক নিতে হলে পরের সেভিং কোশচেন আগে থেকে স্থির করে রাখবে। ···এই যে রঘুবীর প্রসাদ, গরীবের দান দক্ষিণা কোথায়, দিচ্ছ, না বাজারেই পকেটমারি হয়ে গেছে? আগে তোমার উকিল সাহেবাকে দাও, পনেরো টাকা।'

ইতিমধ্যে বিপিন তেওয়ারী নামের একজন জুনিয়ার উকিল কক্ষে প্রবেশ করে পরেশ বসুর উদ্দেশ্যে সোৎসাহে বলে, 'এ হুজুর, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ডি কিস্কুর কোর্টে আমার ঐ মারপিটের মোকর্দমায় রায় হয়েছে, তিনজনের দু-জন রেহাই, একটা ছ-মাসের মেয়াদে বাঁধা পড়েছে। আপনি নেহাত আমায় জোর করে এগিয়ে দিয়েছিলেন, তাই ইণ্ডিপেন-ডেন্টলি একটা কাজ করার সুযোগ পেলুম।'

শুনে পরেশ বসু বললেন, সাবাস্ জোয়ান! যেটা বাঁধা পড়েছে আপিলে ছাড়া পাবে। এসো, একবার হ্যাণ্ডসেক কর, তারপর চা খাও। আমি চাই আমার প্রত্যেক জুনিয়ার এক একজন জায়ান্ট হবে। মাদী উকিল আমি পছন্দ করি না। তারপর উশ্রীর দিকে চোখ পড়তে বললেন, মাদী মানে মেয়ে নয়—কপোতহৃদয় মানুষ। বুঝলে তেওয়ারী, এরপর থেকে তুমি শেখপুরা এলাকার পীর পয়গম্বর হয়ে যাবে। কাজই নতুন কাজ আনবে। কাজের অভাব থাকবে না। নাও, এখন একটা সিগারেট খাও।'

রঘুবীর প্রসাদ গেঁজে খুলে পনেরোটি টাকা উশ্রীর দিকে বাড়িয়ে দেয়। সংকুচিত হাতে উশ্রী টাকা নিল। বাদীকে জেরা করতে গিয়ে সে যে নিজের তরফের সারা মোকর্দমাটাই ডোবাতে বসেছিল, এ কথা ভাবলে ফী নিতে হাত এগোয় না। একটা ক্ষতিকারক জবাবের কাটান দেবার জন্যে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করেছে, এবং নিজের হাতে তৈরি বিপদের জালে ক্রমশই জড়িয়ে পড়েছে। তারপর যখন সে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে যোগেন্দ্র মুহুরীর কোনো পরামর্শ কানে যাচ্ছে না আর, ঠিক সেই মুহূর্তে পরেশ বসু এসে পড়ে উদ্ধার না করলে এখন আর মুখ দেখাবার উপায়

থাকত না।

'আপনার ফীস্ হুজুর।' হাতে কয়েকটি নোট ; একান্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে রঘুবীর প্রসাদ পরেশ বসুর দিকে বাড়িয়ে দেয়।

'কত আছে ?' পরেশ বসু ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

'আপনার যা হুজুর, একশ' দশ।'

'থাক্,ওটা এখন তোমার কাছেই রাখো,আমার ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম, আমি মরলে গরীব বিধবাকে সুদ সমেত দিয়ে এসো। এক টাকা খরচ করে শখের বাজার থেকে রোগ কিনে এনেছ, তার জন্যে আর একশ' টাকার দাওয়াই করতে যেও না।'

মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝে উশ্রী লজ্জায় মাথা ঝুঁকিয়ে নিল, মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে তার, পরেশ বসু নিজে, এবং তাঁর অপর দু'জন জুনিয়ার এবং মুহুরী যোগেন্দ্র কিন্তু নির্বিকার। দাঁত বার করে খুশির হাসি হাসছে রঘুবীর প্রসাদ।

চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন পরেশ বসু, প্যাকেটটা জুনিয়ারদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'শালার চা তো নয়, একটুও প্রাণ নেই, যেন মৃতদেহের নিষ্প্রাণ গুপ্তাঙ্গ দোহন করে এনেছে! খেয়ে জুৎ হলো না, এখুনি আবার কে. বি. প্রসাদের কোর্টে গিয়ে মর্টগেজ স্যুটের আর্গু-মেন্টে দু'ঘণ্টা ধরে ক্যাচর ক্যাচর করতে হবে, আজ শেষ না করলেই নয়। কাল থেকে তো বিক্রমাদেবীর মার্ডার কেস, আর আমার এক-মাসের কালা-পানি, দৈনিক বিশ টাকায় সরকারের গোলামী, সূর্য চন্দ্রের মুখ দেখতে পাবো না। বাড়িতে বউ বিধবা হলে সে খবরও আমার কানে আসবে না! আরও দু' চার কাপ চা দিয়ে যেতে বলুন তো মুন্সীজী।'

আবার চায়ের পেয়ালা ধরলেন পরেশ বসু, এবং তাঁর সঙ্গে সবাই, মুহুরী যোগেন্দ্র পর্যন্ত।

চায়ের পেয়ালায় সতৃপ্তি চুমুক দিয়ে পরেশ বসু বলেন, 'শোনো উশ্রী, অধিকাংশ দেওয়ানী মোকর্দমা কাগজপত্রের জোরের ওপরই নির্ভর করে, ঐ স্লানডার-ডিফারমেশন ইত্যাদি বাদ দিয়ে। দেওয়ানীতে সাক্ষীদের মৌখিক এজাহারের বিশেষ মূল্য নেই। দেওয়ানী আদালত রায় দেয়

কাগজের ওপরই নির্ভর করে। যা কাগজপত্র তোমার সামনে আসবে সব খুঁটিয়ে পড়বে। কাগজের লেখা একশটা চোখে-দেখা সাক্ষীর সাক্ষ্যের চেয়ে বড়। Witnesses may lie, but papers may not ; পরেশ বসু হাসলেন, 'সে গল্প শুনেছ তো, ফৌজদারীর উকিলরা যা নিয়ে দেওয়ানীকে ঠাট্টা করে ?'

'কোন্ গল্প ?' পরেশ বসুর দেখাদেখি উশ্রীও সপ্রশ্ন হাসি হাসে।

'Court is a better zoo garden than a real one ; প্রকৃত জন্তু জানোয়ারের চিড়িয়াখানার চেয়ে আদালত আরও বড় আর বিচিত্র চিড়িয়াখানা। এ হলো এই পৃথিবীরই আর একটি ভিন্ন জগৎ। হাকিম উকিল মক্কেল মুহুরী সব স্পেসিমেন !

সাবজজের এজলাস। মধ্যাহ্ন বিরামের পর কয়েকজন উকিল সমবেত। বিমর্ষমুখ বিচারক উচ্চাসনে আসীন। দু'একজন উকিল আবেদন পেশ করলেন। অন্যমনস্ক সাবজজ উত্তর দিলেন না কোনো।

: কোর্ট কি অসুস্থ ইওর অনার ? একজন সিনিয়র উকিল উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন।

হাকিম পুর্ববৎ নীরব। তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটি কাগজ তুলে নিয়ে পেশকারের হাতে দিলেন, এটা ওঁকে পড়তে দিন।

ব্যক্তিগত চিঠি একখানা।

হাকিমের স্ত্রীর পত্র।

প্রায় ছ-মাস হলো বাপের বাড়ি এসেছি, তারপরই রেল বন্ধ, ডাক ধর্মঘট, তোমার কোনো খবরই পাই নি। আমি বিধবা !

চিঠি পড়ার পর উকিল হাকিমকে প্রশ্ন করেন, চিঠির হাতের লেখা কার ?

: আমার স্ত্রীর।

: তাঁর হাতের লেখা আপনি চেনেন ?

: বহুবার আমার সামনে লিখতে দেখেছি।

: কতবার ?

: পাঁচশ'র বেশি।

: কি কি লিখেছেন ?

: দুধের হিসেব, ধোপার হিসেব, এইসব।

: চিঠির নিচে সই কার ?

: আমার স্ত্রীর।

: ইতিপূর্বে তাঁকে কোন্ কোন্ কাগজে সই করতে দেখেছেন ?

হাকিম একটু চিন্তা করলেন, বাপের বাড়ি থেকে পাঠানো মানি-অর্ডার।

: আপনার স্ত্রীর বাপের বাড়ি কোথায় ?

: তেজপুর—আসাম।

: দেখি, যে খামে চিঠি এসেছে ?

উকিল খাম নিলেন, ডাক মোহর পড়েছে তেজপুর। The letter is proved your honour, there is no doubt that you are dead ; চিঠি প্রমাণিত হওয়ার পর কোনো সন্দেহ নেই, হুজুর মৃত।

এবার একজন ফৌজদারী উকিল উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু হুজুর আপনি তো সশরীরে বর্তমান, আমরা এতজন দেখতে পাচ্ছি !

: লিখিত পত্রের সামনে আপনাদের চাক্ষুস দর্শনের কোনো মূল্য নেই। Your statement can't at all explain out the proved document, আপনার উক্তি প্রমাণিত পত্রের অন্তর্নিহিত সত্য খণ্ডন করতে পারে না। লিখ্‌তন কে সামনে বখ্‌তন্ ক্যা ? সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্য মিছে হতে পারে, ভুল হতে পারে, কিন্তু যা কাগজে লিখিত তা মিছে হবার কথা নয়। আমার পক্ষে সাক্ষ্য অকাট্য, It is well established that the court is dead ; আদালত মৃত তা প্রমাণ হয়ে গেছে। দেওয়ানী উকিলের জবাব।

সাক্ষ্য গ্রহণের পর এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সহকারী ন্যায়াধীশ রায় দিলেন, 'In face of the unimpeachable document on the record I need not go into other evidence, it is therefore declared that the court is dead ; ঘোষণা করা হলো, আদালত মৃত।

রায় শোনার পর গভীর শোকে সমগ্র আদালত কক্ষ মুহ্যমান !'

২০

ধীরেন গুপ্তর সঙ্গে যে ক'মাস, তাতে উশ্রী বেশ এক অভিজাত পরিমণ্ডলের মধ্যে ছিল, কিন্তু আজ সে অনুভব করে আইনের জটিলত্ব ও গভীরতায় প্রবেশ করা আর আদালতের জন্যে কার্যকরী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ভিন্ন বস্তু। জ্ঞানের বারিধিতে সুপ্রীম কোর্টের বিরাট-বপু নথীপত্রের জাহাজ চলতে পারে, কিন্তু নিম্নতম আদালত, যেখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা মোকর্দমার জড়-বুনিয়াদ, সেখানে অপর পন্থা। আদালতে মোকর্দমা শুধুমাত্র বিচারের উদ্দেশ্যে পেশ হয় না, সত্যি-মিথ্যে বিবিধ ফর্মায় ফেলে ন্যায়ের মূর্তি বিশ্বস্তভাবে গড়েও নিতে হয়। Justice according to law ; আইনকে ধ্যানমধ্যস্থ রেখে মোকর্দমার অবয়ব গঠন। প্রকৃত দাবিটুকু আহরণের জন্যে বহু মিথ্যের সুশৃংখল ও বিশ্বস্ত ঘটনার স্থাপনা।

মুহুরী যোগেন্দ্র হরিমোহন মণ্ডলকে ধমকে ওঠে,'তুমি যে অসুস্থ ছিলে তার প্রমাণ? আজ সাক্ষী দিতে না পারলে তোমার মোকর্দমা খারিজ। তখনি বলেছি, বাপের শ্রাদ্ধ লেখাও, তা না শুনে নিজের অসুখ লেখালে!'

হরিমোহন মণ্ডল মিন্ মিন্ করে, 'আমি তো ছ-দিন জ্বরে পড়েছিলুম।'

যোগেন্দ্র মুহুরী দাঁত খিঁচোয়, বলে, 'ডাক্তার কোথায়, তাকে এসে একথা হাকিমের সামনে বলতে হবে। শুধু জ্বরে পড়েছিলুম, কি চিতায় উঠেছিলুম, বললে হাকিম শুনবে না।'

'ডাক্তার দেখাই নি।' উত্তর দেওয়ার পরও হরিমোহন মণ্ডল না-না ভঙ্গির ঘাড় নেড়ে চলে।

যোগেন্দ্র মুহুরী সল্‌হা দেয়, 'ডাক্তার একটা ভাড়া নিয়ে এসো ; অ্যালোপ্যাথ নেবে একশ', হোমিওপ্যাথ আর কবিরাজ পঁচিশ। তোমার বাড়ির কাছের ডাক্তার হওয়া চাই।'

অসহায় স্বীকারোক্তি করে হরিমোহন মণ্ডল, 'অত টাকা তো নেই মুন্সীজী, তাছাড়া এখন গাঁয়ে ফিরে গিয়ে ডাক্তার আনব কখন?'

যোগেন্দ্র মুহুরী আবার খিঁচিয়ে ওঠে, 'তবে কাগজপত্র নিয়ে বিদেয় হও। ডাক্তার নেই, টাকা নেই, উকিল কি হাকিমের সুমুখে ফোটো খেঁচাতে যাবে ? কোর্টে এসে হাত চেপে রাখলে চলে না, খরচ করতে হয়। পা-দুটো চেপে রাখলেই আমাশার রক্তপড়া বন্ধ হয় না, বুঝেছ তো ?'

একটা বড় মোকর্দমার কাগজপত্রে ডুবে ছিলেন পরেশ বসু, হঠাৎ চোখ তুলে প্রশ্ন করেন, 'হানিফ বেগ, তোমার আবার কি ব্যাপার, রোজই একটা না একটা কেস ?'

হানিফ কসাই উত্তর দেয়, 'মুজাহীদপুর বীফ্ মার্কেটে আমার যে গোস্ত-এর দোকান আছে তার ওপর হাজী সালামৎ খাঁ এভিক্শনের কেস ঠুকে দিয়েছে হুজুর।'

পরেশ বসু দুলে দুলে বলেন, 'আহা হা, বড় অন্যায় করেছে, ভাড়া দেবে না তুমি, এদিকে রোজ সন্ধ্যেবেলা হাতে ফুলের মালা জড়িয়ে বিবি বাজারে হাওয়া খেতে যাবে। যাক্, তোমার মোকর্দমার কথা পরে শোনা যাবে, এখন এই হরিমোহনটাকে উদ্ধার করে এসো তো দেখি ?'

'কি করতে হবে হুজুর ?' কৃতার্থ স্বরে হানিফ বেগ প্রশ্ন করে।

'তুমি রামপুর চেনো, ওখানকার হাটে তো মরা গরু কিনতে যাও ?'

'না হুজুর', হানিফ বেগ আপত্তি তোলে, 'আমার গোস্ত ফাস কিলাশ।'

'হ্যাঁ, একেবারে মেড্ ইন হল্যাণ্ড, হাওয়াই জাহাজে চালান আসে ! শোনো হানিফ বেগ, তোমায় ঐ হরিমোহনের পক্ষে সাক্ষী দিতে হবে। এজলাসে গিয়ে হলফ্ নিয়ে আর ইমান সাক্ষী করে হাকিমের সামনে বলবে, তুমি রামপুরের একজন মিঞা কোবরেজ, যাকে বলে য়্যুনানী হেকিম। জেরার উত্তরে দরকার পড়লে গুলবনাপশা-টপশা যেমন হয় দু'চার দাওয়াই-এর নাম বাতলে দিও। এই হরিমোহন, তোমার ডাক্তার হয়ে গেল। ডাক্তারকে দশ টাকা ফী দিয়ে দাও, সন্ধ্যেবেলা বিবি বাজা-রের খরচ।'

এ ধরনের কথা উশ্রীর আজকাল কানে ঢোকে না, ঢুকলেও মরমে প্রবেশ করে না, সে নির্বিকার মুখে হরিমোহনের মোকর্দমার কাগজ পড়ে যেতে

লাগল। মোকর্দমা পুর্নবহালের মিসলেনিয়াস কেস, একদিন অনুপস্থিতির দরুন মূল টাইটেল স্যুট খারিজ হয়ে গিয়েছিল।

'উশ্রী, হরিমোহন মণ্ডল আর হানিফ বেগের এজাহার তৈরি করে আমায় দেখিয়ে নিও, তারপর কি বলতে হবে ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে দাও।' উশ্রীকে লক্ষ্য করে পরেশ বসু বলেন।

পরেশ বসুর মুখের দিকে তাকিয়ে উশ্রী উত্তর দেয়, 'দিচ্ছি। কিন্তু ও যে আবার লুঙ্গি পরে রয়েছে?'

'তাতে কি হয়েছে? গাঁয়ের কোবরেজদের অবস্থা জানো? এ যে উলঙ্গ হয়ে আসে নি তাই ঢের!'

উশ্রী আর একটা আপত্তি তোলে, 'ফার্স্ট মুন্সিফ মুসলমান, থাকেনও মুজাহীদপুরে, যদি চিনে ফেলেন কসাই বলে?'

পরেশ বসু হাসলেন, 'কোর্ট হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ক্রীশ্চান হয় না। মেয়ে পুরুষও না। কোর্ট ব্যাকরণের মতে নিউটার জেনডার। আর Personal knowledge of court is no evidence; হাকিমের ব্যক্তিগত জ্ঞান বা ধারণা আইনত সাক্ষের পর্যায়ে পড়ে না। হানিফ বেগ কেন, নিজের পেটের ছেলে হলেও হাকিম তার দিকে চোখ তুলে তাকাবেন না। এগিয়ে যাও, অত চিন্তার কিছু নেই। তাছাড়া উকিল ডাক্তার আর কসাই জাতে সবাই এক, গোত্র ভিন্ন ভিন্ন। জীবের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়াই এদের জীবিকা।'

উশ্রী তবু দ্বিধাগ্রস্ত, বলতে যায়, 'কিন্তু—'

পরেশ বসু সে আপত্তি শুনতে চান না, বলেন, 'এটা তো সত্যি, রোগে পড়ার জন্যে বেচারা তারিখের দিন হাজির হতে পারে নি। দু-চারদিনের অসুখে কে আর পয়সা খরচ করে ডাক্তার আনে, বিশেষত গাঁয়ের মানুষ? কিন্তু আইন এত অল্পে সন্তুষ্ট নয়। তাই এখানে চরম মিথ্যের সাহায্যে পরম সত্যকে প্রমাণ করতে হয়। আমরা নিরুপায়। We are not liers, but made to lie; আমরা মিথ্যেবাদী নই, মিথ্যে আমাদের দিয়ে জোর করে বলানো হয়। এই মিথ্যেময় সত্যের জগতে যখন এসেই পড়েছ, তখন কি আর করবে বল?'

উশ্রী তবু বলে, 'কিন্তু এ যে একেবারেই মিথ্যে!'
'তা ঠিক!' একটু থেমে পরেশ বসু আবার বললেন, 'মিথ্যের বেসাতি করতে করতে উকিলদের এক ধরনের আত্মদর্শন হয়, তাদের মতো ত্যাগ বা দান আর কোনো পেশার লোকের মধ্যে দেখতে পাবে না। এখানেই দেখ না, রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদাহরণ, ওকালতি করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনা করেছেন, রাজা খেতাব পেয়েছেন, আবার প্রায় সর্বস্ব দান করে শেষ বয়সে রিক্তের জীবন কাটিয়ে গেছেন। সে সময়ে লোকে গান বেঁধেছিল ; না ঢাক, না ঢোল, আংরেজী বাজা ; না রাজ, না-পাট, শিবচন্দর রাজা!'
উশ্রী মৃদু হেসে বলে, 'আনন্দি ঝা'র মুখে এ গানের কথা শুনেছি।'
উশ্রীর কথা পরেশ বসুর কানে গেছে কিনা বোঝা যায় না, তিনি প্রায় আপন মনেই বলে চলেন, 'রাজা শিবচন্দ্র পরস্বোপহরণ করে রাজা হন নি, প্রায় সর্বস্ব দান করে রাজা খেতাব পেয়েছিলেন। আমাদের এই মিথ্যাচারী পেশাকে যে নোবল প্রফেশন বলে, তার গভীর তাৎপর্য। ডাক্তারী বা অধ্যাপনার মতো বৃত্তিও একদর পায় নি, তাঁরা সমাজের জন্যে যা কিছু করেন তা পেশা হিসেবে, তার বাইরে গিয়ে কেউই বিশেষ করেন নি। উদাহরণ যতটুকু তা কেবল ব্যতিক্রম হিসেবেই তালিকাভুক্ত হবার যোগ্য। তা উদাহরণই বলা চলে না। কোনো দ্বিতীয় বিদ্যাসাগরের কথা আমার জানা নেই।'
বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে উশ্রী পরেশ বসুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ব্যক্তি হিসেবে ইনি খুবই যোগ্য এবং উদার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিজের তিনজন জুনিয়ারকে স্বাধীনভাবে দাঁড় করাবার কি অসীম প্রচেষ্টা, এবং তার জন্যে প্রতি মুহূর্তেই স্বার্থ ত্যাগ। উপরন্তু মক্কেলদের প্রতিও যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন। এবং মোকর্দমার অন্তিম দায়িত্ব যেন তাঁরই। জুনিয়ারদের ভুল, মক্কেলদের ত্রুটি, সমস্ত নিজের অপরাধস্বরূপ মেনে নেন। কোনো অভিযোগ নেই। অপরের প্রতি দোষারোপের স্পৃহা নেই।
অবশ্য পরেশ বসুর মুখ লাগামহীন। খুব সহজেই আদিরসের ফোয়ারা

খুলে দেন। প্রথম প্রথম উশ্রীর অস্বস্তি বোধ হতো, লজ্জায় চোখ ঘুরিয়ে নিত সে। এখন বেশ সয়ে গেছে, বরং মাঝে মাঝে শুনতে বেশ ভালোই লাগে। প্রচণ্ড কর্মভারে বিব্রত হয়ে থাকার সময় দু-একটা আদিরসের কথাবার্তা কানে এলে মনের গুরুভার যেন মুহূর্তের মধ্যে তরল হয়ে আসে। তাই বোধহয় অধিকাংশ উকিল আর ডাক্তারের মুখ বল্গাহীন। কথাটা শুনতে মন্দ, কিন্তু প্রকৃত-সত্য তাই। অধিকন্তু সে বুঝতে পেরেছে, পরেশ বসুর মুখ শুধু মুখই, অন্তর নয়। অন্তরে তিনি প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি!

কিন্তু পরেশ বসু নামের ব্যবহারজীবী নিজের পেশা সম্বন্ধে এতখানি শ্রদ্ধাশীল ও আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন তা উশ্রীর জানা ছিল না। হয়তো তাঁর মন্তব্যের বেশ খানিকটা অংশ অতিরঞ্জিত, অপর জীবিকার প্রতি শ্রদ্ধার স্বল্পতা-চিহ্নিত, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই একটি তথ্যই প্রকাশিত হয়, এ ব্যক্তি নিজের পদের একজন অতিবিশ্বাসী সেবক। অর্পিত কর্মের মর্যাদা কোনো অবস্থাতেই তাঁর হাতে ক্ষুণ্ণ হবার নয়। এ যুগে এই রকম আদর্শময় দৃষ্টান্ত বিরল।

'আপনিও তো হুজুর আমার মোকর্দমায় এজলাসে আসবেন?' পরেশ বসুর অফিস ছেড়ে বেরুবার সময় হরিমোহন মণ্ডল প্রশ্ন করে।

'দেখ হে হরিমোহন, খঞ্জনী বাজিয়ে যখন কাজ চলে যেতে পারে তখন আর গলায় শ্রীখোল ঝোলাতে যেও না, উকিলের বাহার দিতে হলে ভিটেমাটি সব বিকিয়ে যাবে।' পরেশ বসু বললেন, 'আমায় ফী দিয়ে হুজুরে পেশ করতে গেলে তোমার ঐ চিমড়ে শরীরের সব শাঁস গলে জল হয়ে চুঁয়ে পড়বে। যাও, বিদেয় হও এখন। এগারোটার মধ্যে কাছারি পৌঁছে উকিল সাহেবার সঙ্গে দেখা করো, ওখানেই সব শিখিয়ে দেবে।'

দু-জন সাক্ষীর এজাহার তৈরি করতে প্রায় আধঘণ্টা, সেটি পরেশ বসুকে দেখিয়ে নিয়ে উশ্রী উঠে পড়ল।

পরেশ বসু বললেন, 'একটা কথা মনে রেখ উশ্রী, কোর্টে পৌঁছুতে কখনো দেরি করবে না। হাকিম কলম হাতে বসে রয়েছেন, আর উকিল

পৌঁছলেন তিন ঘণ্টা পরে, তা যেন না হয়। কোর্টের কাছে মর্যাদা পেতে হলে কোর্টের সম্মান আগে রাখতে হয়। শুধু তাই নয়, একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, আমরা যে আদালতকে সম্মান দি সে আদালতের হাতে ন্যায়ের মর্যাদাহানি সহজে হয়না। Court is human being and not just a chair as we the proud lawyers call it by way of humour ; ঠাট্টা করে চেয়ার-টেয়ার যাই বলি না কেন, আদালত মানুষই।'

ইতিপূর্বে উশ্রীর দু-একদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল, গতকালও হয়েছে। আজ তাই পরেশ বসু তাকে এতগুলি কথা না বলে থাকতে পারলেন না।

এ মৃদু ভর্ৎসনার জবাবে উশ্রী কিছু বলল না। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। রোজ সকালে এখানে এক ঘণ্টার জন্যে আসে সে। সাড়ে ন-টা বাজে, রিক্সায় বাড়ি পনেরো মিনিট। তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে আবার কাছারি দৌড়নো। তবু মাঝে মাঝে দেরি হয়ে যায়। আর কখনো দেরি হবে না তার।

২১

গম্ভীর মুখে রসিদ সই করে ইনসিওর করা আড়াইশ' গ্রাম ভারি খাম-খানা হাতে নিলেও মনের দিক থেকে অবন্তী অপরিসীম অবাক। খামের ঠিকানায় তার নাম, পদবীর পাশে বন্ধনীতে পিতৃকুলের পদবী। প্রেরক শ্যামলকুমার বিশ্বাস।

শ্যামল, অর্থাৎ প্রবীরকুমার নামে অভিনেতা বেঁচে ছিল এতদিন ? কি জানি কেন প্রায় চার পাঁচ বছর কোনো খবর না পেয়ে অবন্তীর মনে ধারণা গড়ে উঠেছিল শ্যামল মারা গেছে। অথবা এ পৃথিবীতে থেকেও সে এমন কোনো লোকে প্রস্থিত যেখান থেকে ভবিষ্যতে যোগাযোগ সম্ভব নয়।

জীবিত নিকটাত্মীয় এতদিন কখনো নিরুদ্দিষ্ট থাকতে পারে না। বিশেষত

শ্যামল হেন মানুষ, যার চিরদিনই টাকার খুব প্রয়োজন, এবং অসংকেত ঝড়ের মতো মাঝে মাঝে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে অবন্তীর নারীদেহের রন্ধ্র রন্ধ্র পর্যন্ত এক ধরনের ঘৃণাযুক্ত অধিকারবোধ নিয়ে তছনচ করে যাওয়ায় অভ্যস্ত, সে এতকাল নীরব থাকবে, তা কল্পনাতীত।

অবন্তীর মনে প্রায়ই বিবিধ সংশয় ও সন্দেহ জেগে উঠলেও, শ্যামল আবার তার চিরাচরিত জুলুমবাজ অবয়ব নিয়ে ফিরে আসবে, মনের মূলে গেঁথে যাওয়া এই বিশ্বাসের দরুনই সে ভাস্করের অনুচ্চারিত বিবাহ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে। বি. ডি. ও. ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের উদার সহায়তার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত গ্রহণ করে নি।

শ্রীপুর ত্যাগ করার পর বি. ডি. ও. ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ এখন কোথায় তা অবন্তী জানে না, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে একটি সশ্রদ্ধ মনোভাবের চিত্র আজও চোখের সমুখে জ্বল জ্বল করছে, সে তুলনায় শ্যামলের ঘনিষ্ঠ স্মৃতিও অনেক ফিকে।

শ্যামল শুধু এক বিভীষিকা ও দায়িত্বের কথকতা। তুলনায় ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ ছোট্ট একটি কৃতজ্ঞতা, কিন্তু অবন্তীর মনের অ্যালবামে যে ক'টি ছবি সুখ দুঃখের চিহ্নস্বরূপ আবদ্ধ, তার মধ্যে ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ স্বতন্ত্র পরিচয়। সে কথা কোথাও বলা যায় না, প্রসঙ্গ আলোচিত হলে অবন্তী যোগ দিতে পারে না, অথচ তাঁর সম্বন্ধে কাল্পনিক তথ্য শোনার জন্যেও প্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। বি. ডি. ও. তার কাছে স্বার্থহীনতা, কর্তব্য এবং ত্যাগের প্রতীক। অবন্তীর আরও গভীর অন্তঃকরণের স্বীকারোক্তি, বি. ডি. ও. তার নিভৃত ভালবাসা; শ্যামলের মতো দুর্ধর্ষ দেহময় নয়, ভাস্করের মতো ঘৃণা মোহ প্রয়োজন ও প্রত্যাখ্যান বিজড়িত নয়। সে ভালবাসার স্বীকৃতিতে ও পক্ষের পরিপূর্ণ নিস্পৃহা। যা এক মুহূর্তের জন্যেও মন দেওয়া নেওয়া বা মিলনের সন্ধিক্ষণ রচনা করে না। সে হাস্যকর চিন্তা মনে উদিত হওয়াও উচিত নয়।

ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর ব্লকে আরও দু-জন বি. ডি. ও. এসেছেন, এবং গেছেন। এখন প্রায় আট মাস যাবৎ তৃতীয় বি.ডি. ও-র পালা চলছে। লোকটি সবদিক থেকেই দুর্নামের অধিরাজ!

অবন্তীর এখন দৈনিক রিপোর্ট লিখে বি. ডি. ও-কে দেখানো বন্ধ। সকাল আটটায় এসে হাজিরা সই করা, বা দেরির কৈফিয়ৎ লেখার প্রাত্যহিক বালাই থেকেও প্রায় অব্যাহতি। তবু বড়বাবু মুরারী যাদব নিয়মটা জারি করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বি. ডি. ও-ই সময়ে অফিস আসেন না। এলেও চোরে কামারে বিশেষ দেখা নেই, অবন্তী তখন তথাকথিত ফিল্ড ডিউটিতে। অথচ সকাল আটটায় অফিসে হাজির হওয়া, বা সেখানে বসে রিপোর্ট লেখার অভ্যেস সে একেবারে বাতিল করে দিতে পারে নি, ওটার সঙ্গে ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের দৃঢ় নির্দেশের স্মৃতি জড়ানো।

মাস পাঁচেক হবে, সকাল সাড়ে আটটা, পিওন অফিস খুলে দিয়ে কোথায় চলে গেছে, একা বসে রিপোর্ট লিখছে অবন্তী। তার সহকর্মী তুখারাম বৈঠা বছর তুই যাবত নেই। বি. এ. পাশ করার পর রিজার্ভ কোটায় হাকিমী পরীক্ষা দিয়ে সে এখন কোনো জায়গায় ডেপুটি ম্যাজিস-ট্রেট। তার স্থানাভিষিক্ত যে ব্যক্তি সে কখনো ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপকে দেখে নি। অন্য ব্লক থেকে এসেছে, ব্লকের স্বতঃসিদ্ধ প্রথায় অভ্যস্ত। অতএব অফিসে তার হাজিরা, বিশেষত সকাল আটটায় আশা করা যায় না।

অফিসের পোর্টিকোয় জীপের আওয়াজ, গাড়িটা এখানে এসে থামল। সুমুখে খুলে রাখা নিজেরই রিপোর্ট বইটার সঙ্গে অবন্তীর বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় হলো একবার। বি.ডি.ও. কুলেশ্বরপ্রসাদের গাড়ি না? হঠাৎ এই অসময়! নিজের কক্ষে না গিয়ে বি.ডি.ও. এসে অফিসে ঢুকলেন, অবন্তী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, হাতে খোলা ফাউন্টেন পেন, 'নমস্তে স্যার।'

'নমস্তে।' বি. ডি. ও. সামনে এগিয়ে এলেন, শুনেছি আপনি প্রায়ই সকালে এসে কাজ করেন, তাই সারপ্রাইজ চেকিংএ এসেছি। কি করছেন এখন?'

'ডেলি ওয়ার্কএর রিপোর্ট লিখছি।' অবন্তী খাতা এগিয়ে দেয়।

'ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ এ নিয়ম চালু করেছিলেন, না, বড়বাবু আমায় বলেছিলেন?' বি. ডি. ও. অফিসারোচিত হাসি হাসেন, 'একেই ব্লকের

কাজ খুব হেভি, তার ওপর এত লেখালিখি চাপলে সত্যি কাজ কিছুই এগোয় না। যাক্ লিখেছেন যখন পরে দেখব। সবই আমায় দেখতে হবে। সন্ধ্যের পর খাতা নিয়ে কোয়ার্টারে দেখা করবেন, নট বিফোর সেভন্ থার্টি। আওয়ার মিটিং উইল রিমেন টপ্ সিক্রেট, দ্যাটস্ মাই অ্যাস্যুরেন্স। আসবেন নিশ্চয়ই, নির্ভয়ে আসবেন, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

অবন্তী জবাব দিল না, শুধু এই মহিষাসুরের সামনে দাঁড়িয়ে পায়ের নিচেটা তার মৃত্তিকাহীন এবং শূন্যতাময় মনে হতে লাগল।

কিঞ্চিৎ ভিন্ন গলায় এবং অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বি.ডি.ও. বললেন, 'লোকে অবশ্য বলে আমার খুড়শ্বশুর অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট বিভাগের ডেপুটি মিনিস্টার আমি ইচ্ছে করলে অপরের প্রমোশন বা ডিসমিশাল করাতে পারি, কিন্তু এভাবে অপরের পরিচয়ে পরিচিত হতে আমার ঘৃণা হয়। যাক্, আমার নির্দেশ কিন্তু ভুলবেন না।' শেষ কথাটিতে আবার উর্ধ্বতন অফিসারোচিত গম্ভীর নির্দেশনা।

অফিসিয়াল নির্দেশ জারি করে বি.ডি.ও. ঝড়ের মতোই অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অবন্তী কোনো জবাব দিতে পারল না।

তার পক্ষে এক্ষেত্রে জবাব দেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না।

বি.ডি ও. চলে যাওয়ার পরও অবন্তী প্রায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে রইল। আকস্মিকভাবে মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। নিরুপায় ক্রোধে সর্বাঙ্গ জর্জরিত। তৎসহ বিপুল ভয়। ইতিপূর্বে এ অবস্থা তার হয় নি কখনো। একজন বি.ডি ও. আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু এভাবে শাসানি দেন নি। অবন্তীর মনে হলো বরখাস্তের নোটিশ নিয়ে তাকে অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। নিজের বাড়িটাও এখান থেকে নজরে পড়ল তার, কল্পনার চোখে দেখল ছাদহীন অনাশ্রয়ের সমুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন!

পিওনের অপেক্ষা না করে অবন্তী নিজে গিয়ে এক গেলাস জল গড়িয়ে নিল, তারপর গেলাস হাতে সস্থানে এসে বসে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে সমস্ত জলটা পান করল সে। ব্লক কম্পাউণ্ডের ইদারার বিস্বাদ জল সে

মুখে দিতে পারে না, এখন সেই জলই অপূর্ব তৃপ্তিদায়ক! আসলে বুকটা তার চির তৃষিত মরুভূমির মতো শুকিয়ে গিয়েছিল, সে বুঝতে পারে নি। একটা ভিন্নজীবিকার অতি আবশ্যিক প্রয়োজন এই মুহূর্তে দেখা দিয়েছে, এ তৃষ্ণা তার চেয়ে বেশি।

আকণ্ঠ জল খেয়ে অস্বাভাবিক তৃষ্ণা নিবারণ করার পরও অবন্তী বসে রইল, যেন এখানেই তার আজকের ফিল্ড ডিউটি। বাকিটুকু সন্ধে সাড়ে সাতটার পর বি.ডি.ও-র নিরালা কোয়ার্টারে গিয়ে পুষিয়ে দিতে হবে। হয় তাই, নয় চাকরিতে ইস্তফা। বরখাস্ত হওয়ার বদনামের চেয়ে নিজে থেকে চলে যাওয়া ঢের ভালো। অনেক বেশি সম্মানও মর্যাদার। যেমন গেছেন ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ। তাঁর আগে এবং পরে কয়েকজন বি.ডি.ও-কে দেখেছে অবন্তী, কিন্তু সে মর্যাদার অর্ধসমকক্ষ একজনও নয়।

ব্লক অফিসে কর্ম-বাসর বসতে আরম্ভ করে বড়বাবু মুরারী যাদবের আগমনে। ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী আজও তিনি সকাল সাড়ে দশটায় এসে হাজিরা সই করেন। বাকি সবারই খেয়াল খুশির ঘণ্টা, যথেচ্ছ আসা যাওয়া। উপরির চাবিকাঠি ভিন্ন তাদের হাতের ফাইল খোলানো যায় না।

অফিসের ঘড়িতে সাড়ে দশটা, মুরারী যাদব এসে ঢুকলেন। সর্বপ্রথম ছাতাটি যথাস্থানে রেখে এলেন তিনি, তারপর জানলার বাইরে গলা বাড়িয়ে পানের পিক্ ফেললেন। অতঃপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে হাজিরা বই খুলে সই করলেন। ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ যাওয়ার পর হাজিরা বই আবার তাঁর টেবিলে ফিরে এসেছে, পরবর্তী বি.ডি.ও এ তুচ্ছ জঞ্জাল নিজের অফিসে রাখতে চান নি।

নিয়মবদ্ধ প্রাথমিক কাজগুলি সারা হলে মুরারী যাদব অবন্তীর দিকে তাকালেন, 'কি শ্রীমতীজী এখনো বসে, ফিল্ডে যান নি?'

বিমর্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অবন্তী জবাব দিল 'না।'

'অফিসে কোনো কাজ আছে নাকি?'

অবন্তী আবার বলল, 'না।'

'তবে ?' এবার বড়বাবুর জিজ্ঞাসা গভীর।

অবন্তী এক মুহূর্ত চিন্তা করে, মুরারী যাদবকে কি বিশ্বাস করা চলে, এ-ও তো কেরাণীকুলেরই একজন, অসৎ অফিসারদের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। তবু এখনো পর্যন্ত মুরারী কতকাংশে ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ-পন্থী। তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে। অবন্তী বলল, 'সকালের দিকে বি.ডি.ও. এসেছিলেন।'

'কেন ?'

অন্যদিকে চোখ ফেরাল অবন্তী, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

পানের ডিবে খুলে মুরারী যাদব মুখ গহ্বরে পান জর্দা নিলেন, 'বুঝেছি ! আমায়ও উনি একবার বলেছিলেন, একা থাকতে ভালো লাগে না। জবাব দিয়েছিলাম, স্যার, আপনি যদি চান আপনাকে চাল ডাল মোষের দুধ সব বিনা পয়সায় দিতে পারি, সবই আমার বাড়িতে আছে, কিন্তু মেয়েমানুষ সাপ্লাই করতে পারব না। আপনার স্ত্রী নয় দেশের বাড়িতে সংসার চালাচ্ছে, তার বদলে মা বোনকে আনিয়ে নিন, তাতেই পুষিয়ে যাবে। এমন নির্লজ্জ, এতখানি অপমানের কথা শুনেও আবার আপনার কাছে এসেছে ! এই করতে গিয়ে একবার সাসপেণ্ডও হয়েছিল, এরপর চাকরি যাবে। জমিদারি উঠে যাবার পর যে নীতি নিয়ে ব্লক আর অঞ্চল আপিস তৈরি হয়েছে, এদের মতো দু-চারটে পাজি অফিসারের জন্যে সে উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।'

'তা তো বুঝছি, কিন্তু আমার কি কর্তব্য বলুন ?' বিষণ্ণ হেসে অবন্তী প্রশ্ন করে।

সমস্ত সমস্যা মুরারী যাদব যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চান, বলেন, 'কি আবার, অফিস ছাড়া ওর সঙ্গে দেখা করবেন না। প্রশ্ন করলে বলবেন, বড়বাবু মানা করেছেন।'

'তাতে চাকরি যাবে।' অবন্তীর কণ্ঠস্বর বিমর্ষ।

'চাকরি ওর বাপ দিয়েছে কি না !' বড়বাবু বিকৃত মুখে কথাটা বলেন, তারপর গাম্ভীর্য সহকারে তাঁর উক্তি হয়, 'দেখুন দেবীজী, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি না, কিন্তু তাই বলে

আমার চোখের সুমুখে একটা লোক মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করবে আর আমি সয়ে যাব, একথা জানতে পারলে আমার শ্রীমতী আমায় শাড়ি আর চুড়ি পরিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেবে। জমি জিরেতের ঝগড়া মারামারি নিয়ে দু-বার জেল খেটেছি, আর একবার কংগ্রেসী আন্দোলনে, না হয় ফের একবার যাব। তা আপনার জন্যে নয়, নিজেরই ইজ্জত বাঁচাতে।' একমিনিট কি ভাবলেন বড়বাবু, তারপর বললেন, 'আপনার ফিল্ড সার্ভিসের রিপোর্ট বুক আমায় দিন তো দেবীজী, এটা নিয়ে আমি নিজেই বি.ডি.ও-র সঙ্গে দেখা করব। তারপর আশা করি সে আর কখনো আপনাকে ঘাঁটাতে সাহস করবে না।'

আশংকিত স্বরে অবন্তী বলে, 'তাতে উনি যদি আপনারই ক্ষতি করেন?'

মুখ ভর্তি পান নিয়ে মুরারী যাদব হাসলেন, 'তার জন্যে ওঁর খুড়শ্বশুরকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা তাঁর কানে গেলে তিনি জামাইকে কতখানি খাতির বা সাহায্য করবেন, সে বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ। আর সব সময় নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে গেলে কর্তব্য বজায় রাখা যায় না। দিন আপনার রিপোর্ট। এই রিপোর্ট আজ আমি আগাগোড়া অ্যাপ্রুভ করিয়ে আনব, তারপর উল্টো কিছু করতে গেলে তা তার উদ্দেশ্যমূলক বিবেচিত হবে। পাজি অফিসারের অধীনে কি ভাবে চাকরি করতে হয় তা আমি জানি। আপনাকেও শিখে রাখতে হবে। সব অফিসারই ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ নয়।'

মুরারী যাদব প্রায় জোর করেই অবন্তীর কাছ থেকে রিপোর্ট নিলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যান দেবীজী; মুরারী যাদব বেঁচে আছে।'

অবন্তী উঠে দাঁড়াল, মুরারী যাদব যখন ভরসা দিয়েছে, তা অনেকখানি। আর সম্ভ্রম যাবার ভয় নেই। চাকরি যাবারও না। কিন্তু মুরারী যাদবের ঐ উক্তি, আপনাকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি না, সর্বাঙ্গে অপমানের বিষাক্ত জ্বালা ধরিয়ে দেয়। এই মুহূর্তে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হচ্ছে তার, যেন অস্তিত্ববিহীন শূন্য অবয়ব!

২২

মনটাকে পরম নিস্পৃহতার আয়ত্তে বেঁধে ফেলার পর অবন্তী ইনসিওর করা ভারি খামটা খুলে ফেলল। ভেতরে অনেক তথ্যই থাকা সম্ভব, অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য থেকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ পর্যন্ত। এতখানি ওজন নিয়ে শ্যামলের চিঠি আসবে, অবন্তী তা স্বপ্নেও কখনো ভাবে নি। শ্যামল অশিক্ষিত নট নয়, সসম্মানে বি. এ. পাস, কিন্তু স্ত্রীকে সুদীর্ঘ চিঠি লেখার জন্যে যে মানসিকতা প্রয়োজন তা তার কোনোদিনই ছিল না। এমন কি বিয়ের পর প্রথম বছরটা, যখন অবন্তী দৈহিক দিক থেকে সুপরিচিত হলেও, তার মনের অনেক খবরই শ্যামলের অজানা, তখনো সে চিঠির অভিযানে এই মনোজগৎ উন্মুক্ত করার বাসনা দেখায় নি।

খামের ভেতরকার যত কাগজ পত্রের রূপ অনেকটা কোর্ট-কাছারির কাগজের মতো। স্ট্যাম্প পেপারের ওপর টাইপ করা। সেগুলো বাদ দিয়ে অবন্তী খুঁজতে লাগল কোনো চিঠি আছে কিনা। সে জায়গায় এক গোছা একশ' টাকার নোট নজরে পড়ল, এবং তারই ফাঁকে চিঠি। আগের তুলনায় একটু দীর্ঘই হবে, কিন্তু কোনো মতেই সে দৈর্ঘ্য ক'বছর অজ্ঞাতবাসের বিস্তারিত বিবরণের সমান হবার মতো নয়।

প্রথমে ওপর ওপর দেখে চিঠির সারমর্ম গ্রহণ করার চেষ্টা করে অবন্তী। পাছে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় তাই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়ল না। দ্বিতীয়বার পড়বে, ঠিক যে ভাবে বাংলা উপন্যাস পড়ে সে। প্রথম পাঠে আগ্রহ জাগলে দ্বিতীয় দফায় মনোনিবেশ, নয়তো দু'শ' পাতার বই বিশ মিনিটই যথেষ্ট। এতেও বইটা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়ে যায়।

'অবন্তীদেবী—!'

সম্বোধন একটু নতুন রকমের, তাই প্রথমেই কেমন যেন খটকা লাগে, একই মানুষের প্রাচীন মানসিকতায় লেখা চিঠি তো? তবু দ্রুতপাঠে

অবন্তী যে পাঠোদ্ধার করে তাতে জানা যায়, তার সঙ্গে সম্পর্কের হেস্তনেস্ত করে ফেলেছে শ্যামল। বিবাহ বিচ্ছেদের একপক্ষীয় ডিক্রি নিয়েছে আলিপুর কোর্ট থেকে, অ্যাডালট্রি অভিযোগে ডাক্তারও সে মোকর্দমায় দু-নম্বর বিরোধী পক্ষ। ভুল ঠিকানায় নোটিশ ইত্যাদি দেওয়ার দরুন তারা জানতে পারে নি। গেজেট কে আর কবে উলটে দেখে? তবে ডাক্তারের বিরুদ্ধে খেসারত দাবি করে নি শ্যামল। জজ-আদালতের ডিক্রির নকল সে এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছে, যাতে অবন্তীর মনে কোনো সন্দেহের আঁচ থেকে না যায়।

দ্বিতীয়ত, অবন্তী স্বাবলম্বিনী, যদি না ডাক্তার এরপর তাকে বিবাহ করে তবু নিজের প্রতিপালনে সক্ষম! তবে ডাক্তার বিবাহ করবে না বলেই শ্যামলের মনে হয়, কারণ যে মনোবৃত্তি নিয়ে পরস্ত্রীকে উপভোগ করা যায়, সেই অনুদার প্রবৃত্তির জোরে তাকে বিবাহ করা চলে না। প্রবৃত্তিময় মানুষের আচরণে রক্ষণশীলতার ভাব একটু বেশি, এই তো শ্যামল চিরদিন দেখে এসেছে! অবন্তীর বর্তমান দিন স্বকীয় উপার্জনেই চলে, উপরন্তু একটা পাকা আশ্রয় থাকলে সে আজীবন সুখে থাকবে, তাই এ বাড়িটা শ্যামল তারই নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। রেজিস্ট্রির কাগজও পাঠাল।

তৃতীয়ত, অনেক সময় জোর জুলুম করে অবন্তীর কাছে টাকা নিয়েছে শ্যামল, তিন-চার হাজার হবে, তাই সুদ হিসেব করে পাঁচ হাজার পাঠাল। যদিও খামের ওপর ইনসিওরের মূল্য লিখেছে মাত্র পাঁচশ'। এই সূত্রে এ-ও উল্লেখ করা যেতে পারে খামের গায়ে শ্যামলের নিজের ভুল ঠিকানা দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থত, শ্যামল বিবাহ করেছে, পত্নী কিঞ্চিৎ বয়স্থা, বিধবা এবং ধনী। একটি অপেরা পার্টি খুলেছে শ্যামল, বর্তমান স্ত্রীর নামে, কারণ নিজে সে কিছুদিন নেপথ্যে থাকতে চায়, এমন কি অভিনয় জগৎ থেকেও। পরে প্রবীরকুমার নাম ত্যাগ করে শ্যামলকুমার নামে আসরে নামবে; এখন তার সবদিক থেকে প্রস্তুতির কাল এবং সাধনার একাগ্রতা।

পঞ্চমত, এরপর অবন্তী যদি সুখী হয়, শ্যামলও নিজেকে অত্যন্ত সুখী

মনে করবে।

এ চিঠি দ্বিতীয়বার দেখার দরকার নেই। এত লঘু মনোযোগের সঙ্গে পড়া সত্ত্বেও প্রতিটি বক্তব্য অবন্তীর চেতনায় সুদৃঢ় ভিত্তিতে গেঁথে গেছে। ভেবেছিল দীর্ঘ অবকাশ নিয়ে ধীরে ধীরে পড়বে—যা এই ক'বছরের ব্যবধানকে প্রতি পদে চিন্তার জোড়াই করা বাচনিক সেতু দিয়ে সংযুক্ত রাখতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন রইল না। চিঠি আরও সংক্ষিপ্ত এবং মূল বক্তব্যে কেন্দ্রীভূত হলেও বাকি কাগজপত্র ও একশ' টাকার নোটের তাড়া দিয়েই তার পরিপূর্ণ পুষ্টি হয়ে যেতে পারত।

কিন্তু এ চিঠি কি প্রকৃতপক্ষে শ্যামলেরই লেখা? সেই শ্যামল, অবন্তীর কাছে যার একমাত্র পরিচয় দুর্ধর্ষ অবিবেচক প্রায় এক পাশবিক নর-সত্তা। অপরের জীবন সম্বন্ধে কর্তব্যবোধ এবং সব ব্যাপারে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এ হেন মানুষটি পেল কোথা থেকে? বিশেষত ডাক্তারের চরিত্র বিশ্লেষণ, এতখানি নির্ভুল ভবিষ্যতবাণী শ্যামল করতে পারে, তা যেন কোনোমতেই বিশ্বাস হতে চায় না। তার চরিত্রের এ অধ্যায়, তা কি ঐ নবপরিণীতা পুনর্ভূর অবদান; তার ধন-সম্পত্তির মহিমা? হতে পারে বিশেষ কোনো নারীর সংস্পর্শে এসে পুরুষের চরিত্রের একটা সুপ্ত দিক জেগে ওঠে। সেদিক থেকে শ্যামলের জীবনে অবন্তীর সংস্পর্শ ও সাহচর্য ব্যর্থ হয়েছিল, এতদিন পরে দ্বিতীয় সম্ভাষণে তা পূর্ণ হয়েছে। শ্যামল আজ সুখী, কিন্তু তার এ সুখ অবন্তীর পক্ষে গভীর লজ্জা। এ লজ্জা তার সর্বত্রই।

অবন্তীর মনে পড়ল কত সহজেই ভাস্কর তার পাশ থেকে সরে গিয়েছিল। পরে অবশ্য ব্যাপার কিছুটা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সেদিন অত পেয়ে এবং আজীবন পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ডাক্তার যেন সদাসর্বদা জাল কেটে পালাবার সুযোগ খুঁজেছে। এবং অবন্তী একটুখানি হাত আলগা দিতেই সে পালিয়ে গেছে।

বিয়ে করে ডাক্তার সুখী হতে পারে নি, নিজের সুখের সম্ভাবনা নিজেই নষ্ট করেছে। সে সুখী হতে পারে নি, তাই আজও তার অবন্তীকে প্রয়োজন। অবন্তী তার কোনো চাহিদায় আর সাড়া দেয় না, তবে একেবারেই

যে অনুদার হতে পারে না, এ তার সৌজন্য।

ডাক্তার মনে করে অবন্তী আজও তাকে ভালবাসে, সেই মনে করার মোহে সে নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা সংসার একরকম বিসর্জন দিয়ে রেখেছে।

উশ্রীকে অবন্তী মাত্র একবারই দেখেছে। বিয়ের ক'দিন পরে এখানকার ব্লকের-কোয়ার্টারে একটা ছোট খাটো বউ-দেখার জলসার আয়োজন করেছে ডাক্তার। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছিলো জন দশ-বারোর বেশি নয়। অবন্তীকেও বলতে এসেছে।

ভাস্কর বোধহয় আগে থেকেই মহড়া দিয়ে রেখেছিল, এখানে এসে প্রসঙ্গবর্জিত ভাষায় বলল, 'কাল সন্ধ্যেবেলা আমার ওখানে একবার এসো অবন্তী, নিশ্চয়ই এসো ; অল্প কয়েকজনকে বলেছি এখানে, আমার পরিচিত ক'জনই বা আছে?'

'শুধু মুখে বলবেন, কার্ড কোথায়?' বুকে নিরুচ্চার জ্বালা, তবু অবন্তী হেসে প্রশ্ন করে।

নিরপরাধ সরল চোখে তাকিয়ে থেকে ডাক্তার উত্তর দেয়, 'কার্ড ভাগলপুরে ছিল, এখানকার জন্যে ছাপাই নি।'

তেমনি সহজ অবন্তীও, বলে, 'ওঃ, আমরা সব এলেবেলে! বউ-এর নাম কি আপনার?'

'উশ্রী।' ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, নামটা যেন তার মর্মবিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

ঈষৎ অর্থময় মৃদু হাসি হেসে অবন্তী প্রশ্ন করে, 'দেখতে নিশ্চয় খুব সুন্দরী?'

এতক্ষণে ডাক্তার একটু লজ্জিত, খানিকটা বিব্রত ভাব নিয়ে বলে, 'তা আমি কি জানি, নিজের চোখে দেখে তোমার যা মনে হবে। আমি তো তেমন রূপ খুঁজে বিয়ে করি নি, দরকার পড়েছিল তাই।'

তারপর আর বসল না ডাক্তার, আরও ক'জনকে বলতে হবে, এই ছুতোয় উঠে গেল।

ভিড় অল্প, এবং এরা সকলেই অবন্তীর পরিচিত। কারো কারো সঙ্গে

কথাবার্তা না হলেও, ডাক্তার আর অবন্তী কি ভাবে সম্পর্কিত তা এদের অজানা নয়। যতখানি মানসিক বল নিয়ে অবন্তী এসেছিল এখন তা নেই। সাহসী মনের প্রতিটি সুবিস্তৃত স্তর সংকোচের আবরণ পড়ে ঢেকে গেছে। এ অবস্থায় আজ এখানে না এলেই ভালো ছিল তার। কিন্তু এখন আর পালাবার উপায় নেই।

অবন্তীকে নিয়ে অভ্যাগতা মহিলা মাত্র তিন, বাকি দু'জন হাসপাতালের নার্স। এদের কাছে অবন্তীকে প্রায়ই পরিবার পরিকল্পনার মেয়ে আসামী ধরে নিয়ে যেতে হয়। এরা জানে অবন্তী ডাক্তারের কি এবং কতখানি, তাই তাকে ডাক্তার-সুবাদে একটু অতিরিক্ত খাতির করে। আর ঠিক এই কারণে আজ থেকে অনুকম্পা দেখাবে হয়তো।

নার্স মীরাদি প্রশ্ন করল, 'কেমন আছেন?' অবন্তী যে ভালো থাকতে পারে না, এ ধারণা নিয়েই তার এই প্রশ্ন।

'ভালোই। আপনি?' অবন্তী জবাব দেয়, এবং সৌজন্যসূচক প্রশ্ন করে। মীরাদি ঠোঁট উল্‌টে বলে, 'চলে যাচ্ছে। আমাদের আর থাকা থাকি কি বলুন? সব ভালোমন্দই তো গায়ের চামড়ার মতন পোড়া সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তারপরও এই নার্সের চাকরি, দুনিয়াসুদ্ধ লোকের মন যুগিয়ে চলা, আর গালাগালি খেয়ে মরা। ভাবছি নার্সিং না পড়ে আপনার মতন কেন সোস্যাল সার্ভিসের ট্রেনিং নিলুম না, তাহলে কারো চোখ রাঙানী তো আর সইতে হতো না!'

মীরাদির অভিযোগ ডাক্তারের বিরুদ্ধে, এবং অবন্তীকে ডাক্তারের পরকীয়া অর্ধাঙ্গিনী মনে করে তার সুমুখে বলা। মাঝে মাঝে মর্মপীড়া জাগালেও এসব অবন্তীর গা-সওয়া। হাসপাতাল মানেই তো চুরি, গভর্নমেণ্টের যে কোনো বিভাগই তাই, হয় চুরি, নয় ঘুষ। অথবা উভয়ই। কিন্তু মীরাদির চুরির বহর একটু বেশি লম্বা, আর ছিঁচকে ধরনের। ওষুধপত্র ইউরিনাল বেডপ্যান তো আছেই, ব্যাণ্ডেজের কাপড় পর্যন্ত পেটে জড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু করে কি, ব্যাণ্ডেজ জুড়ে তো আর বিছানার চাদর বা বরের গায়ের ফতুয়া তৈরি হয় না!

মীরাদি বউ-এর মুখ দেখল সিলভার প্লেটিং করা পাউডারের কৌটো

দিয়ে। নার্স অনুসূয়া উপহার দিল একটা কমদামী মেয়েলি ছাতা, টাকা ছ'সাত দাম হবে। অবন্তী নিয়ে এসেছে আশি টাকার শাড়ি, আর বাইশ টাকার ব্লাউজ পীস, যা তার সামর্থের সাত গুণ।

ভাস্কর পরিচয় করিয়ে দেয়, 'আমাদের ব্লকের উইমেনস্ ওয়েলফেয়ার সুপারভাইজার অবন্তী, মানে শ্রীমতী অবন্তী বিশ্বাস।'

উশ্রী চকিতে তাকাল, এবং হাত তুলে নমস্কার করল, কিন্তু ইতিমধ্যে যা হবার তা হয়ে গেছে। অবন্তী অবশ্য মাথায় অল্প ঘোমটা টেনে এসেছে, সিঁথিতে ক্ষীণ সিঁদুররেখা, কিন্তু প্রথমে অবন্তী বলে পরিচয় দিয়ে, পরে ঐ নামের সবিস্তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভাস্কর সম্পর্কটা সন্দেহজনক করে তুলেছে। এতে আবার অবন্তীর অজানিত মনের সায়ও আছে। এক-জন অতিসাধারণ শ্রেণীর অনাত্মীয়া হয়ে এত দামী উপহার নিয়ে হাজির হওয়া তার চরম মুর্খামি। এর আর চারা রইল না। আজ রাত্তিরেই উশ্রী ভাস্করকে অবন্তীর কথা জিজ্ঞেস করবে, এবং তাদের সম্পর্ক।

এতে অবশ্য অবন্তীর বিশেষ কিছু যায় আসে না, যা বিশ্বদুনিয়া জানে তাই না হয় আরও একজন জানল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি উশ্রীর পক্ষে সব জেনে ফেলা হয়তো ভাস্করের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে ক্ষতিকর। মিথ্যের পর মিথ্যে দিয়ে ইমারত গড়ে সেখানে স্ত্রীর বিশ্বাস ও প্রণয় সাজিয়ে সুখের সংসার আরম্ভ করবে, সে ধাতু নয় ভাস্কর, কিংবা এ বিষয় তার বিচক্ষণতারই অভাব। আসলে একদিক থেকে লোকটি অত্যন্ত সৎ, আর সৎ ব্যক্তি চিরদিনই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুর দুঃখের কারণস্বরূপ হয়ে থাকে।

মেয়েদের কিছুদূর এগিয়ে দিতে এলো ভাস্কর। এখুনি আবার ফিরে যাবে, মীরাদির নিষেধ কানে নিল না, বলল, 'একটা দিনই তো ; আপনারা কষ্ট করে এসেছেন, আমি আর কতটুকুই বা যাচ্ছি ?'

মীরাদি ও অনুসূয়া ডাক্তারের অধঃস্তন, স্বাভাবিক কারণেই তারা একটু পিছিয়ে পড়েছে, এক সারিতে চলতে পারে না।

চকিতে একবার পেছন পানে দেখে নিল ভাস্কর, তারপর চাপা অথচ রুক্ষ গলায় বলল, 'তোমার অনেক টাকা হয়েছে, না ?'

'না, ওটা তো আপনাদেরই একচেটে।' অবন্তী সমান ভাবে এবং সমান স্বরে বলে। ডাক্তারের অসহায়তার দরুন সমবেদনা জাগলেও এক ধরনের পুলকানুভব হচ্ছে তার।

'তবে অত দামী জিনিস দিতে গেলে কেন ?'

'সৌজন্য দেখানোটা যে আপনাদেরই শোভা পায়, তা জানতাম না।' অবন্তী জবাব দেয়।

'তুমি না বুঝেই সব কাজ কর। জানো না—।'

হঠাৎ থামল ডাক্তার, এবং তারপরই ফিরে গেল

২৩

'একটা জিনিস দেখুন।' ভাস্কর আসতেই একটু হেসে অবন্তী শ্যামলের চিঠিখানা দেওয়াল আলমারি থেকে বার করে এনে তার দিকে এগিয়ে দেয়।

খামের আবরণ দেখে মনে হয় চিঠি, কিন্তু ভেতরকার বস্তুর তুলনায় খামটা অতিবৃহৎ। অবন্তীর হাতে ধৃত অবস্থাতেই প্রতিপন্ন হয় খামখানা যেন শূন্যগর্ভ। তাই চিঠিখানা হাতে নেবার আগে ভাস্কর প্রশ্ন করে, 'কি এটা ?'

'চিঠি।' সংক্ষিপ্ততম উত্তর দেয় অবন্তী, তারপর আবার বলে, 'নিন না, ধরে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি ?'

ভাস্কর এবার অবন্তীর হাতের খামখানার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, মুখেও প্রশ্ন করে, 'কার চিঠি, তা তো বলবে ? কোনো সরকারি পত্র নাকি ? কিন্তু খামের চেহারা তো তেমন নয় ?'

'পড়ে দেখুন না, আপনাকে তো পড়তেই দিয়েছি, ছ'দিন আগে এসেছে।' অবন্তীর মুখে রহস্যমাখা হাসি, 'তখন থেকে আপনার কথাই ভাবছি, কবে আসবেন।'

'শ্যামলের বুঝি, বহুকাল পরে খবর দিয়েছে ! কেমন আছে সে !' প্রশ্ন

করলেও জবাবের অপেক্ষা না করে পরিপূর্ণ কৌতূহলের আতিশয্যে ভাস্কর তাড়াতাড়ি চিঠি পড়তে আরম্ভ করে।

টেবিল ল্যাম্পটা ভাস্করের আরও কাছে এগিয়ে দিয়ে অবন্তী তার মুখভাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করে। চিঠি পড়ছে ভাস্কর। এ চিঠিতে ভাস্করের সম্বন্ধেও একটি অনুচ্ছেদ আছে। তার প্রকৃতি এবং চরিত্রের বিষয় শ্যামলের যা ধারণা, এবং যা সেই মন্তব্যের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।

অবিকৃত মুখে সমস্ত চিঠিটা পড়া হলে ভাস্কর সেটি অবন্তীর হাতে ফিরিয়ে দিল, 'যাক ভালোই!'

অবন্তীর ইচ্ছে ও অনুমান একটু আহত হয়েছে। সে আশা করেছিল চিঠি পড়তে পড়তে ভাস্কর নিজের অন্তর এবং প্রকৃতিগত দুর্বলতা ও সংকীর্ণতার সন্ধান পেয়ে লজ্জিত হয়ে উঠবে, আর সেই ভাব তার মুখাবয়বে ফুটে উঠবে। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না দেখে সে ক্ষুব্ধস্বরে প্রশ্ন করে, 'ভালোই? কিসের বা কার ভালো বলছেন আপনি?'

অপর কোনো প্রসঙ্গে গেল না ভাস্কর, অবন্তীর মুখের দিকে পরিষ্কার দৃষ্টি উঠিয়ে জবাব দিল, 'তুমি মুক্তি তো পেয়ে গেলে?'

'সে তো চিরদিনই পেয়ে রয়েছি, বন্ধন আমার আর কবে হলো?' তারপর ঘরের দেওয়াল আলমারিতে একটা ভালো জায়গা দেখে চিঠিখানা অবন্তী সযত্নে তুলে রেখে ভাস্করের কাছে ফিরে এলো।

ভাস্কর তার লঘু কণ্ঠে ঈষৎ নৈরাশ্যের আঁচ রেখে বলল, 'একটা বন্ধন তবু ছিল?' খুব সম্ভব সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সে কথাটা বলে।

অবন্তী একটু কর্কশ গলায় জবাব দেয়, 'আপনি নিজেই ভালো করে জানেন এ বন্ধন আমি কতটা মেনে চলেছিলাম।'

একটা সিগারেট ধরাল ভাস্কর, 'অবন্তী, তুমি আমার কাছে কি শুনতে চাও তা ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু এরপর আমায় যদি কিছু করতে বল, মানে কোনোরকম সাহায্য, তাতে আমি খুশি মনেই রাজি। উশ্রীর সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হবার আগে আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু সেদিন তুমি আমায় প্রস্তাব করার একটা সুযোগ পর্যন্ত দাও নি।

উশ্রী, উশ্রী কেন, সবাই জানে তুমি এখনো আমার স্ত্রীর মতন, আর সেই ধরনের সম্পর্ক আজও আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু আজ যে তা নিছক বন্ধুত্বের আলাপচারিতে এসে দাঁড়িয়েছে, তা বলতে গেলে কেউ বিশ্বাস করবে না, আমিও তাই বলি না। উশ্রীকে আমি মন থকে গ্রহণ করতে পারি নি, কিন্তু সেজন্যে সে নিজেকে বিশেষ অসুখী মনে করে তা-ও নয়।'

অবন্তী ধৈর্য ধরে ডাক্তারের সুদীর্ঘ বিবৃতি শোনে, ডাক্তার চুপ করতে সে জিজ্ঞেস করে,'এত কথা আপনি আজ আমায় কেন বলছেন?' বলার পর সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

স্থির ও শান্ত উত্তর দেয় ভাস্কর, 'তোমার যদি মনে হয় আমার জন্যেই তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে আমি তার প্রতিকার করতে পারি।'

'কিভাবে করবেন?' প্রশ্নের পর অবন্তীর অকৌতূহলী দুটি চোখের তারা ভিন্ন ভাবব্যঞ্জনা নিয়ে ভাস্করের মুখের ওপর স্থির হয়ে থাকে।

'এর তো একটাই প্রতিকার হতে পারে,' হাতের সিগারেট খানিকটা বেঁচে থাকতেই তা ফেলে দিয়ে অস্বস্তি কাটানো একটু হাসি হেসে নিয়ে ভাস্কর বলে, 'তোমায় বিয়ে করে।'

'আর উশ্রীর—?' এক মুহূর্তের বিরতি পর্যন্ত না দিয়ে অবন্তী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে।

ভাস্কর যেন পূর্বচিন্তিত তৈরি জবাব দেয়, 'সে যেমন আছে থাকবে।'

ভাস্করের প্রায়-অর্বাচীন জবাব শুনে অবন্তী হেসে ফেলল, 'তাহলে আপনার জেল হবে।' উত্তর দেওয়ার পর সে অহেতুক একবার ঘরের দেওয়াল আলমারির কাছে গেল, তারপর ফিরে এসে বলল, 'আপনি দেখছি আজকালকার আইন কিছুই জানেন না। উকিল বউ-এর স্বামী হলেন কি করে?'

ভাস্কর বলল, 'উশ্রী সংসার বিশেষ চায় না, স্বাধীনতা চায়। তার মন প্রথমাবধি তৈরি, সে জানে আমরা এখানে স্বামী-স্ত্রীর মতন বসবাস করি। আমি ইচ্ছে করেই সে ভুল ধারণা ভাঙবার চেষ্টা করি নি, এই ভেবে, যদি কোনোদিন তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি প্রয়োজন হয়, বা তাকে না

ছেড়েও তোমায় বিবাহ করার দরকার হয়, সেদিন তা নির্ঝঞ্ঝাটে হয়ে যাবে।'

অবন্তী বলল, 'আপনার উকিল স্ত্রীকেই জিজ্ঞেস করবেন, এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় বিয়ে হতে পারে না।'

অবন্তীর মুখ থেকে বার দুই উকিল স্ত্রীর উল্লেখ হতে কিঞ্চিৎ বিরক্তি-নির্যাসিত গলায় ভাস্কর উত্তর দেয়, 'অনেক আইন শুধু বই কেতাবের পৃষ্ঠাতেই থাকে, কার্যত ব্যবহার হয় না, উশ্রী প্রতিবন্ধকস্বরূপ না দাঁড়ালে বিয়ের বাধা বা জেল কিছুই হবে না। এটুকু জানবার জন্যে উকিল স্ত্রীর কাছে ওপিনিয়নের দরকার নেই। সেদিন আমি তোমায় বলে উঠতে পারি নি, তুমিই সে সুযোগ দাও নি, আজ পরিষ্কার ভাষায় বলছি, তুমি যদি মনে কর তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন আছে, আমি তার রাস্তা তৈরি করে নেব। তোমায় এখুনি কিছু বলতে হবে না, ভেবে বলতে পার।'

অবন্তী হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'মেয়েদের মন আপনি খুব ভালো বোঝেন, না, আমি কি চাই, বা উশ্রী কি চাইতে পারে?'

'তা বলতে পারি না অবন্তী' অসহায় ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে ভাস্কর, অকপট স্বীকারোক্তি করে, 'তবে এটুকু তো বুঝি মেয়ে আর পুরুষে বন্ধুত্ব হতে পারে না, অন্তত তোমার আমার যে সম্পর্ক ছিল পরে তা নির্দোষ বন্ধুত্বে এসে দাঁড়ায় না। তুমি নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে সরিয়ে রেখেছ তাতে আমার মনের লোভ বেড়েছে বই কমে নি। তোমার তরফের কথা আমি জানি না। সত্যি বলতে তোমার শরীরের যত কাছাকাছি আমি যেতে পেরেছি, তার তুলনায় মনের কাছে ঘেঁষতে পারি নি। তবে আমি, উশ্রী আর তোমার দুজনের মাঝে রয়েছি বলে কোনোদিক থেকেই সুখী হতে পারি নি।'

ভাস্কর থামার পরও অবন্তী চুপ করে থাকে। বাইরে নিশ্চুপ নীরবতা সাক্ষী রেখে মনের গভীরে কি যেন ভাবছে সে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভাস্কর আবার বলে, 'হঠাৎ তুমি কেন আমায় শ্যামলের চিঠি দেখালে তা বুঝতে পারলাম না?'

'আমার বর্তমান পরিচয় আর পরিস্থিতি আপনার তো জানা দরকার?'
স্তিমিত গলায় যেন অপরাধিনীর মতো অবন্তী জবাব দেয়।
একান্ত সাদামাঠা, অনাগ্রহী ও সংক্ষিপ্তভাবে ভাস্কর বলে, 'বেশ, আমার কথাটা তাহলে ভেবে দেখো।' এবার সে যাবার জন্যে প্রস্তুত, কথাটা শেষ করেই উঠে দাঁড়ায়।
অবন্তী মৃদু ঘাড় নাড়ে, বলে, 'আচ্ছা।'
ভাস্কর চলে যায়, অবন্তী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, আজ আর তাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যায় না। সযত্নরক্ষিত শ্যামলের চিঠিখানা ভাস্করের হাতে ধরিয়ে দিয়ে একটামাত্র জিনিস দেখতে চেয়েছিল সে, তার অপমানদগ্ধ মুখ। কিন্তু তা দেখতে পায় নি বলে এক অদ্ভুত নৈরাশ্য।

২৪

পুরনো বার লাইব্রেরি, যেখানে শতাধিক বছরের বহু ঐতিহ্যময় স্মৃতি জড়ানো, আজ সেখান থেকে প্রায় তিনশ' গজ দূরে সিভিল কোর্ট সরে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ভাড়াটে ঘরে উকিলদের চেম্বারগুলোও আর সহজ আয়ত্তের মধ্যে সিভিল কোর্টকে পাবে না। পেয়াদা বাস্‌কী দুবে বা রামচন্দর সিং-এর আকাশ-দূরত্ব ব্যাপী মোর্কদমার পুকার শুনে এজলাসের দিকে মৃদু মন্থর পা বাড়ানোর দিন ফুরিয়ে গেল।
সিভিল কোর্ট স্যাণ্ডিস কম্পাউণ্ডে নবনির্মিত সৌধশ্রেণীতে স্থানান্তরিত। নতুন সিভিল কোর্ট বিলডিং তৈরি প্রয়োজন, কলকাতা হাইকোর্টের স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের আমলের এই প্রস্তাব সরকারিভাবে সমর্থিত হয়েছিল বিশ শতকের আদি অধ্যায়ে। তারপর বৃটিশ রাজশক্তির গায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিক প্রহার, সে পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে হাইকোর্টের গণ্ডি বিভাজন, ব্রিটিশ সুপ্রীম কোর্টের ন্যায়ের সূতিকাগারে পাটনা হাইকোর্টের জন্ম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আগষ্ট আন্দোলন, বিদেশী রাজশক্তির ক্ষমতা হস্তান্তর, চৈনিক যুদ্ধাভিযান, ইত্যাকার অজস্র বাধা-

বিঘ্ন পার হয়ে ষাটের দশকের দ্বিতীয় খণ্ডে এসে আদি প্রকল্পের সার্থক রূপদান।

উদ্‌ঘাটনীর সমারোহ পর্ব সারা জীবনে ভোলার নয়। অন্তত উশ্রীর তা চিরদিন মনে থাকবে।

স্থানীয় জুডিসিয়াল অফিসারদের দ্বারা গঠিত অভ্যর্থনা সমিতি। তাঁদের প্রধান ডিসট্রিকট্ অ্যাণ্ড সেসনস্ জজ। নতুন আদালতের মূল প্রবেশ-দ্বারে তিনি অন্যান্য হাকিম সমভিব্যাহারে অতিথিবর্গের প্রতীক্ষা করছেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আদালত ভবন উদ্বোধন করতে আসবেন হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি অনারেবল জাস্টিস শ্রীরামচন্দ্র অগ্রবাল। সেই অনুষ্ঠানে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট আমন্ত্রিত স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশনের উকিল সভ্যবৃন্দ। ডিভিশনাল কমিশনার, কালেক্টর, পুলিশের ডি আই. জি ইস্টার্ণ রেঞ্জ, এস. পি, সিভিল সার্জন ইত্যাদি বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের অফিসারবৃন্দও উপস্থিত।

নাথনগর কনস্টেবল ট্রেনিং স্কুলের গুর্খা ব্যাণ্ড পার্টি, পুলিশ লাইনের আর্মড পুলিশদল ও ঘোড়সওয়ার পুলিশের প্যারেড্, এই সমস্ত আয়োজনের মাঝে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ডিসট্রিকট্ জজ্, অতিরিক্ত জজ পাঁচজন, সাবজজ এবং অতিরিক্ত সাবজজ সাকুল্যে আটজন আর উনিশ-জন মুন্সিফ ও মুন্সিফ ম্যাজিসট্রেট। উপরন্তু সিভিল কোর্টের মিনিসট্রিয়াল স্টাফ, নাজির সেরেস্তাদার পেশকার কেরাণী পিওন ও পেয়াদা।

রূপোর কাঁচিতে সিল্কের ফিতে দ্বিখণ্ডিত করে সিভিল কোর্টের নতুন দোতলা সুবিশাল সুদীর্ঘ অট্টালিকার উদ্বোধন সম্পন্ন করার পর প্রধান বিচারপতি সদলে ঘাস বেছানো বিস্তীর্ণ লনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর আর্মড ও মাউনটেড্ পুলিশের প্যারেড্ পরিচালনা করলেন পুলিশের ডি. আই. জি, অভিবাদন গ্রহণ করলেন প্রধান বিচারপতি।

প্রায় পাঁচশ চেয়ারের আয়োজন। সবাই বসে, শুধুমাত্র জুডিসিয়াল অফিসারবর্গ অতিথিদের সুখসুবিধে পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। এই সমাবেশে উশ্রীই একমেব দ্বিতীয়ম মহিলা। এক ধরনের সংকোচের দরুন সে একপাশে দাঁড়িয়ে, বসতে পারে নি। ব্যগ্র অথচ অন্যমনস্ক চোখে

অনুষ্ঠান দেখছে।

'আপনি বসেন নি কেন মিসেস মুখার্জি, ঐ তো খালি চেয়ার, বসুন !' পরিচিত এবং অত্যন্ত মার্জিত সৌজন্যমূলক কণ্ঠস্বর শুনে উশ্রী সচকিতে ডান পাশে তাকায়, জজসাহেব মিস্টার এ. কে. মুখার্জি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। খবর পাওয়া গেছে খুব শিগ্‌গিরই তিনি ডিসট্রিক্ট্ লেভল্ থেকে হাইকোর্ট বেঞ্চে চলে যাচ্ছেন।

উশ্রী লজ্জিত হয়ে জবাব খোঁজে, তারপর বলে, 'আপনারাও তো স্যার দাঁড়িয়ে রয়েছেন ?'

'সে কি কথা ?' এ. কে. মুখার্জি উত্তর দেন, 'আজ কি আমাদের পক্ষে বসা চলে ! আপনারা মহান অতিথি, আমরা আপনাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছি। না, এখানে নয়, আপনি আরও সামনের দিকে চলুন, ওখানেও জায়গা খালি রয়েছে। তার আগে চীফের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দি।

উশ্রীর দুটি পা যেন দ্বিধাভারে ভারি হয়ে যায়, তবু সে আর মৌখিক আপত্তি তুলতে পারে না।

ডিসট্রিকট্ জজ এ. কে. মুখার্জির সঙ্গে উশ্রী এসে চীফজাস্টিসের সামনে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল, তারপর যুগল হাতের যুগ্ম পাতা বুকের কাছে তুলে মৃদু স্বরে বলল, 'নমস্কার স্যার।' বলেই বুকটা ধড়াস করে উঠল তার, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, সম্বোধনে ভুল হয়ে যায় নি তো ? হয়তো বলা উচিত ছিল, মিলর্ড !

উশ্রীর নমস্কারের বিনিময়ে চীফ জাস্টিস মৃদু হেসে নমস্কার করলেন, তারপর বললেন, 'আপনাকে দেখে আমার গর্ববোধ হচ্ছে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়, কারণ আমি এই জেলারই মানুষ। উকিল আর হাকিমদের সমর্থন সহযোগিতা পাচ্ছেন তো ? ডিসট্রিকট্ জজ কতদিন আগে আপনার নাম বলেছিলেন, দেখুন আমার মনে আছে !'

উশ্রী উত্তর দেওয়ার আগে এ. কে. মুখার্জি বললেন, 'ওকালতিতে ইনি ক্রমশই বেশ উন্নতি করছেন।'

এ. কে. মুখার্জির স্যার সম্বোধন শুনে উশ্রীর বুকের মধ্যেটা আশ্বস্ত হয়, আদালতের বাইরে প্রধান বিচারপতিকে স্যার সম্বোধন অনুচিত অথবা

অবৈধ নয় তাহলে।
'হবেই তো' চীফ উত্তর দেন, 'আমার ভগ্নীকে দেখেই আপনি অনুমান করতে পারেন এ জেলা কতখানি প্রগতিশীল আর উন্নত।' তারপর কথার শেষে উশ্রীকে দেখান তিনি, এবং তাকেই বলেন, 'আমি আশা করব ব্যবহারজীবী হিসেবে নিজের মানমর্যাদা আপনি আপ্রাণ চেষ্টায় রক্ষা করবেন।'
মুখে ক্ষীণ স্মিত হাসি, বুকে সীমাহীন পুলক, উশ্রী মৃদু ঘাড় নাড়ে।
'Your Lordship,' এ. কে. মুখার্জি সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেন, 'আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এ জায়গায় একটা কথা বলতে চাই।'
'বলুন ?' চীফের দৃষ্টিতে সম্মতিপূর্ণ জিজ্ঞাসা।
'আপনার ঐ মূল্যবান উপদেশের সঙ্গে এটিও যোগ করা যেতে পারে—সেইসঙ্গে ব্যবহারজীবীদের স্বাধীনতা রক্ষার কথাটাও ?'
চীফ জাস্টিস যেন কথাটা লুফে নেন, 'অবশ্যই ! ওকালতি স্বাধীন পেশার সবচেয়ে বড় প্রতীক। নিজের অধিকারের সুপ্রসারিত ক্ষেত্র সম্বন্ধে উকিল যদি সচেতন না থাকেন ন্যায় বিচারের ধারা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। আমরা ভুল করতে পারি, উকিলদের কর্তব্য আইনের যথার্থ নির্দেশ দিয়ে আমাদের সে ত্রুটি দূর করে দেওয়া। আইনের উদ্দেশ্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া নয়, মানুষের সমাজে যাতে সুস্থ নাগরিকত্ব বজায় থাকে সেইজন্যেই আইন। আমাদের ব্যক্তি জীবনের আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ, এ হলো উকিলদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে চিন্তার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য ও নিজের অধিকার সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান সর্বদাই রাখতে হবে। This is the most pious obligation to society ; সমাজের প্রতি সবচেয়ে পবিত্র কর্তব্য। স্বাধীনতার চেয়ে বড় জিনিস কিছু নেই, উকিলরা সে বিষয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় সহায়ক, তাই বলা হয় নোবল্ প্রফেসন। মহৎ জীবিকা। মিসেস মুখার্জি, আপনারা স্বাধীন, আইন আদালতের মর্যাদা রক্ষার বিশেষ দায়দায়িত্ব আপনাদেরই।'
মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ সায় দিয়েও উশ্রী চুপ করে থাকে।

এ.কে. মুখার্জি বললেন, 'চলুন, আপনাকে একটা ভালো জায়গা দেখে বসিয়ে দি, এরপর আমাদের পক্ষ থেকে যৎসামান্য জলযোগের আয়োজন।' এ. কে. মুখার্জির সযত্ন নির্দেশিত চেয়ারে গিয়ে উশ্রী বসল। তার মনে হলো আজকের অনুষ্ঠানে এটি যেন সর্বাধিক উচ্চাসন।

২৫

ইংরেজ শাসনের মূল কৌশল বিভাজন সৃষ্টি। এক গোত্রে পাঁচ উপ-গোত্র। বার-এও অন্যথা নেই। ব্যারিস্টার, অ্যাডভোকেট, সে যুগের ভকীল, প্লিডার, যার বর্তমান অর্থ উকিল, আর মোক্তার। পাঁচ সিঁড়ির অধিবক্তা। অধিকারে এক এক ডিগ্রির তারতম্য, পোশাকে ঈষৎ ব্যবধান, মর্যাদা এবং দক্ষিণার পরিমাপ বিভিন্ন। কিন্তু এর প্রধান যা লক্ষ্য; বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অন্তর্বিদ্বেষ সৃষ্টি, তা এই বিচ্ছিন্নকরণের নীতিতেই পূর্ণ।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ এখন, মানুষের সমাজে শ্রেণীগত ব্যবধানের বিলোপ সাধন প্রধানতম সাংবিধানিক নীতি। আসমুদ্রহিমাচল ব্যাপী আইনের ক্ষেত্র, দিল্লীর সুপ্রীম কোর্ট থেকে অজ পল্লীগ্রামের মহকুমা আদালত, ওদিকে ভারতভুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর এক পর্যায়ের অধিবক্তা, একটিমাত্র পরিচিতি, অ্যাডভোকেট। ব্যারিস্টার প্লিডার মোক্তার যারা আছে তারা আছে, নতুন হিসেবে প্রবেশাধিকার শুধুমাত্র অ্যাডভোকেটের। ইউনিয়ান বার কাউন্সিল ও স্টেট বার কাউন্সিলই ওকালতি করার সনদ দানে একমাত্র অধিকারী।

এখন আর সরকারি খাজনায় বারোশ'টাকা স্ট্যাম্প ডিউটি দিয়ে অ্যাডভোকেটসীপের ঔচিত্যপত্র সংগ্রহ নয়। আইনের স্নাতক পরীক্ষা পাস-না-করা মোক্তার পর্যন্ত মাত্র আড়াইশ'টাকা স্টেট বার কাউন্সিল ফী জমা করে অ্যাডভোকেট হিসেবে ওকালতি করার অধিকার অর্জন করতে পারে। সিভিল কোর্ট আর হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে ইওর অনার অথবা ইওর লর্ডসীপ সম্ভাষণে বিচারক কিংবা বিচারপতিকে সম্বোধন

করায় কোনো বাধা নেই তার।

Independent and uniform bar ; ওকালতি স্বাধীন এবং সমগোত্রীয় ব্যবহারজীবীর জীবিকা। উকিলের অসদাচরণের প্রাথমিক বিচারক বার কাউন্সিল। তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ তুলতে হলে বার কাউন্সিলের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটের অধীনে একবছর আর্টিকেলসীপ নয়, প্লিডার হিসেবে জেলা আদালতে তিনবছর ওকালতিও অনাবশ্যক, সরকারি খাজনায় বারোশ' টাকার স্ট্যাম্প জমা করার প্রশ্ন নেই, আড়াইশ' টাকার বিনিময়ে উশ্রী স্টেট বার কাউন্সিলের সনদ-প্রদত্ত অ্যাডভোকেট। অবশ্য এর ফলে জেলা আদালতের উকিল হিসেবে তার যে পূর্বেকার অধিকার তা কিছুমাত্র বিস্তৃতি লাভ করে নি। পোশাকেও কিঞ্চিৎ তারতম্য। আগেকার মতো সেই সাদা ব্লাউজ, কালো শাড়ি, কালো গাউন। গাউনে একটু হেরফের। ঈষৎ লম্বিত ঢোলা হাতায় দুটি করে নিষ্প্রয়োজন বোতাম আঁটা। হাইকলার ব্লাউজের গলায় ঝোলানো সাদা ছোট দো-ফিতে। অ্যাডভোকেটস্ ব্যাণ্ড। সম্প্রতি মাদ্রাজ হাইকোর্ট নাকি গাউন ও আদালতকে সম্ভাষণ করার চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। আর ইওর অনার বা ইওর লর্ডসীপ নয়, মার্কিনী পদ্ধতিতে সাদামাঠা সম্ভাষণ, মিস্টার জাজ!

যা হোক ইউনিফর্ম বার স্থাপনার পর আসল পরিবর্তন এবং জেল্লা মোক্তার সম্প্রদায়ের মধ্যে। গায়ে কালো টেরিকটনের কোট, গলায় প্লাস্টিক-পালিশ স্থুলম্বিত ব্যাণ্ড, আর এজলাসের বাইরে ও চায়ের ক্যান্টিনে পর্যন্ত সদানিয়ত কৃষ্ণবর্ণ আর্টসিল্ক গাউনের ঝলকানি। তাদের অধিকারের জগত সুবিস্তৃত। দেওয়ানী মোকর্দমায় ওকালতনামা দাখিল করে সিভিল কোর্টের প্রতিপক্ষ উকিলের পাশে দাঁড়িয়ে আইনের মাত্রা ছাড়ানো খেয়ালখুশিপূর্ণ সওয়াল তোলা, এবং বিপাকে পড়লেই প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে, উৎকট চিৎকারে নট সাইড বাই সাইড, প্রতিবাদ জানানো। স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের প্রাথমিক স্বাদ যেভাবে গ্রহণ করার রীতি, এক্ষেত্রে তার বিশেষ অন্যথা নেই।

তবে বনেদী আমলের মোক্তারকুল জমিদারি প্রথার মতোই বিলুপ্তির পথে। সংখ্যাবৃদ্ধি অথবা শূন্যস্থান পূরণের সম্ভাবনা নেই আর। মোক্তার খানার দেওয়ালের গায়ে নতুন পেণ্ট করা অ্যাডভোকেটস্ অ্যাসোসিয়েশনের সাইনবোর্ড। বর্তমানে গোত্র বা জাতে আর কোনো তারতম্য না থাকলেও বার অ্যাসোসিয়েশন আজও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, উশ্রী যেখানে একমাত্র মহিলা সভ্যা।

শুধু বড় মোকর্দমাতেই উশ্রী পরেশ বসুর সঙ্গে জুনিয়ার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায়, নয়তো দেওয়ানী হোক অথবা ফৌজদারী, একাই তাকে নৌকো বেয়ে আইনের জটিল ও কুটিল পারাবার পাড়ি দিতে হয়। পরেশ বসুর আরও তিনজন জুনিয়ার। দু'জন আগে থেকেই ছিল, একটি আবির্ভাব সম্প্রতি। তাদের সম্বন্ধেও তাঁর এক নীতি, একই প্রশ্রয় —আমার মৃত্যু বা অবসরের পর তোমাদের যেন দুঃস্থ বিধবার মতো পিতৃগৃহে ফিরে যেতে না হয়।

তবু কখনো কখনো দেওয়ানী বিধি বিধানের সাগর মন্থন করতে গিয়ে উশ্রী হাঁফিয়ে ওঠে। প্রয়োজনীয় আইন সম্বন্ধে উপযুক্ত হাইকোর্ট-নজির খুঁজে পায় না। মনে হয় এই মোকর্দমার একক দায়িত্ব নিয়ে সে যেন নিঃসম্বল আবর্তে গিয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত অসহায় দৃষ্টিতে কর্মরত পরেশ বসুর দিকে তাকিয়ে থেকে সংকুচিত কণ্ঠস্বরে বলে, 'ধারা এগারোর-ক বিহার বিলডিংস্ অ্যাক্টে আইনত দেয় শেষ ন্যায্য ভাড়ার ওপর একটাও তো আমাদের স্বপক্ষীয় নজির পাওয়া যাচ্ছে না?'

অগাধ কর্মসমুদ্রে নিমজ্জিত পরেশ বসু সুমুখে স্তূপীকৃত নথিপত্রের বুক থেকে মুখ তোলেন, এবং তারপর দরাজ হেসে উত্তর দেন, 'বিশুদ্ধ আইন চিরদিনই জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতন, উচ্চ আর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অতি-সূক্ষ্ম বিচারে কভু অ্যাঁ হয়, কভুবা অঁ হয়।'

পরেশ বসুর ভঙ্গি দেখে উশ্রী হাসে।

এবার পরেশ বসু কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য ধারণ করেন, বলেন, 'নজির খোঁজো, খুঁজে দেখ, পেয়ে যাবে। হি নোজ ল, হু নোজ হোয়্যার টু ফাইণ্ড ইট

আউট। সে-ই সবচেয়ে বড় আইনজ্ঞ যে কখনো অনুসন্ধানে বিরত হয় না, বুঝলে? এই যে আমাদের বার লাইব্রেরির হেড বেয়ারা ঈশাক মিঞা, অকাট মূর্খ, কিন্তু লক্ষ্য করেছ কি, রায়বাহাদুর সুরজিৎ সিংহ পর্যন্ত তার সঙ্গে বই-এর বিষয় আলোচনা করেন? ঈশাকের অবশ্য আইনজ্ঞান নেই, কিন্তু কোন্ আইন কোথায় আছে, তা সে আমাদের চেয়ে ঢের ভালো জানে। লাইব্রেরিয়ান সুনীল সোমটিকেও কম ভেব না। হাজার হাজার বই-এর গন্ধ শুঁকে রীতিমতো আইনবিদ হয়ে উঠেছে। তারওপর বাপ ছেলে মিলিয়ে শতাধিক বছরের অভিজ্ঞতা, তাও কম নয়। তিনকড়ি সোম বলতেন, ভাগলপুর কাছারিতে মোকর্দমা লড়তে এসে লর্ড এস. পি. সিংহ তাঁকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করতেন, আচ্ছা, অমুক আইন সম্বন্ধে কার বই সবচেয়ে ভালো বলুন তো, আমার এই পয়েন্ট, ফুল সাপোর্ট কোথায় পাব? ওদিকে বিপক্ষের উকিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসেরও একই প্রশ্ন। দু-পক্ষেরই হাতের কাছে এই উপযুক্ত বই এগিয়ে দিতেন তিনকড়ি সোম। ওদের কথা তো আলাদা, কিন্তু মূর্খ ঈশাক—'

উশ্রী মাঝপথে বলে ওঠে, 'সত্যি, ঈশাককে দেখলে আশ্চর্য বোধহয়।'

স্বভাবসুলভ রসিকতা করেন পরেশ বসু, 'নেহাত উইপোকা কথা বলে না, নয়তো বার লাইব্রেরির প্রতিটি র‍্যাকে যত উইপোকা, তাদের যে কোনোটার পাণ্ডিত্য ঈশাকের চেয়ে বেশি। তারা তো শুধু আইন আর নজির দর্শন করছে না, পরিতৃপ্ত চিত্তে ভক্ষণও করছে, বুক কমিটির নিরীহ সভ্যরা বাধা দেয় না।'

পরেশ বসুর রসিকতায় উশ্রী প্রথমটা হেসে ফেলে, তারপর সখেদে বলে, 'দেখাশোনার অভাবে আমাদের কত দামী দামী বই যে নষ্ট হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, দু'শ বছরের ট্র্যাডিশান, দুটি পরিপূর্ণ শতাব্দীর বিধিজগতের ঐতিহ্য। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ভাগলপুরের কালেক্টার লুসিংটন, কমিশনার বিড্ওয়েল, তারপর কালেকটরেটের প্রধান সেরেস্তাদার রাজা রামমোহন রায়—সেই যুগের বার লাইব্রেরি আজ যেন উইপোকার দয়ানির্ভর হয়ে পড়েছে।' সিগারেট ধরালেন পরেশ বসু, তারপর সিগারেটসুদ্ধ হাতে

মোকর্দমার নথির পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলেন, কাগজের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, যেন আগুন লেগেছে।

পরেশ বসুর বাড়ির অফিসে উশ্রীর হাজির হওয়ার অধিকার সপ্তায় তিন দিন। রবিবার বাদ দিয়ে একদিন অন্তর। বাকি মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনি-বার সে নিজের অফিসে বসে। এবং সন্ধ্যের দিকে প্রায় প্রতিদিনই।

উশ্রীর অফিসে আসবাব ও বইপত্র পরেশ বসুর অফিসের চেয়ে বেশি তো কম নয়। উপরন্তু তার এই সাজানো গৃহস্থলীর মতো উকিলের দপ্তর দু'তিনটির বেশি নেই। সাবেকী আমলের বাড়িতে স্থানপ্রাচুর্য, সেখানে ধীরেন গুপ্তর পুরো অফিসটাই উঠে এসেছে। দুটি ল-জার্নাল নিয়মিত নিয়ে চলেছে সে, মাঝে মাঝে দামী বইও কেনে। বই সংগ্রহের স্পৃহাও তার আন্তরিক।

উশ্রীর মনে হয় ধীরেন গুপ্তর অভাবিত দাক্ষিণ্য না পেলে আজ সে-ও কি উকিল অভয়চরণ মিত্রের মতো ঝুঠো অফিস সাজিয়ে বসত? দু-চারটি কেরাসিন কাঠের র‍্যাক ভর্তি বাঁধানো বাংলা পত্রিকা, বঙ্গদর্শন প্রবাসী আর ভারতবর্ষ। এবং কিছু গুপ্তপ্রেস ও পি. এম. বাগচীর মোটা পঞ্জিকা। টেবিলের ওপর অবশ্য কয়েকটি বাতিল আইনের বই, মেয়াদ পার হয়ে যাওয়া ওষুধের মতোই যার ব্যবহারের ফল হয় নিরর্থক, নয় দারুণ ভয়াবহ। এই নিয়েই ভদ্রলোক সারাটা জীবন কাটিয়ে গেলেন। সম্প্রতি অসহায় মানুষদের প্রবঞ্চিত করার লীলা সাঙ্গ করে তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন।

উশ্রী তাঁকে দেখেছে, তাঁর অপূর্ব ইংরেজি ভাষার আর্গুমেন্ট শুনেছে, হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে খুব চটপট আইনের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। অথচ বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে একটি দশটাকার নোট কোটের পকেটে গিয়ে পড়লেই সেই আজন্মকাল সাহেবী স্কুল কলেজে পড়া, আইন পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত উকিল অভয়চরণ অত্যন্ত নিপুণ কসাই-এর মতো নিজের দরিদ্র অশিক্ষিত মক্কেলের গলায় ছুরি চালিয়ে দিয়েছেন। অভয়চরণের দৈন্য ও দুঃখ ইহজীবনে ঘোচে নি।

অ্যাডভোকেট চিন্ময় ঘোষ মাঝে মাঝে কথা প্রসঙ্গে অভয়চরণের কথা

বলেন। সুখ-দুঃখ মিশ্রিত স্মৃতিকথা। 'কোর্টে আসার পর যখন হালভাঙা নৌকোর মতন ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি সেই সময় মাঝেমধ্যে অভয়বাবুর জুনিয়ারি করেছি। তিনি তখন অ্যাসিস্টেন্ট পাব্লিক প্রসিকু্যটার। সরকার পক্ষের সাক্ষীদের নিয়ে সকালে বাড়িতে অফিস করতে বসেছেন। যার বাড়িতে খুন, তাকে বললেন, এ মোকর্দমায় খুব মেহনত করতে হবে, নয় তো ঝুঠো মামলা করার দায়ে তোমার জেল হয়ে যাবে, দফা দু'শ এগারো পিনাল কোড্—দোষীর শাস্তি হওয়া তো দূর অস্ত্! দাও, আমার জুনিয়ারকে তাড়াতাড়ি পঁচিশ টাকা ফী দাও, খুব খাটছে বেচারা, দিনরাত্তির জ্ঞান নেই।

এ ওষুধের পর টাকা বেরুতে দেরি হয় না। পঁচিশটা টাকা আমার হাতে এসে পড়ার পর অভয়বাবু সাক্ষীকে বলতেন, এবার তোমরা বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসো, আমাদের আইন আলোচনা আরম্ভ হবে। আলমারিতে সাজানো মোটা বইগুলোর দিকে চেয়ে অভয়বাবু আঙুল তুলে দেখাতেন।

ঘর মুহূর্তের মধ্যে খালি। অভয়বাবুর আর তর্ সইত না, বলতেন, তাড়াতাড়ি সাড়ে বারো টাকা বার কর চিনু, আমার ফিফটি পারসেণ্ট কমিশন, আধুলি না থাকে পুরো তেরোটাই দে।

কোর্টে কাজ করার পর অভয়বাবু আবার সন্ধ্যের দিকে বাড়িতে হানা দিতেন, হাতে বাজারের থলে, গোটাদশ টাকা ধরে দে তো চিনু, নয়তো কাল সকালে বাড়িতে আর হাঁড়ি চড়বে না। কাল যখন পার্টি তোর ফী দেবে আমার কমিশন থেকে এ্যাড্জাস্ট করে নিস্।

টাকা নিয়ে তবে অভয়বাবু উঠতেন, এবং সেই রাতেই পরের দিনের জন্যে অন্য জুনিয়ার শিকার করে বাড়ি ফিরতেন। আমার আর ডাক পড়ত না। অভয়বাবুর একটা গুণ ছিল, অতি বিশ্বস্তভাবে মিথ্যে কথা বলতে পারতেন তিনি।'

উশ্রীর ধারণা, বস্তুত অভয়চরণের মতো মানুষগুলির জাতই ভিন্ন। তারা সর্বত্রই সমান, নিজের জীবিকা ও পেশাকে কখনো শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না। জীবনের প্রতি পদে ধূর্তামি ও শঠতা তাদের নিজেদেরই চিরদিন

প্রবঞ্চিত করে রাখে। অপযশ এবং দারিদ্রের কলঙ্কভূষণ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অতিবিশ্বস্ত অর্ধাঙ্গিনীর মতো সর্বাঙ্গ জড়িয়ে থাকে।
নিজের সম্বন্ধে জীবিকার এ পদ্ধতি উশ্রী কল্পনা করতে পারে না। তেমন প্রবৃত্তি এলে মৃত্যুই অধিকতর কাম্য মনে হবে তার। অথবা আদালতের সংস্রব চিরদিনের মতো ত্যাগ করবে।

২৬

মাসের শেষ শনিবার। ক্লিয়ারেন্স ডে। সিভিল কোর্টের এজলাসে দেওয়ানী মোকর্দমার শুনানী হয় না। চেম্বারে বসে হাকিমরা মাসিক বাকি-বকেয়া কাজকর্ম সারেন। অখণ্ড আড্ডারও অবসর।
দু-একটা ছোটখাট কাজ উশ্রীর আজ যা আছে, মুন্সিফ ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে, তা-ও প্রথম সিটিং-এ নয়, বেলা দুটোর পর।
উশ্রীর বাড়ির অফিস আজ খালি। ফৌজদারীর মক্কেলরা কাছারিতেই দেখা করবে। শুধু কাঠ-গাঁ থেকে মক্কেল নাথুলাল তেওয়ারির আসার কথা। সে পৌঁছতে বেলা সাড়ে ন'টা, কারণ সরকারি পরিবহনের বাস সওয়া ন'টার আগে আসে না। সোমবার সাবজজ কোর্টে নাথুলালের রিসিভার ম্যাটারের শুনানী। পরেশ বসুই ম্যুভ করবেন, উশ্রী জুনিয়ার। মক্কেল যাতে উকিলের বাড়ি চিনে যাওয়া-আসায় অভ্যস্ত হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি নাথুলালকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ-গুলি জুনিয়ারকে দিয়ে করানোর পর সে যেন তাঁর বাড়ি যায়। উশ্রীর অফিসে প্রায়ই আসে নাথুলাল।
এখন অফিসে শুধু উশ্রী আর তার বৃদ্ধ মুহুরী সুচিতপ্রসাদ ঘোষ। সুচিতপ্রসাদ বর্ণে বাঙালী, কৃষ্টি-আচরণে দেশওয়ালী। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, আদি নিবাস জেলা মুর্শিদাবাদ। জমিদার এবং জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী রূপে এদের বিহারে আগমন দিল্লির আকবর বাদশার আমল থেকে। বাদশাহী পাঞ্জা ও জমিদারির পরওয়ানা পাট্টা অনেক পরিবারেই আজ পর্যন্ত সযত্নে রক্ষিত। এ সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণও আছে। বিহারে মূল

নিবাস ভাগলপুর পূর্ণিয়া আর মুজঃফরপুর জেলা ! কোর্ট কাছারির মুহুরী বলতে অধিকাংশই রাঢ়ী কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ।

সুচিতপ্রসাদকে পরেশ বসুই জুটিয়ে দিয়েছেন। জাতে মুহুরী, পেশায় ভাড়াটে সাক্ষী। কোনো ঘটনায় সাক্ষ্য দেয় না, কাগজপত্রের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যেই তার ডাক পড়ে। কাছারির যে কোনো মোকর্দমায় একটি পক্ষের সাক্ষী সুচিতপ্রসাদ। তার ভাষায়, 'আমার নাম সুচিত-প্রসাদ আছে, সাথে সাথ ঘোষ ভী আছে। আমার বাবা বোংলা পঢ়িয়ে লিতে পারতেন। আমি পিওর বোংগালী।'

অশীতিপর বৃদ্ধ সুচিতপ্রসাদ অফিসঘরের মধ্যে মুহুরীর তক্তাপোশে বসে ঝিমুচ্ছে, অবসর-উপভোগী উশ্রী তাকে ডাকল, 'আচ্ছা সুচিতবাবু, আপনি ভালো বাংলা বলতে পারেন না কেন, অনেক রাঢ়ী কায়স্থ আর ব্রাহ্মণ তো পুরোপুরি বাঙালী !'

সুচিতপ্রসাদ হাই তোলে, তারপর আকাশের দিকে হাত তুলে তিনবার তুড়ি বাজায়, 'ওরা ভিন্ কেলাসের রাঢ়ী দিদি।'

'ভিন্ কেলাস মানে ?' উশ্রীর চোখে-মুখে কৌতুক চাপা জিজ্ঞাসা।

উশ্রীর ভঙ্গিমা বৃদ্ধ সুচিতলালের মোটা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, সে উত্তর স্বরূপ কথা বলে যায়, 'রাঢ়ী দো কেলাস', সুচিতপ্রসাদ মুখের মধ্যে এক টুকরো তামাক পাতা ফেলে, 'নেয়ে-রাঢ়ী আউর রেলে-রাঢ়ী। নেয়ে রাঢ়ীলোগ বোংগাল থেকে নায়ে চড়ে বিহারে এসেছে পাঁচশ' সাল আগে। রেলে-রাঢ়ী আসছে শ'-পচাশ বরষ। আংরেজ জমানায়, কিলার্ক বোকীল ডাক্তার—টিরেনে চড়ে। এরা শহরে বসল, গাঁ গেলো না। কাছারিতে যোতো মুহুরীল সব নেয়ে-রাঢ়ী আউর দেশওয়ালী লালা কায়েস্ত। মুহুরীলেশী বোড়ো হার্ড কাম দিদি। খচ্চর মক্কেলদের সাদা-সিধা ঘোড়া বানাতে খুব মেহনত লাগসে। নেয়ে-রাঢ়ী আউর খেজুরিয়া লালাদের সমান ধুরন্ধর জাত হোল বিহারের কোর্ট-কাছারিতে নেই মিলবে।'

'খেজুরিয়া লালা আবার কি বস্তু ?' উশ্রী এবার স্বতঃ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে।

বয়সের দোষে নয়, সুদীর্ঘ কিছু বলার সময় ঈষৎ দুলে দুলে কথা বলে সুচিতপ্রসাদ, এখনো অনুরূপভাবে আরম্ভ করল, 'লালা ভী দো কিলাস দিদি, কলমীয়া আউর খেজুরিয়া। খেজুরিয়ালোগ সাঁঝবেরায় তাড়ি-উড়ি পিয়ে চৌরাহায় খাড়া হয়ে গালিগোপ্তা করে। লেকিন দালালি আউর মুহুরীলেশীমে খুব এসপার্ট। জাহাজ ঘাট আর রেলটিশন থেকে আসামী পাকড়ে উকিলের পাশ লিয়ে গিয়ে বোলে, আমার উকিলসাব হারমুনিয়া মোতো বহস করতেছে, বহস শুনে হাকিম নাচ শুরু করিয়ে দেয়, উসকে বাদ খুশি মনে মোক্কিলের ডিক্রি দস্তখত করে। খুনের আসামী রেহা হোয়।'

হাসতে গিয়ে উশ্রী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, সেইভাবেই প্রশ্ন করে, 'তার-পর মক্কেলের ভাগ্য ?'

'আর কি দিদি, ঐ হারমুনিয়া-রং বহস শুনে আসামীর মারপিটের মামুলি তিনশ' তেইশ দফার কেস খুনের তিনশ'দু দফায় চার্জ হইয়ে যায়। উকিল বোলে, যা বেটা তোর লাক্ ভাল আসচে, এক বিশ এক দফা কমিয়ে গেলো। কারুলাল দালাল খেজুরিয়া লালা, কোমপাল-সারি রিটায়ারমেণ্টবালা হাকিম দ্বারকাপ্রসাদ শরণের প্র্যাকটিশ কেমন জোর চলিয়ে দিয়েছে। জ্যেঠ মহিনার কাঁঠাল গাছের মতুন তার ডাইনে বাঁয়ে হরবকত মোক্কিল ঝুলতেছে। কারুলাল গুড ক্যাচার !'

দ্বারকাপ্রসাদ শরণ দু'বছর আগে এখানেই মুন্সিফ ছিলেন, অযোগ্যতার দরুন প্রৌঢ় বয়েস পর্যন্ত প্রমোশন হয় নি। সাক্ষীর এজাহার লেখার সময় সাদা কাগজের ওপর দূর থেকে কলম ঘুরিয়ে যেতেন, কাগজে কালির আঁচড় ফুটত না। কখনো কখনো নিজের খুশি মতো লিখতেন যা হোক কিছু। উকিলের দিক থেকে প্রতিবাদ উঠলে তাকেই মিথ্যে-বাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা। অন্য অপযশও ছিল, যা খরচের বহর তাতে শুধুমাত্র মুন্সেফির বেতনে কুলোয় না। গভর্নমেণ্টের নির্দেশে বছর দেড় আগে বাধ্যতামূলক ভাবে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি। তারপর গলায় বার কাউন্সিল প্রদত্ত সনদ ও দো-ফিতে ব্যাণ্ড ঝুলিয়ে বটতলার অ্যাড-ভোকেট রূপে পুনরাগমন। কারু দালাল আর দ্বারকা শরণ এখন

অভিন্নাত্মা।

যতদিন গদীতে ছিলেন মুহুরী তো দূরের কথা উকিলদের সবিনয় জিজ্ঞাসার পর্যন্ত জবাব দিতেন না দ্বারকাপ্রসাদ। অনেক সময় অবজ্ঞা দেখাবার উদ্দেশ্যে পেশকার অথবা চাপরাশিকে বলতেন, 'উকিল সাহেবকে বলে দাও এক ঘণ্টা পরে আসতে, এখন আমার দরখাস্ত শোনার সময় নেই।' হয়তো এ সময়টা সম্পূর্ণ অনুচিত অবসর ভোগ করছেন তিনি। উন্নত আদালতে বসে চেয়ারের পিঠে যথাসাধ্য গা হেলিয়ে টেবিলের নিচে দু-পা সুপ্রসারিত, কলমের বাঁটের আধখানা কানে গুঁজে সুড়সুড়ি গ্রহণে মগ্ন!

'আচ্ছা সুচিতবাবু, আপনি কখনো দালালি করেন নি? উশ্রী তাকে প্রশ্ন করে।

'নঁহী নঁহী', সজোরে ঘাড় নাড়ে সুচিতপ্রসাদ, 'আমি তিশ বরসের ভিতরে এ জিলায় আঠারোঠো জমিন্দারি ইসটেটে নৌকরী করিয়েছি, জিলার সব নায়ের—গোমস্তার হরফ পহচান করি, দু-চার লাখ আদমিকে জানি। আমি সীর্ফ হ্যাণ্ডরাংটিং পুরুভ কোরে। ফ্যাকট পর ঝুঠা গোবাহী নঁহী দিবে। হামি পচাশ হাজার কেস-এ গোবাহী দিয়েছে। ছোটা-মোটা বোকীলের মোহরীলাই করিয়েছে। পোরেশবাবু বললেন, সুচিত-বাবু বোকীল দিদির মোহরীলাই কোরো, ইসিলিয়ে কোরতেসে। এইটটি-সেভুন সাল উমর হামার কমপ্লিট হোইসে দিদি, অব তো ভগবানের ইজলাসে হামার কেস পুকার হোইছে। বোকীলী পেশা বড় ইজ্জৎ কা পেশা দিদি, লেকিন ইজ্জৎ আপনা হাত; রাখখো য়্যা ফেকো!'

'তা তো ঠিকই!' সমর্থনসূচক ছোট্ট মন্তব্য করে উশ্রী।

সুচিতপ্রসাদ ঘাড় নেড়ে খেদ ব্যক্ত করে, 'লেকিন অব জমানা চেঞ্জ হো গয়া হ্যায়। অভি তো হাকিম বোকীল আউর মোকীল সব বরাবর। কোই কিসিকা ইজ্জৎ নঁহী রাখে। ওকালত খানা না চীনা পট্টির চণ্ডু খানা! অভি ওকালত খানায় বোকীলকে পাশ কুরসিতে টাং তুলে বৈঠে মোকিল আঁখ মুদে দিনাই নোচে। আমি কমসে কম সত্তর সাল কাছারি দেখিয়েসে। উস্ জমানায় বোকীলকা ইজ্জৎ ইস জমানার লাট-

সাহেবসে ভি বেশি থা। ই ভাগলপুর কাছারিতে রাজা রামমোহন রায় মামুলী সিরেস্তাদার কা নৌকরী করিয়েসে। তো বুঝেন দিদি, উস্ দিন বোকীল কোতো বোড়ো থা, আউর হাকিম উসসে ভি কোতো বোড়ো! অভি বোকীল বোলনেসে পাবলিক হাসি কোরে।'

সুচিতপ্রসাদের উক্তি উশ্রীর নিজের চিন্তার কাছাকাছি ঘুরছে, এ আর ভালো লাগে না তার। যুগ অবশ্যই পরিবর্তনের, সামাজিক সাম্যের, কিন্তু তবু মনে হয় সর্ব পর্যায়ে এতখানি নৈকট্য, ভ্রাতৃত্ব আইনের ক্ষেত্রে, ন্যায়ের ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট করেছে। ইতিপূর্বে হয়তো কোনো কোনো জায়গায় উকিল আর হাকিমের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যতা-বন্ধুত্বের ফলে সুবিচারের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়েছে, আজকাল তা নৈমিত্তিক দৃষ্টান্ত। উশ্রীও প্রায়ই অনুভব করেছে বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল যদি হাকিমের বিশিষ্ট বন্ধু অথবা স্বজাতি না হতো তাহলে এত ভালো মোকর্দমাতে এমন নির্মম পরাজয় ঘটত না তার। আজকালকার মক্কেলরাও সেই উকিলের সন্ধান করে যে হাকিমের দোস্ত অথবা স্বজাতি—কুটুম্ব। এ নির্বাচনে আশানুরূপ ফল হয়তো সর্বত্র পাওয়া যায় না, কিন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টা একেবারে বিফলও নয়।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পুংখানুপুংখ চিন্তায় উশ্রীর মনের ভেতরটা অস্বস্তি-জনক উত্তেজনায় ভারি হয়ে উঠেছিল, সে ভাব কাটাবার জন্যে সে লঘু প্রশ্ন করে একটা, 'আচ্ছা সুচিতবাবু, আপনাদের রেলে-রাঢ়ী আর নেয়ে-রাঢ়ীদের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন?'

'সোকলই পয়সা কা উপর দিদি, নেয়ে-রাঢ়ীদের পয়সা হলে সব বাঙালী বনিয়ে যায়। বোংলা পড়ে, বোংলা বোলে। ই বিহার দেশে আমরা না ঘরকা, না ঘাটকা। বোঙালীর পাশ গেলে বোঙালী ধাকিয়ে দেয়, বিহারীর পাশ গেলে সে ভি বোলে হট্ যাও! কসুর তো আমাদের, দোনো নাও পর গোড় রেখে বরাবর চলিয়েছে। য়হ আংরেজি পলিটিক্স কা জমানা বীত গয়া হ্যায়!'

ন'টা চল্লিশ—অপেক্ষিত নাথুলাল তেওয়ারী এসে অফিসঘরে ঢুকল, 'নমস্তে দিদি।'

'আসুন।' টেবিলের ওপারে একটা চেয়ার দেখিয়ে দেয় উশ্রী, 'আগে-কার মোকর্দমার যে অর্ডারসীট বলেছিলাম তার কপি পেয়েছেন?'
গামছায় জড়ানো ফাইল খুলে নাথুলাল কাগজ বার করে উশ্রীর দিকে এগিয়ে দেয়, 'নকল আর নিতে হয় নি, আমার বাড়িতেই ছিল।'
কাগজটা দেখার পর উশ্রী বলে, 'এই নিয়ে আপনাদের দু-ভাই এর মধ্যে কবার নতুন করে পার্টিশান মোকর্দমা হলো, আর কবার কমপ্রোমাই করলেন নাথুবাবু?'
'পনেরো বছরে সাত বার।'
অভিজ্ঞ উকিলের ভঙ্গিতে উশ্রী প্রশ্ন করে, 'এরচেয়ে একেবারেই পার্টি-শান করে নিচ্ছেন না কেন?'
সুগৌর নাথুলাল তেওয়ারী বৃদ্ধ, কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমুন্নত সুপুষ্ট কান্তি, একটু হেসে জবাব দিল, 'তাহলে শেষ বয়েসটা আমায় ভিক্ষে করতে হবে। আমার দাদার খরচের বহর দ্বারভাঙ্গা মহারাজের চেয়ে বেশি। ধার কর্জ নেবার হাত তার চেয়ে বড়। বিশ বছর আগে একবার দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করে পাঁচটা হাতি আর ব্যাণ্ডপার্টির জুলুস নিয়ে বাবা বৈদ্যনাথধামে মানত করতে গেল, আমায় তিন লাখ টাকা কর্জা মিলিয়ে দাও ভগবান! পেয়েও গেল টাকা! তারপর আবার বিশ বাইশ হাজার খরচ করে মানতের পূজো। পার্টিশান হলে দাদার যা ভাগ তা তিনদিনও থাকবে না। তারপর কি হবে, আমি তো আর বুড়ো দাদা কি তার স্ত্রী পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারব না? মাথার ওপর রিসি-ভার বসিয়ে দিয়েছি বলে এখন কিছুটা হাত পা বাঁধা হয়ে গেছে। পরশু এটা ফাইনাল করে দিতে হবে। পরশু মোকর্দমার তারিখ, আজ ছেলেকে পাঠিয়ে আমার কাছে দু-শ' টাকা ধার নিল, আমারই গলায় চাকু বসাবে! কি করব, বড় ভাই, না বলতে পারি না। মোকর্দমার তারিখের দিন দু-চারটে দোস্ত-মহিম সঙ্গে এনে কাছারির হোটেলে ধারে খাবে, ফের-বার সময় আমাকেই আবার খোঁজ খবর নিয়ে কর্জা শোধ করে যেতে হবে, নয়তো দোকানদার বলবে, নাথুলালের ভাই সুরযলাল চোর!'
'তাহলে এ মোকর্দমা আপনাদের চলতেই থাকবে?' উশ্রী মৃদু হেসে

জিজ্ঞেস করে।

ঘাড় নাড়ে নাথুলাল, 'হ্যাঁ। পার্টিশান কেস ঠিক ঠিক লড়লে একশ' বছরেও শেষ হবে না, আমি তাই চাই।'

'কিন্তু তারপর আপনাদের আর থাকবে কি ?'

'হাওয়া!' নাথুলাল হাসে, 'বিষয় সম্পত্তির তিন গতি দিদি, ভোগ দান আর নাশ। বিষয় চিরদিন থাকে না। পাপ না করলে বিষয় আসে না, পাপ না করলে বিষয় যায় না। এর সবটাই পাপের পথ। আমার বাপ দাদা পরদাদা পাপ করে বিষয় করেছে, আমরা পাপ করে নাশ করছি।'

'তবু যদি একটা—'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল উশ্রী, নাথুলাল তেওয়ারী মাঝপথে বাধা দেয়, 'নাস্তি মধ্যম পন্থা, নাশ, নাশ, নাশ! তবু আমি চেষ্টা করছি মোকর্দমা লাগিয়ে রেখে যতটুকু বাঁচাতে পারা যায়। আমার তো ছেলেপুলে বউ কেউই নেই, সবই ঐ দাদা সূরযলাল তেওয়ারীর। চিরদিন রাজার হালে থেকেছে, মরার পর কেউ যেন না বলে, একটা ভিখিরির লাশ শ্মশানে বয়ে নিয়ে চলেছে; তার উপায়, তার ছেলেদের ভাত কাপড়ের রাস্তা, এসব আমায় করে রাখতে হবে তো ? সম্পত্তির ওপর রিসিভার আমার চাই-ই।'

কথার শেষে নাথুলাল তেওয়ারীর সুগৌর মুখাবয়ব অবরুদ্ধ উত্তেজনায় অধিকতর রাঙা হয়ে ওঠে।

২৭

প্রতিদিনের মতো উড়ন্ত ব্যস্ততার ভাব আজ মন থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রায় দুপুরের কাছাকাছি উশ্রী কাছারিতে এসে পৌঁচেছে। পরেশ বসুর কোর্ট-চেম্বারে ভিড় নেই বিশেষ। মুহুরী সুচিতপ্রসাদেরও দেখা নেই। সে নিশ্চয়ই আগে চলে এসেছে, এখন কোনো এজলাসে সংকটমোচন সাক্ষীর কাজে ব্যস্ত।

প্রতিদিনই সুচিতপ্রসাদকে দু-একটা সাক্ষ্য দিতে হয়। বাঁধা দর আট টাকা। নতুন কোনো কোর্ট আসতে না আসতে সে পরিচিত হয়ে পড়ে। সময় বিশেষে পার্টির সাক্ষীর অভাব দেখা দিলে আদালতই নির্দেশ দেয়, 'যান সংকটমোচন সুচিতপ্রসাদকে ডেকে হাতে একটা রসিদ-ফসিদ দিয়ে এজাহার করিয়ে দিন, আমি টাইম দিতে পারব না, দৈনিক অন্তত চার-জন সাক্ষীর এজাহার আমায় নিতেই হয়—That's my minimum quota ; সবচেয়ে কম কাজের বহর।'

এক নম্বর সংকটমোচন সুচিতপ্রসাদ। উর্দু বা ফার্সী লেখা দলিল-দস্তাবেজ কাগজপত্র প্রমাণ করতে দু-নম্বর সংকটমোচন মফুজমিঞা। তার চাহিদা কম, স্বভাবতই দরও সামান্য। মফুজমিঞা বৃদ্ধ, এবং সে-ও উকিলের মুহুরী। মুহুরীর সাক্ষ্যের দাম কিঞ্চিৎ বেশি। প্রতিটি এজাহার দেবার সময় বলতে হয় কোন্ উকিলের মুহুরী সে।

এই ভাবে সুচিতপ্রসাদের সাক্ষ্যের সময় উশ্রীর নাম প্রতিদিনই দু-চারটে মোকর্দমার নথিতে প্রবেশ করছে। সাক্ষীর এজাহার এ-ফাইলে রক্ষণীয়, অতএব সে নাম অসংখ্য কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আদালতের রেকর্ড-রুমে অনন্তকাল থেকে যাবে। এ ফাইল নির্দিষ্ট মেয়াদ-শেষে পোড়ানো হয় না।

পর্যায়ক্রমে চায়ের পেয়ালায় চুমুক এবং সিগারেটে টান দিতে দিতে পরেশ বসু প্রশ্ন করলেন, 'আজ তোমার কোথায় কাজ ?'

উশ্রীর সুমুখেও এক পেয়ালা চা, কোর্টে আসার পর সে অসময়ে চা-পানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। পেয়ালাটা হাতে তুলে মুখ ঠেকিয়েই নিচে নামিয়ে রাখে সে, তারপর পরেশ বসুর জিজ্ঞাসার জবাবে বলে, 'মুন্সিফ ম্যাজিস্ট্রেট এন. কে. প্রসাদ। আসামী দু-তারিখ আসতে পারে নি, জামিন খারিজ হয়ে গেছে, সে অর্ডার রিকল করানো, আর একটা কেসে বেল ক্যানসেলেশনের প্রেয়ার।'

'তোমার কোনো পার্টি পকেটমার নয় তো ?' জিজ্ঞেস করার পর পরেশ বসু মৃদু হাসেন।

'কেন বলুন তো ?' উশ্রীও সপ্রশ্ন হাসিমুখে তাকায়।

পরেশ বসু বিজ্ঞপ্তি দেন, 'একবার কি হয়েছিল জানো, এস. ডি. ও-র কোর্টে এক পকেটমারের কেস, জজ কোর্টে এসে দ্বিজেন সেন উকিলের পকেট কেটে ওখানে গিয়ে অনন্ত মোক্তারের ফী, পেসকার-পিওনের মামুলী, মুহুরীর তহুরী ইত্যাদি দরাজ হাতে খরচ করল। তারপর ধরা পড়ে গিয়ে খুব হইচই, আবার সেই গো ব্যাক টু হাজত।'

উশ্রী বলে, 'তবে যে শুনেছি কোর্টের পকেটমাররা হাকিম উকিল পেশ-কার মুহুরী এদের পকেট কাটে না?'

পরেশ বসু উত্তর দেন, 'অর্বাচীন পকেটমার মাঝে মাঝে নিয়মভঙ্গ করে ফেলে, তাই দলের লোকই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল।'

সুচিতপ্রসাদ চেম্বারে ঢুকল, উশ্রীর দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত স্বরে বলল, 'চোলেন দিদি, আপকো ইজলাস মে পৌঁহুছে আমি ফির গোবাহীতে যাবে।'

উশ্রী উঠে পড়ল।

পরেশ বসু প্রশ্ন করেন, 'আজ আপনার কটা সাক্ষ্য হলো সুচিতবাবু?'

'তিনটা হুজুর।'

হাতের না-ধরানো সিগারেটটা প্যাকেটের ওপর ঠুকতে ঠুকতে পরেশ বসু আলস্যময় ভঙ্গিতে কথা তোলেন, 'তিন আটে চব্বিশ! আচ্ছা, ঐ উপেনটার উইটনেস বিজনেস চলল না কেন বলুন তো?'

'বহ শালে বেইমান', সবিশেষ উত্তেজনার সঙ্গে সুচিতপ্রসাদ খাঁটি হিন্দিতে বলে, 'দোনো পার্টিকা পয়সা খাকর দো তরফা গবাহী দেতা থা, দোনো কা গলা উড়তা থা। চোরি-ডাকাইতি মে ভি আপসমে ইমানদারিকা জরুরত পঢ়তা হ্যায়। আপ সাচ্চা তো জগৎ সাচ্চা, জগৎ সাচ্চা তো পয়সা হাত কা ময়লা। কাছারিমে বেইমানীকা জাগহা নঁহী হ্যায় হুজুর, যহ ধরমছেত্র হ্যায়!'

মুন্সিফ ম্যাজিসস্ট্রেট এন. কে. প্রসাদের এজলাস। টিফিনের পর বলেই ভিড় বেশি। এ সময় আধ ঘণ্টার ভেতরই পঞ্চাশটা মুভ-মোশান। নিরুপায় অতিষ্ঠ হাকিম যে কোনো বিষয় একটুখানি শুনেই ইয়েস, নো,

অর্ডার রিজার্ভড, অ্যালাউড, রিজেক্টেড ইত্যাদি মৌখিক রায় দিয়ে যাচ্ছেন, পেশকার এইটুকুই কাগজে লিখে নিচ্ছে, কোর্ট আওয়ারের পর রাত বারোটা পর্যন্ত বসে সেই মৌখিক অর্ডারের সূত্র ধরে অর্ডার সীট তৈরি করবে, নিচে বন্ধনীর মধ্যে লিখবে ডিকটেটেড, পরদিন হাকিম বেলা সাড়ে দশটায় কাছারিতে এসে আগের দিনের তারিখ দিয়ে ব্যাক-ডেট-এ সই করবেন।

সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাকডেট-এর মেয়াদ একমাস অবধি জীবন্ত থাকতে পারে। হাইকোর্ট ডিসপোজাল চায়, কোয়াটারলি রিটার্নে ফাঁক থাকলে প্রমোশনেও ফাঁকি রয়ে যেতে পারে, সুপারসেসন তো অব-ধারিত। সে যুগ ফুরিয়েছে, এখন আর কোয়ালিটি নয়, কোয়ানটিটি। গ্রো মোর ফুড, প্রডিয়ুস মোর আর্টিকলস। কোয়ালিটি কনট্রোল শব্দ অভিধানের মধ্যেই অন্তরীণ।

উশ্রী এসে এজলাসে ঢুকল। তার হাতে ফাইল ধরিয়ে দিয়ে সুচিতপ্রসাদ পাশের এজলাসে তিন মিনিটের সাক্ষ্য দিতে গেল। অর্থাৎ পরবর্তী আধ ঘণ্টার মধ্যে আর দেখা পাওয়া যাবে না। প্রশ্ন করলে বলবে, 'আমি গরীব মুন্সী, হাতে ঘড়ি তো নেই!' উকিল আর মুহুরীর মধ্যে এ কৈফিয়ত তলব আর জবাব চিরন্তন। কোনো পক্ষেই শ্রান্তি আর উত্তরের হেরফের নেই।

বেঞ্চে জায়গা নেই, উকিল মোক্তার মুহুরী আর ফরিয়াদি আসামীর ভিড়ের সঙ্গে এক হয়ে উশ্রী দাঁড়িয়ে রইল। গা সওয়া হয়ে গেছে। আজ-কাল আর এই সময় নিজেকে মেয়ে মনে হয় না। এমন খোলামেলা আচরণ ঝাঁসির রানী ব্রিগেডে মহিলা সৈনিকেরও না। সে যেন পুরোপুরি পুরুষ একজন!

আসমুদ্রহিমাচল ব্যাপী সমানাধিকার সম্পন্ন সমপর্যায়ের ব্যবহারজীবী, এই নব-বিধান অনুযায়ী আইনের স্নাতক পরীক্ষা পাস না করা ম্যাট্রি-কুলেট মোক্তার, অধুনা অ্যাডভোকেট কার্তিক সিং পাঁচ জনের গলা ছাপিয়ে চিৎকার করছেন। পরনে ধুতি, গায়ে গলাবন্ধ কালো কোট, গলার ব্যাণ্ডের একটা ফিতে লোপাট, গাউনটা কোটের ওপর চড়াবার

অবসর নেই, পুঁটুলি করে বাঁ বগলে ধরা, ঘর্মাক্ত ললাট ও কপোল। কপালে গলিত সিঁদুর টিকা, ডান ভ্রূর ওপর দিয়ে তার নির্যাসের রেশ কানের পাশ পর্যন্ত গড়িয়েছে। বর্ষচক্রের একই ঋতুর বার দু-তিন আগমনের মধ্যেই তাঁর পোষাক আসাক ও হাবভাব অ্যাডভোকেট সনদলাভের প্রাক যুগে ফিরে গেছে।

মোক্তার-অ্যাডভোকেট কার্তিক সিং নিজের কণ্ঠ ও অপরের কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা গলায় চিৎকার করছেন, 'হুজুর, আসামী বিলকুল নির্দোষ, অ্যাবসলুটলি ইনোসেণ্ট য়্যোর অনার। পুলিশ ঘুষ খেয়ে মিছে ধারায় চালান করেছে। পুলিশের হাতে তো ফৌজদারী ধারার মুক্ত ভাণ্ডার, ঢেলে দিলেই হলো। গালে চড় কষলেই খুনের তিনশ' দুই ধারা লাগিয়ে দেয়। হুজুর, ইওর অনার, মাছ জল খায় না পুলিশ ঘুষ খায় না, কে বিশ্বাস করবে?'

মুন্সিফ ম্যাজিস্ট্রেট এন. কে. প্রসাদ চিন্তা গম্ভীর মুখ করে নীরবে কার্তিক সিং-এর বক্তৃতা শুনছিলেন। বিরামহীন গুরু দায়িত্বের মাঝে কিছু সরস অবসর ভোগ করতে চান তিনি, এর জন্যে বিশেষ নির্ঘণ্ট খুঁজে পাওয়া কঠিন। কাজের ফাঁকেই বিরামের সুযোগ অল্পবিস্তর নিতে হয়। কার্তিক সিং-এর বক্তৃতা থামতে তিনি বললেন, 'কিন্তু কার্তিকবাবু, এ মোকর্দমায় আপনি তো আসামীর পক্ষে নেই? আপনি ফরিয়াদীর তরফে আছেন। কমপ্লেণ্ট কেস, পুলিশ কেস নয়, তবু আপনার দরখাস্তের দরুন সাবোর থানার দারোগাকে এনক্যোয়ারী দেওয়া হয়েছিল, তাঁর রিপোর্ট এসে গেছে।'

'আই অ্যাম ভেরি সরি স্যার', কার্তিক মোক্তার সপ্রতিভ জবাব দেন, 'সাবোর থানার ও. সি-র রিপোর্ট, It is a page from the holy Ramayan, এ স্যার রামায়ণের পৃষ্ঠা, এতে এক বিন্দু মিথ্যে নেই য়্যোর অনার। আমি প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবি, এ কি করে সম্ভব হলো? সাবোর থানার ও. সি কি যেন তার নাম, He is like a class-friend of Yudhisthir, Sir; ঠিক যেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তিনি একই পাঠশালায় পড়তেন।'

আসামী পক্ষের দুর্গা মোক্তার এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিলেন, এবার চেঁচিয়ে ওঠেন, 'I repeat the words of my friend Sir; আমার বন্ধুর কথাই পুনরাবৃত্তি করছি, মাছ জল খায় না, দারোগা ঘুষ খায় না, কে কবে শুনেছে? সাবোর থানার ও. সি. ভগবানের অবতার নয় স্যার, শয়তানের দোসর।'

এবার একজন উকিল মৃদুস্বরে মন্তব্য করেন, 'শয়তানের দোসর, না ঈশ্বরের অবতার, তা সঠিক জানার জন্যে আপনারা কোর্টের কাছে রিলিজিয়াস কমিশনের জন্যে প্রার্থনা করুন। অনেক সময় নিয়েছেন, এখন আমাদেরও একটু সুযোগ দিন।'

পেশকারের দিকে একবার তাকিয়ে এন. কে. প্রসাদ বললেন, 'লিখুন, 'Persued police report and heards learned lawyers of the parties; পুলিশ-রিপোর্ট দেখা ও উভয় পক্ষের বিচক্ষণ আইনজ্ঞের বক্তব্য শোনা হলো, পাঁচ নয় তারিখে আদেশ দেওয়া হবে।'

চিড়িয়াখানার ভিড় কমে এজলাসের চেহারা খানিকটা ভদ্রস্থ হতে উশ্রী নিজের আবেদনগুলি পেশ করে। একটি মঞ্জুর, অপরটি খারিজ।

ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে আদালতকে সম্মান জানিয়ে উশ্রী এজলাস ছেড়ে বাইরে এলো। নতুন সিভিল কোর্ট বিলডিং-এর দোতলায় এজলাস। দীর্ঘ বারান্দার হাত পঁচিশেক পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে হাত-ঘড়িতে দেখল, মাত্র সওয়া তিনটে।

উশ্রী ভাবল একটু, এখন কি পুরনো কাছারি-পাড়ায় পরেশ বসুর চেম্বারে ফিরবে, না এখান থেকেই রিক্সা ধরে বাড়ি? আজ শনিবার, সন্ধ্যের পর ভাস্কর এলেও আসতে পারে। যথেষ্ট সময় রয়েছে, প্রতিবারের মতো তার সুমুখে পরিচারিকা কল্যাণীর হাতের রান্না ধরে না দিয়ে, এখন থেকে লেগে পড়ে সে নিজেও দু-চারটে পদ রেঁধে রাখতে পারে। কিন্তু তারপর ভাস্কর যদি না-ই আসে, তখন তার মনে হয়তো অযাচিত ভাবে ব্যর্থতার ঘা এসে লাগবে। অভ্যস্ত একাকিত্বের কিঞ্চিৎ বেদনাময় শান্তি বিঘ্নিত করে লাভ নেই কিছু।

ভাস্কর আজ সন্ধ্যের পর আসতে পারে, এ চিন্তা মন থেকে বাদ দিলেও

উশ্রী আর পরেশ বসুর চেম্বারের দিকে গেল না। মাসের শেষ শনি-বারের পড়ন্ত দুপুরে ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত নির্জীব-নির্জন কাছারি। এক-তলায় দেওয়ানী আদালতের কক্ষগুলো সম্পূর্ণ ই খালি। একটিতে উঁকি দিয়ে উশ্রী দেখল হাকিমের মঞ্চের সুমুখে উকিলের জন্য নির্দিষ্ট সুদীর্ঘ টেবিলটার ওপর শুয়ে পিওন রামধারীলাল নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন। মাথার ওপর ঘূর্ণায়মান সিলিং ফ্যান, তার করর্ করর্ আওয়াজও রামধারী-লালের নাসিকাধ্বনি সগোত্র হয়ে গেছে যেন।

আইনের বিকিকিনির ভাঙা হাটে আগামী সোমবার বেলা এগারোটার আগে আর রবমুখরতা জাগবে না। উশ্রী লক্ষ্য করেছে কাছারির ঘণ্টা শেষ হওয়ার পরই এতবড় সৌধ-অলিন্দ-মালঞ্চময় জায়গাটা কেমন যেন উদাস বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অথচ ঠিক এ সময়টা পেশকার-দের দোকানদারির পূর্ণ লগ্ন। ন্যায়বিধির বেসাতি বেশ ভালোই চলে। হয়তো এ প্রথা আছে বলেই আইনের ক্রিয়া অনেক সময় অধিক সুষ্ঠু ও গতিশীল মনে হয়। এই সময়ই সুবিখ্যাত দীনেশ পেশকার নিশ্চিন্ত মনে বসে কমলেশ্বর প্রসাদ নামের অতিরিক্ত সাব জজ ও সহকারী সেসনস্ জজের দেয় জাজমেণ্ট নিজে লিখে টাইপ করে রেকর্ডের সঙ্গে বেঁধে রাখত, পরের দিন হাকিম সই করবেন। তিনি শুধু চোখবন্ধ করে হনুমান-স্তবের পুণ্য পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ভাগ্যচক্রে আঙুল রেখে বাদী প্রতিবাদী আসামী ফরিয়াদীর ভাগ্য নির্দেশ করে পেশ-কারকে বলে যেতেন, 'এটাতে কেস ডিসমিস, এতে আসামীর সাত বছর জেল, Rigorous imprisonment ;' ওপর আদালতের আপিলে সে রায় কখনো পরিবর্তিত হয় নি!

দীনেশ পেশকার নিজেই বলত, 'দীনেশ ঘোষের লেখা রায় প্যাঁকাঠির কঞ্চি নয়, বেতের ছড়ি, ওপরে গিয়ে একটু আধটু নুয়েছে, কিন্তু ভাঙে নি বা ফাটে নি কখনো।'

উশ্রীর মনে হলো আর এখানে বসে থাকার চেয়ে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করা ভালো। ছেলেমেয়েগুলিও আছে, তারা বিশেষ [illegible] পায় না, আজ খানিকটা সাহচর্য দেওয়া যেতে পারে।

জানা কথাই, রিক্সার অভাব আজ হবে না। সিভিল কোর্টের একতলার বারান্দা থেকে কোর্ট কম্পাউণ্ডের পিচ ঢালা রাস্তায় পা দিতেই তিন-চারটে অপেক্ষমান রিক্সা একসঙ্গে সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল। তারই মধ্যে একখানা ভালগোছের বেছে নিয়ে সেটির সীটে সর্বাগ্রে নিজের কালো রঙের ভ্যানিটি ব্যাগ আর গাউনের থলেটা রেখে তারপর উশ্রী নিজে উঠে বসল। অধিকাংশ দিনই ভালমন্দ নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। র‍্যাশনের চাল গম চিনির মতো চাহিদার তুলনায় আমদানি কম বলে আর বাছবিচারের প্রশ্ন নেই, গরুর অখাদ্যই মানুষের পরম তৃপ্তিদায়ক ভোজ্য তখন। তেমনি সীটের গদি ছেঁড়া, কি মুহুর্মুহুঃ চেন-পড়া রিক্সাও বাতিল করার উপায় থাকে না।

রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞেস করে, 'কঁহা যাইয়েগা দিদি ?'

লোকটির মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখে উশ্রী, নিঃসন্দেহে নতুন, উপরন্তু সে যে একজন অধিবক্তা, অর্থাৎ অ্যাডভোকেট, কালো শাড়ি আর ব্যাগু-ঝোলানো সাদা ব্লাউজ দেখেও বোধহয় বুঝতে পারে নি।

'খড়্‌মনচক।' উশ্রী গম্ভীর মুখে জবাব দেয়।

'বারো আনা ভাড়া।'

'ষাট পয়সা রোজ দেতে হেঁ।' তারপর উশ্রী শান্তস্বরে প্রশ্ন করে, 'মুঝে ক্যা রিক্সা বদলনা পড়েগা ?' অন্যদিন হলেও ভাড়া অবশ্য সে দরদস্তুর করে ষাট পয়সাই দিত, কিন্তু এ ধরনের কথা বলার সুযোগ পেত না।

রিক্সাওয়ালা আর বিবাদ করল না, ন্যায্য ভাড়া আরোহী জানে।

মহাত্মা গান্ধী রোড্ মাড়িয়ে যেতে হয়। রাস্তার একপাশে প্রায় সবটা জুড়ে সদর হাসপাতাল আর হেড্ পোস্ট অফিস। অপর পারে প্রোটেস-ট্যাণ্ট চার্চ কম্পাউণ্ড, এবং তারই খানিকটা অংশে ডাক্তার মিস টিরকির বাড়ি। তাঁর মৃত্যুর পর এ বাড়ি গির্জার সম্পত্তি, এই শর্তেই এখানে বাড়ি তৈরির অধিকার পেয়েছেন।

ভাস্কর নিজে ডাক্তার, তবু প্রথমবার যমজ সন্তান পেটে থাকতে সে. উশ্রীকে ডাক্তার টিরকির কাছে দেখাতে এনেছিল, তার আগে নিজেও দেখেছিল ভালো করে। তবু অন্য ডাক্তারের কাছে এনেছিল, কারণ তাই বোধহয় নিয়ম।

ভাবলে উশ্রী অবাক হয়, ভাস্করের সঙ্গে তার প্রথমাবধি যতটুকু সম্পর্ক তাতে একটা সন্তানের সম্ভাবনা পর্যন্ত কেমন আশ্চর্যের, আর তার প্রথম যাত্রাতেই যুগ্ম ফল লাভ! তারপর আবার একটি। উশ্রীর আপত্তি না থাকলে এতদিন ভাস্কর হয়তো তাকে ডজনখানেক অপত্য-রজ্জু দিয়ে বেঁধে ফেলত। সে বোধহয় ভেবেছিল এই নিয়ে উশ্রী ভুলে থাকবে। ভাস্করের এ চিন্তা বিশেষ সফল হয় নি, কারণ সন্তানদের প্রতি সে তেমন মোহগ্রস্ত নয়।

তবে ভাস্করের যা ভয় তা সম্পূর্ণই অমূলক। তার এবং অবন্তীর অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে উশ্রী মোটেই মাথা ঘামায় না। ওদের সম্পর্কসম্বন্ধ আজও বজায় আছে, অথবা ওরা পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করছে কিনা, এ খবরও সে রাখে না। তার মনের দিক থেকে ভাস্কর চিরদিনই বাতিল ভর্তা।

ডাক্তার টিরকির বাড়ির বাঁ পাশে অ্যাডভোকেট সুনীল সেনের বাড়ি। পাত্রমিত্র সভাসদ নিয়ে সুনীল সেন বাইরের বারান্দায় শনিবারের বৈকালিক আড্ডার আসর জমিয়ে বসেছেন। উশ্রী সুনীল সেনের ছাত্রী, ল-কলেজে পার্টটাইম লেকচারার তিনি। রিক্সা থেকে চোখোচোখি হতেই উশ্রী হাত তুলে নমস্কার জানাল। বিনিময়ে নিজেও পেল একটা।

একই সারিতে সদর হাসপাতালের গোটা তিনেক ফটক। সে যুগের অতি খ্যাতনামা উকিল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি শিবতারিণী ফিমেল হসপিটালের ঠিক সামনেই প্রধান তোরণ। কলকাতার লেডি ডাফরিন হাসপাতালে তাঁরই অনুদান সর্বাধিক।

হাসপাতালের প্রধান ফটকের সুমুখে রিক্সাটা এসে পৌছতে উশ্রীর একটা কথা মনে পড়ল। বহুদিন যাবত এইখানে কেবিন নিয়ে পড়ে রয়েছেন

পণ্ডিত হলধর মিশ্র। এফ. এ. পাশের পর গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তারপর হঠাৎ আইনের একটা প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়ে পি. এল. উকিল। এখন অবশ্য অ্যাডভোকেট।

দেহে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির সংখ্যাগুণে পণ্ডিত হলধর মিশ্র যেন কলকাতার ট্রপিকাল মেডিক্যাল হসপিটাল। ওষুধের জোরে রোগগুলো শরীরে বিশেষ ফুটে বেরোয় নি, তবু দেহ প্রায় পঙ্গু, হাতের আঙুলগুলি বেঁকে গেছে, কলম ধরে ইনিসিয়াল সিগনেচার পর্যন্ত করতে পারেন না, ছানি কাটানো চোখের পুরু কাচের চশমার সামনে আতশী কাচ ধরে একান্তই না-পড়লে-নয় ধরনের বই পড়েন, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাঁর সমকক্ষ ব্রীফ কারো হাতে নেই। উপস্থিত বুদ্ধি স্মৃতিশক্তি আর পরিষ্কার কণ্ঠস্বরের বলে সেখানে তিনি বিপুল আধিপত্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন!

কোর্টে আসার পর থেকে উশ্রী বরাবর শুনে আসছে পণ্ডিত হলধর মিশ্র এবার দেহরক্ষা করবেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি পরলোকের দরজা থেকে স্বমহিমায় ফিরে এসে সকলকে অবাক করে দিয়েছেন।

পণ্ডিত হলধর মিশ্র একটি চরিত্র! নাস্তিক্যবাদিতার একটা সীমা থাকে, কিন্তু সে বিষয়ও তিনি অসীম। তবু একবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পণ্ডিত হলধর মিশ্র ভেঙে পড়েছিলেন। মাত্র একবারই।

দেহ প্রায় বিকল, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষীণ ক্রিয়া যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, বিবিধ রোগের বিশেষজ্ঞ জনতিনেক চিকিৎসক শেষবারের মতো দর্শনী নিয়ে হতাশ জবাব দিয়ে গেছেন, এ অবস্থাতেও পণ্ডিত হলধর মিশ্রর মস্তিক পরিপূর্ণ সজীব। চেতনা তিলমাত্র মলিন হয় নি।

প্রায় চল্লিশ বছর যাবত নিত্যসঙ্গী মুহুরী রাখাল দত্তকে পণ্ডিত হলধর মিশ্র রোগশয্যার পাশে ডাকলেন।

নেয়ে-রাঢ়ী রাখাল দত্ত, প্রায় প্রতিটি মোকর্দমায় পার্টিকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেওয়ায় যার জুড়ি ভূ-ভারতে নেই, আবার সে বিপদের মুখ থেকে উদ্ধারকার্য একমাত্র তার দ্বারাই সম্ভব। একদা আপিলের আর্জির ওপর দেয় কোর্ট-ফীর প্রায় দেড় হাজার টাকা হজম করে বসে রইল

সে। ফল স্বরূপ আপিল খারিজ। নতুন আর্জি দাখিল হবে সে গুড়েও বালি, সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। Fresh appeal barred by limitation—তামাদি!

পণ্ডিত হলধর মিশ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, দেড় হাজার টাকা নয় চুপচাপ নিজের পকেট থেকেই পুষিয়ে দিতেন, কিন্তু তামাদির প্রশ্ন উঠে পার্টির কাছে মুখ দেখাবার উপায় আর রইল না। রাখাল দত্ত স্মুখে এসে পড়লে তাকে জ্যান্ত ছিঁড়ে খান তিনি।

খুব শান্তভাবে অফিসে ঢোকে রাখাল, হাতের ছাতাটা একটা বই-এর আলমারির কার্নিসে টাঙিয়ে দিয়ে হলধর মিশ্রর মুখোমুখি হয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠার আগেই বিরক্তিযুক্ত অনুযোগের ভাষায় বলে, 'ঠায় দু-দিন ধরে এর তার কাছে শুনে যাচ্ছি আপনার মেজাজ খুব গরম হয়ে রয়েছে, তাই মিছে কচকচি এড়াবার জন্যে সামনে আসি নি। আপনার পার্টির চেয়ে আমার মা অনেক অনেক বড়। মা'র শ্রাদ্ধের জন্যে আপনার কাছে টাকা চাইলে তো দিতেনই না, উলটে লেকচার শুনতে হতো, আত্মা নেই, বাজে খরচ করা বৃথা। নতুন আপিল তামাদি হবে তো কি, ঐ খারিজ আপিলই আপনি পুনর্বহালের দরখাস্ত দিন। আমাদের পাটনা হাইকোর্টেই নজির, এ. আই. আর মাইনটিন থার্টিনাইন পাটনা, মুহুরী কোর্টফী খাওয়ার দরুন মোকর্দমা খারিজ হয়ে গেলে তা আবার রেস-টোরড হবে। দরখাস্ত লিখিয়ে দিন, আজ দাখিল করছি। আমি কখনো বে-আইনী কাজ করি না।'

ক্রোধের আতিশয্যে পণ্ডিত হলধর মিশ্র চিৎকার করে ওঠেন, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে, oh fool, get out!'

রাখাল দত্ত সে উষ্মা গ্রাহ্য করে না। নীরব, কিন্তু সদর্প পদক্ষেপে সেখান থেকে সরে গিয়ে একটা আলমারি খোলে, বই টেনে নিয়ে নজিরের পৃষ্ঠা বের করে পড়ে শোনায়, তারপর বলে, 'নিন এবার রেসটোরেশান পিটিশান লেখান, ডিকটেশান দিন, আমি লিখে নিচ্ছি। দেওয়ানী উকিল অত মাথাগরম হলে চলে না। ঐভাবে চ্যাঁচাতে গিয়ে কোন্‌দিন আপনার সজ্ঞানে ব্রহ্মলাভ হবে তা বলে রাখছি!'

পণ্ডিত হলধর মিশ্র মূক একেবারে।

রাখাল দত্ত ঘরে এসে দেখল মৃত্যুপথযাত্রী পণ্ডিত হলধর মিশ্রর যুগল চোখে বিগলিত অশ্রুধারা। প্রায় নির্বাপিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'রাখাল, সারা জীবনে কখনো ঈশ্বর চিন্তা করলাম না, তিনি আছেন কি নেই, তাও জানি না। তবু হিন্দুর সন্তান, জন্মগত সংস্কার একেবারে ছেড়ে দেওয়া কি উচিত? তুমি আমায় একটা ঠাকুরের ছবি এনে দাও—এনি গড্।'

বাড়িতে দেবার্চনার বালাই নেই, রাস্তার মোড়ে পানের দোকানে একটি ফ্রেম বাঁধানো মহাবীরজীর ছবি পাওয়া গেল, সেখানি এনে রাখাল দত্ত পণ্ডিত হলধর মিশ্রর ঝাপসা দৃষ্টিযুক্ত চোখের সুমুখে ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিল।

পণ্ডিত হলধর মিশ্র যেন ঈশ্বর-স্তোত্র পাঠ করেন, অনুরূপ আকুতি ও দরদপূর্ণ কণ্ঠস্বর তাঁর, 'হে ঈশ্বর, তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজও আমার মনের সন্দেহ ঘোচে নি। স্বর্গ বা নরক যদি সত্যিই থাকে, আর আমি মৃত্যুর পর তার কোনো একটাতে যাই, সেখানে তুমি আমায় তোমার চরণে স্থান দিও। জ্ঞানত আমি কোনো পাপ করি নি, তবে তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যদি পাপ হয়, তাহলে আমি ঘোর পাপী, আমার এই একমাত্র অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। I am the first offender, not a habitual one; প্রথম অপরাধ ক্ষমা করার বিধান এ জগতের আদালতেও আছে। It is not without any prescedent; আমার এ কথা আইনে নজিরহীন নয়।'

তারপর বারোদিনের মাথায় পণ্ডিত হলধর মিশ্র মৃত্যুরোগ বিমুক্ত হয়ে খাটিয়ার ওপর উঠে বসলেন। দেওয়ালে টাঙানো মহাবীরজীব ছবি, সেদিকে নতুন করে চোখ পড়ল তাঁর। সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন তোলেন, 'আচ্ছা রাখাল, হিন্দুর সব দেবদেবী কি চিড়িয়াখানার নমুনা? কেউ হনুমান, কেউ বরাহ, কেউ কচ্ছপ? Remove the image of monkey from my home; এই বাঁদরের ছবিটা বিদায় করে দাও, দেখে লজ্জা

হয়! আমি আত্মাও বিশ্বাস করি না।'

শুধু এই একমাত্র অবসর নয়। অনাচারী পণ্ডিত হলধর মিশ্রর আচার আচরণ দেখে তাঁরই সমবয়সী বৃদ্ধ মুহুরী রাখাল দত্তর অসহ্য বোধহয়।

বিবিধ ব্যাধির ডিপো পণ্ডিত হলধর মিশ্র। মনে হয় অনেকগুলি রোগের সমষ্টিতে তাঁর নররূপী অবয়ব গঠিত। হাঁপানীর টান, উপরন্তু ফুসফুস দুটিতে কফ পিত্তের মৌরসী পাট্টা। ব্রংকিয়াল অ্যাজমা। প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগের পর কাশিকুশী আর কফ উদ্গিরণেই একটি ঘণ্টা অপব্যয়, তত-ক্ষণে বাড়ির অফিস ঘর ও তার সম্মুখবর্তী বারান্দাটিতে মক্কেল এবং জুনিয়ার উকিল সমাগমে আকীর্ণ। অগত্যা নিজের শরীরটাকে কিঞ্চিৎ যুৎসই করে নেওয়ার পর পণ্ডিত হলধর মিশ্রর আর অবসর থাকে না। শয্যা ছেড়ে সোজা অফিস ঘরে এসে নিজের চেয়ারটিতে আসীন হন তিনি, তারপর বাসি মুখে এক গেলাস গরম দুধ পান করেই —'There has been much delay ; অনেক দেরি হয়ে গেছে, এবার কাজ আরম্ভ হোক।'

থাকতে না পেরে রাখাল মুন্সী বলে, 'আপনি কি পণ্ডিতমশাই, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্তান, সকালে উঠে চোখে মুখে জল দেওয়া নেই, দাঁত মাজা নেই, ঈশ্বরের নাম জপ নেই, বাসি মুখে এক গেলাস দুধ খেয়েই কাজে বসে গেলেন?'

ক্ষীণ দৃষ্টিযুক্ত চোখ দুটি বিস্ফারিত করে পণ্ডিত হলধর মিশ্র তাকান, 'What wrong is there? অপরাধটা কি আমার? রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর মুখ ধুয়ে শুয়েছি, তারপর সারা রাতের মধ্যে কোনো অখাদ্য ভোজন করি নি, অকথা কুকথাও বলি নি, অতএব ইতিমধ্যে আমার মুখের ভেতরটা অপবিত্র হয়ে গেল কখন?'

একদিকে পরাজিত রাখাল মুন্সী অন্যদিক থেকে আক্রমণ করে, 'কিন্তু রাত্তিরে শুতে যাবার আগে কি ঈশ্বরের নাম করেছিলেন, যে এখন তারও দরকার নেই?'

'What for?' পণ্ডিত হলধর মিশ্র অধিকতর অবাক, 'আমি কেন ঈশ্বর ভজনা করতে যাব? তুমি তো জানো রাখাল, আমাদের যৌথ

পরিবার ? গ্রামের বাড়িতে ছোট ভাই চক্রধর থাকে, জমিজিরেতের দেখাশোনা, গৃহ বিগ্রহের নিত্য সেবা, এসব তারই জুরিসডিকশান। সে যেমন এখানে এসে আমার ওকালতি পেশা চালিয়ে দেয় না, আমিও তার পক্ষের করণীয় ঈশ্বরের নামকীর্তন করি না।···হ্যাঁ, আপনার কি প্রমথবাবু, আজ সাবজজ কোর্টে ইনজাংশন ম্যাটার, না ? কাগজপত্র আর আমায় দেখাতে হবে না, শুধু বই ক'খানা বের করে নাও রাখাল, এ. আই. আর উনিশশ' বাহাত্তর সুপ্রীমকোর্ট, বি. এল. জে. আর. উনিশশ' পঁয়ষট্টি, আর, আর হ্যাঁ, সেভেনটিনাইন সি. ডবলু. এনটাও নিয়ে যেতে পার, তবে খুব বেশি সহায়ক হবে না, তবু মোটাসোটা পাঁচ দশখানা বই না দেখলে হাকিমরা ভাবেন পার্টির কোনো জেনুইন কেস নেই। Some rulings are meant for citing and some for showing only ; কোনো নজির পড়ে শোনাতে হয়, আর কোনোটা শুধু দূর থেকে দেখাবার জন্যে।'

হাসপাতালে পৌঁছে উশ্রী খোঁজ নিয়ে পণ্ডিত হলধর মিশ্রর কেবিনে গেল। প্রথমটা খটকা লাগল তার, কোনো উকিলের অফিসে এসে পড়েছে নাকি ? ঘর ভর্তি স্তূপাকার বইপত্র, দু-তিনখানি বেঞ্চিতে কয়েকজন লোক বসে। জুনিয়ার উকিলও দু-জন।

লোহার খাটে শয়ান পণ্ডিত হলধর মিশ্র। খাটের ছতরিতে কপিকল বাঁধা, সেটির সঙ্গে উর্ধ্বমুখ হয়ে তাঁর ডান পা-টি ঝুলে রয়েছে। প্রায় কোমর পর্যন্ত প্লাস্টার। মুদিত চোখে পণ্ডিত হলধর মিশ্র একজন জুনিয়ারকে ডিকটেশান দিয়ে টাইটেল স্যুটের আর্জি লেখাচ্ছেন, 'The plaintiff begs to state as follows ; বাদীর বিনম্র নিবেদন—'

এ দৃশ্য দেখে উশ্রী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার বিস্ময় সীমাহীন আকাশের মতোই বিস্তৃত।

২৯

সিভিল কোর্টের কাজ উশ্রীর এখন বেশ সড়গড়। ফৌজদারী আরও সহজ। বাবা আদম আমলের আইন আর বাতিল নজির তুলে বেশ চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু ফৌজদারীটা তার ভালো লাগে না, যেন কতকাংশে মেছো হাটেরই ব্যাপার।

দেওয়ানীতে সিনিয়ার বাদ দিয়েই উশ্রী প্রায় সব মোকর্দমায় কাজ করতে পারে। মক্কেলদের বিশ্বাস উদ্রেকের আগে নিজের সম্বন্ধে আস্থা অর্জন প্রয়োজন, সেটুকু তার হয়েছে। যে কোনো বিষয় আইনজ্ঞানের চেয়ে বেশি দরকার প্রয়োগবিধি জানা, সেদিকে তার সম্যক্ অভিজ্ঞতা।

তবু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত কক্ষে সিনিয়ারের ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে উশ্রীর কাজ করার ইচ্ছে হয়, যেখানে পরাজয় নিশ্চিত, অথবা হার-জিত সম্বন্ধে খানিকটা সংশয়। ফল যা হবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই হয়, তবে অবিবেক মক্কেলের কাছে দুর্নামের সম্ভাবনাটা বাঁচে। অনুষ্ঠান পরিচালক হিসেবে অপযশের ষোল আনা সিনিয়ারের। অবশ্য এ হেন পরিস্থিতিতে সুনাম যদি হয় তাও সবটা তাঁরই। তখন, সিপাহী যুদ্ধ করে মরে, বীরের সম্মান-শিরোপা ওঠে হাবিলদারের শিরে। ভুলেও কেউ আর রাতদিন এক করে গতরপেশা জুনিয়ারের নাম করে না।

সর্বত্রই উশ্রী নির্ভীক, শুধু একটি মাত্র ভীতির স্থান থার্ড অ্যাডিশনাল ডিসট্রিকট্ অ্যাণ্ড সেসনস্ জজ পি. সি. পাত্রের এজলাস। ওটি আঠারো আনা সাহেবের আদালত।

আইনের এল. এল. বি. পরীক্ষা পাস করে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন পি. সি. পাত্র। বিলেতী ভাষা ও আদব কায়দা শিখতে তিনটে বছর পার, তারপরই আকস্মিক পিতৃবিয়োগের সংবাদ, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, এবং দু-তিন বছর আদালতের ওকালতখানায় সাহেবী কায়দা কানুন প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর মুন্সেফিতে যোগদান।

ব্যক্তি হিসেবে পি. সি. পাত্র নির্দোষ, কারো ক্ষতি করার তিলমাত্র স্পৃহা নেই, উপরন্তু সুরসিক। তাঁর গাম্ভীর্যময় রসিকতা উপভোগ যোগ্য, কিন্তু সেখানে উচ্চহাস্যে সমর্থন অচল। তাঁর এজলাসে কাজ করতে হলে আইনজ্ঞানের চেয়ে ডেকোরাম অফ্ কোর্ট, এটিকেট, ম্যানারস ইত্যাদি সমূহ কায়দাকানুনের পুষ্টি থাকা প্রয়োজন। নয়তো সে উকিল পি. সি. পাত্রের চক্ষুশূল।

সকাল এগারোটা উনত্রিশ পর্যন্ত পি. সি. পাত্রর এজলাসে টেবিলের ওপর একটি দু-মুখো টেবিল ল্যাম্পের লালবাতি জ্বলে। এগারোটা উনত্রিশে নিভে যায়। তারপর এক মিনিট গ্রীন সিগন্যাল। ঠিক এগারোটা তিরিশে ডায়াসের পেছনদিকে হাকিমের চেম্বারের দরজার পর্দা সরে। বিচারকক্ষকে অভিবাদন করে পি. সি. পাত্র ন্যায়ের আসন গ্রহণ করেন। এ প্রথায় কোনোদিন অন্যথা নেই, তাঁর আবির্ভাব মুহূর্তের সামান্যতম হেরফের পর্যন্ত না।

এগারোটা তিরিশে ন্যায়াধীশ পি. সি. পাত্র এজলাসে উপস্থিত হলেন। সভা তটস্থ। উকিল, পেশকার, পিওন মনে মনে ডেকোরাম এটিকেট ম্যানার্স ইত্যাদি ঝালিয়ে নিচ্ছে। সর্বাগ্রে ভব্যতা প্রদর্শন, পরে সুবিচার প্রার্থনা।

পেশকারের দিকে এক মুহূর্ত তাকালেন পি. সি. পাত্র, সে দৃষ্টিতে মনে হয় কোনো কারণে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। খুব সম্ভব পেশকারের অতিরিক্ত ছিনতাই সম্বন্ধে রিপোর্ট কানে গেছে ; এ ব্যক্তির অল্পে পেট ভরে না ! এবং নেওয়ার ব্যাপারে আত্মীয়-পর বাছবিচার নেই। এমনকি সরকারি সংস্থা লাইফ ইনসিওরেন্স করপোরেশন, অথবা য়্যুনিয়ান অফ্ ইণ্ডিয়াকে পর্যন্ত বিবিধ ব্যয়ের খাতে খরচ লিখে অনিরুদ্ধপ্রসাদকে পেশকারের সামনে খুনের আসামীর পাশাপাশি দাঁড়াতে হয়। দরিদ্র চাষী, দুর্ধর্ষ ডাকাত, নৃশংস খুনী এবং স্বয়ং য়্যুনিয়ান অফ্ ইণ্ডিয়া একই দরের আসামী।

তীব্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পেশকারের দিকে তাকিয়ে থেকে পি. সি. পাত্র গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'Well Mr. Peskar, one rupee is reas-

onable, two permissible, four tolerable and about that is bribe; I warn you against that; এক টাকা ন্যায়সম্মত দুই প্রথাসম্মত, চার সহন-সম্মত, তদূর্ধ্বে যে অঙ্ক তা উৎকোচের পর্যায়ে পড়ে; সে সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে।'

তারপর সারাদিনের মধ্যে অনিরুদ্ধ পেশকারের নতশির আর ঊর্ধ্বমুখ হয় না, কয়েকটি ন্যায্য পাওনার উপযুক্ত নিরীহ শিকার হাতে পেয়েও শর হানতে ভুলে যায় সে।

পি. সি. পাত্রের এজলাসে একা যেতে চায় না উশ্রী, কি জানি কখন কি ভাবে অপদস্থ হতে হয়, কিন্তু পরেশ বসুর অনড় আদেশ এড়িয়ে যাওয়াও সহজ নয়। 'খেয়ে তো ফেলবেন না তোমায়। কোর্ট ইজ এ স্টেজ, হাকিম থেকে পেয়াদা, উকিল থেকে দালাল, সবাই অভিনেতা, আর যারা এখানে খরচ করতে আসে তারা দর্শক, তাদের মনোরঞ্জনের জন্যেই যত আয়োজন। বি বোলড্, গো টু দ্য স্টেজ, অ্যাণ্ড প্লে য়্যোর রোল উইথ বেস্ট অফ্ এবিলিটি অ্যাণ্ড জীল; দ্যাটস দ্য মিশন। হাকিমকে খুশি করতে তো তুমি যাচ্ছ না, যাচ্ছ মক্কেলের কাজ করতে, তার মোকর্দমা জিতে তাকে খুশি করতে। হাকিমেরও ঐ একই উদ্দেশ্য, যারা বিচার প্রার্থী ন্যায়ের মাধ্যমে তাদের খুশি করা।'

অতএব উপায় নেই। আগামীকাল আপিলের তারিখ। বিষয় খুবই ছোট, প্রধান বিচার্য আপিলকর্তার দাবি তামাদি কি না। সাব-জজ-কোর্ট তামাদি বলেই মোকর্দমা খারিজ করেছে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল। প্রায় সবটাই আইনের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে। উশ্রী তৈরি। প্রতিপক্ষ য়্যুনিয়ান অফ্ ইণ্ডিয়া, অর্থাৎ রেল-কোম্পানী।

নিজের পোশাক-আসাক সম্বন্ধে উশ্রী আজ খুবই সচেতন। আগে আদালতের বেশ, পরে ম্যানার্স। সাদা স্টীফ কলার ব্লাউজের গলায় কড়িঘষা কড়া পালিশের নতুন ব্যাণ্ড। আজকাল প্রায়ই সে কালো শাড়ির ওপর কালো কোট চাপায় না, শুধু গাউন জড়িয়ে নিলেই বেশ চলে যায়। আজ কোট পরল। অন্যদিন কপালে ছোট একটা কুমকুমের টিপ থাকে,

সেটি বাদ গেল। দু-হাতের আঙুলে নেল পালিশের দাগ তুলে ফেলল। মুখে অত্যন্ত লঘু প্রসাধন, যেভাবে ব্যারিস্টার সুশীলাপ্রসাদকে দেখেছে সে।

এত আয়োজন সত্ত্বেও উশ্রীর মনে একটা খুঁত থেকেই যায়, কারণ হাই-কোর্ট সারকুলারের মহিলা উকিলের পোশাক-নির্দেশনা নেই। পুরুষের বেশভূষা সম্বন্ধে যা বিধান তাই সে কতকাংশে অনুকরণ করে। সেখানেও কিছুটা ফাঁকা। পুরুষ অ্যাডভোকেটের নিম্নাঙ্গের পরিধেয় কি হবে সে সম্বন্ধে হাইকোর্ট সারকুলার নীরব।

বেলা এগারোটা নাগাদ উশ্রী পুরনো কাছারিতে পরেশ বসুর চেম্বারে গিয়ে পৌঁছল, ততক্ষণে পরেশ বসু এসে গেছেন। অন্য তিন জুনিয়ারও উপস্থিত। উশ্রীর গায়ের কালো কোট সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চতুর্দিকে স্মিত হাসির নীরব পরিবেষ্টন। স্নিগ্ধ লজ্জায় উশ্রীর মুখখানা রক্তাভ।

পরেশ বসু বললেন, 'স্টেজে নামতে যাচ্ছ, তোমার মেকআপ্ ভালোই হয়েছে। পার্ট তৈরি তো?'

'হ্যাঁ।' উশ্রী ঘাড় নাড়ে।

'যাও তবে, গুড্ লাক্।'

সিভিল কোর্টের ফটকের কাছে গিয়ে পড়ার আগেই উশ্রীর কানে এলো পি. সি. পাত্রর এজলাসের পেয়াদা মোকর্দমা পুকার করছে। বাসুকী-নন্দনের গলা সিকি মাইল দূর থেকেও পরিষ্কার শোনা যায়। 'ভোপাল সিং অ্যাপিল্যাণ্ট, কঁহা হ্যায় ভোপাল সিং অ্যাপিল্যাণ্ট, হাজির হো! রেসপনডেণ্ট য়ুনিয়ান অফ্ ইণ্ডিয়া, ভারত সরকার, হাজির হো-ও-ও।'

এজলাসে পা দেওয়ার আগে উশ্রী মনে মনে তিনটি কথা পুংখানুপুংখ-ভাবে আবৃত্তি করে নিল, ডেকোরাম অফ্ কোর্ট, ম্যানার্স, এটিকেট। নিজের পোশাকের দিকে আল্গা দৃষ্টি বুলিয়ে দেখল একবার। কোনো ত্রুটি নজরে পড়ল না। শুধু মুখটাই দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুবার আগে আয়নায় সে তিনশ'বার দেখেছে, মুখের কোথায় কি এখনো তা সবটাই মনে পড়ে।

এগারোটা উনত্রিশে টেবিল ল্যাম্পে সবুজ আলোর নিশানা। এগারোটা তিরিশে জজ সাহেবের মঞ্চে প্রবেশ।

একসময় জজ সাহেব পি. সি. পাত্র বলে উঠলেন, 'No, I don't agree with your view, আপনার সঙ্গে আমি সহমত হতে পারছি না, আপনি আইনের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। এ বিষয়ে কোনো নজির দেখাতে পারেন, any ruling?'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল উশ্রী, এ প্রশ্ন উঠবে তার জানা। 'না, ইওর অনার,' উশ্রী মাথা ঝুঁকিয়ে হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটের মতো কোর্টকে বাও করে, 'কিন্তু আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে ও নেই। আর একটি কথা আমি খুব সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলছি। আইন চিরদিনই ভুল ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে চলছে। আমরা প্রায়ই দেখি হাইকোর্ট আজ যে ব্যাখ্যায় একটা নজির তৈরি করছে, দু'দিন পরেই তা রদ হয়ে নতুন নজির! এমন কি যে ন্যায়াধীশ একা বসে একটি নজির তৈরি করছেন, পরে ফুল বেঞ্চ আদালতে তিনিই স্বীকার করেছেন তাঁর পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা ভুল। অতএব আমি আজ যা বলছি আগামীকাল তাই নজির হয়ে কেতাবে উঠবে কি না কে বলতে পারে?'

উত্তরে কি যেন বলতে গেলেন ন্যায়াধীশ, ইতিমধ্যে একটি সজোর হাঁচির শব্দ। পেশকার হাঁচি রোধ করতে পারে নি, কোর্টের ডেকোরাম নষ্ট করেছে।

ন্যায়াধীশ পি. সি. পাত্র একবার রোষ-কষায়িত চোখে পেশকারের দিকে তাকালেন, তারপর আর্দালি সোয়েব মিঞাকে বলেন, 'Orderly, tell the Peskar, in future if he wants to cough or sneeze, he must take my permission, go outside the court room, cough or sneeze, as the case may be—ভবিষ্যতে হাঁচি বা কাশির প্রয়োজন হলে আদালতের অনুমতি নিয়ে সে কাজ বাইরে গিয়ে সেরে আসতে হবে। আদালতের ডেকোরাম, আদব-কায়দা শালীনতা বিঘ্নিত করলে শাস্তিস্বরূপ পেশকারির স্বর্ণ সিংহাসন থেকে অপসৃত হয়ে রেকর্ড রুমের অন্ধকারায় নিক্ষিপ্ত হবে, যেখানে এক বিন্দু

উপরি আয়ের আলোক প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

ডেকোরাম; তা না হলে এ কথা শুনে উশ্রী বোধহয় সজোরে হেসে উঠত। এবং হয়তো বা সারা আদালতই—!

৩০

একই শহরে থেকেও দেখাসাক্ষাত প্রায় নেই বললে চলে। বোধহয় বছর দুই আগে একবার সন্ধ্যেবেলা সুজাগঞ্জ বাজারে ভ্যারাইটি শাড়ি হাউসে ললিতাকে দেখতে পেয়েছিল উশ্রী। ললিতা তখন কেনাকাটায় ব্যস্ত, সঙ্গে টি. এন. বি. কলেজের ফিলজফির লেকচারার স্বামী পরিমল সেন। প্রেম-পরিণয়ের দম্পতি উশ্রীর দিকে বিশেষ নজর দিতে চায় নি।

তবু উশ্রী একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'কি রে ললিতা, খবর কি তোর?'

'চলে যাচ্ছে।' কণ্ঠস্বরে নকল হতাশাব্যঞ্জক সুর টেনে জবাব দিয়েছিল ললিতা।

প্রথমাবধি ললিতার এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, বাক্যালাপে অনিচ্ছা, তা সত্ত্বেও উশ্রী অন্তর্নিহিত কৌতুকভরে প্রশ্ন করে, 'তোর কলেজ কেমন চলছে?'

নিজে যেন এ দুনিয়ার বাজারে একান্তই অকিঞ্চিৎ, এই ভঙ্গি প্রদর্শন করে ললিতা ঠোঁট উল্টে জবাব দেয়,'আমরা চুনোপুঁটি লেকচারার, আমাদের আর চলাচলি কি?'

আর কথা এগোয় নি। উশ্রীর সম্বন্ধে একটিও প্রশ্ন করে নি ললিতা। তার উপেক্ষা উশ্রী সহজভাবে নিতে পারে নি, তবু বেশ সহজ ভঙ্গিতেই সেখান থেকে সরে গিয়েছিল সে।

আজ সন্ধ্যেবেলা উশ্রী নিজের অফিসে ব্যস্ত। এ সময়টা সে সাধারণত মক্কেলদের ভিড় জমতে দেয় না। একা বসেই ব্রীফ পড়ে। যার না এলেই নয়, শুধু এই ধরনের মক্কেলেরই সন্ধ্যেবেলা আসার অনুমতি।

ললিতাকে আসতে দেখে একটু শুকনো হাসি মুখে নিয়ে উশ্রী অভ্যর্থনা

করে, 'কি খবর ললিতে সখি, তোমার উনি ছাড়া তুমি দেখছি যে?'

চেয়ার টেনে নিয়ে ললিতা বসে পড়ে, 'ও য়্যুনিভারসিটির কাজে একটু বাইরে গেছে, দিন দুই পরে ফিরবে।'

'তারপর হঠাৎ মনে পড়ল যে?' চোখের সামনে খোলা ফাইলটা উশ্রী একটু দূরে ঠেলে দেয়। ঠিক ললিতার মতো নিস্পৃহ ব্যবহার করতে পারে না সে, রুচিতে বাধো বাধো ঠেকে।

ললিতা সহজ হবার চেষ্টা করেও পারে না। তার কথার ভাব কিছুটা অপদস্থ হয়ে পড়ে, তবু নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে সে মৃদু হেসে উত্তর দেয়, 'একটা বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি, পরেশ বোসই পাঠিয়ে দিলেন, সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে শুনে বললেন, উশ্রীকে দিয়ে কাগজপত্র তৈরি করান, আমি ইনজাংশন ম্যুভ করে দেব। আমি তোর বন্ধু জেনে বললেন তাঁকে কোনো ফী দিতে হবে না। তবু দিতে গেলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই টাকা হাতে করলেন না।'

উশ্রী মনে মনে হাসল একটু। কিছুমাত্র বিবরণ না শুনেই বোঝা যায় ললিতার বিপদ কোন্‌খানে। হয় কলেজে সিনিয়ারিটির বিবাদ, নয় চাকরি যায় যায়। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে, বন্ধকী মহাজনীও প্রায় শেষ, এখন সিভিল কোর্টের যা কিছু রমরমা তার অনেকটাই বিশ্ববিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয়ের সূত্রে। তবে খেদের বিষয় অধিকাংশ অধ্যাপকই ব্যক্তিগত পরিচয়ের জের ধরে উকিল বাড়ি যায়। এ ব্যাপারে উশ্রীরও খানিকটা পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে। সে লক্ষ্য করেছে জীবনের উচ্চ ক্ষেত্রে চলে যাওয়ার পর অনেক কাজই বিনা ব্যয়ে সম্পন্ন করা যায়। দারিদ্র ও অপদস্থ জীবিকা জীবনকে সর্বত্রই বিপন্ন করে তোলে।

'কি বিপদ হলো তোর?' গাম্ভীর্যপূর্ণ নিঃশব্দ হাসি হেসে উশ্রী প্রশ্ন করে।

আনুপূর্বিক বলার জন্যেই তৈরি হয়ে বসেছিল ললিতা। ছ-সাত বছর সে মহিলা কলেজে অধ্যাপনা করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁবেদারিতে কনসিচ্যু-য়েন্ট কলেজ। আজ অবধি চাকরি পাকা হয় নি। মাঝে মাঝে কিছুদিনের মতো তাকে বসিয়ে রেখে চাকরিতে বিরতি এনে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি য়্যুনিভারসিটি সার্ভিস কমিশনে স্থায়ী পদের জন্যে ললিতা একটা ইনটারভিউ দিয়েছিল। কমিশন দুটি নাম অনুমোদন করে পাঠিয়েছে। প্রথম ললিতা। দ্বিতীয়টির নামও ললিতা, ললিতা মিশ্র।

ললিতা মিশ্র সদ্য পাস করা, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু তার পিতৃদেব ডীন অফ দ্য ফ্যাকালটি অফ আর্টস, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কেষ্টবিষ্টু। ললিতা মিশ্রই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়োগপত্র পেয়েছে, চার-দিনের মধ্যে আদালতের ইনজাংশান করাতে না পারলে সব বিষয়ে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উশ্রীদের ললিতাকে মুখ চুন করে কলেজ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

এ ধরনের অভিযোগ নিত্যই শুনছে উশ্রী। স্বাধীনতার পর থেকে সর্বত্রই দুর্নীতি, কিন্তু তার সবচেয়ে নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ শিক্ষাক্ষেত্রে। কমিশন প্রেরিত দুটি নাম থেকে নির্বাচনের অধিকার নিয়োগকর্তার অবশ্যই আছে, কিন্তু তা ন্যায়নীতি সাপেক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ক্রিয়া-কলাপই অর্পিত বিশ্বাস ও ক্ষমতার অপব্যবহার।

'তুই আমায় সাহায্য করবি তো?' অসহায় স্বরে ললিতা প্রশ্ন করে।

'আমার আর কাজ কি?' উশ্রী স্নিগ্ধ সহানুভূতির সঙ্গে বলে, 'তোর কাগজপত্র কি এনেছিস রেখে যা, কাল সন্ধ্যের মধ্যে প্লেণ্ট আর ইন-জাংশান পিটিশান তৈরি করে রাখব, পরশু কেস ফাইল হয়ে যাবে। অনেককাল পরে দেখা হলো, চা খাবি তো?'

'বলতে পারিস।' ললিতা উদাস গলায় বলে, 'চাকরির চেয়ে নোংরা কাজ আর নেই রে, তোরাই ভালো আছিস।'

'বাইরে থেকে তাই মনে হয় বটে!' উশ্রী কথা এড়ানো জবাব দেয়, তারপর বলে, 'ওপরে চল্, ওখানেই চা খাব। আমার ছেলে মেয়েদেরও দেখবি। আসিস না তো কখনো, যেন একেবারেই ভুলে গেছিস?'

উশ্রীর সঙ্গে সঙ্গে ললিতাও উঠে দাঁড়ায়, 'আমার সব কাগজপত্র তাহলে এখানেই রাখছি?'

ঘরের দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে উশ্রী উত্তর দেয়, 'ঠিক আছে, চল্ এখন! তবে পরশু তোকে কাছারিতে আসতে হবে, দুটো অ্যাফি-

ডেবিট হবে তোর।'

এই মুহূর্তে একটা সাক্ষাত আর্তনাদের মতো মুহুরী স্থচিতপ্রসাদ অফিস ঘরে ঢোকে। তার মূর্তি নিমেষেই উশ্রীর মধ্যে নিবিড় স্তব্ধতা এনে দেয়, মুখ দিয়ে কোনো কথা সরে না।

'সর্বনাশ হো গয়া দিদি', স্থচিতপ্রসাদ ডুকরে কেঁদে ওঠে, সমস্ত শোক-পরিবেদনা-অশ্রু সে যেন এই সময়টার জন্যেই এতক্ষণ রোধ করে রেখেছিল, 'বোসবাবু বোকীল সাম মে খুন হো গয়ে হেঁ।'

'এ কি বলছেন স্থচিতবাবু?' উশ্রী চিৎকার করে ওঠে, পরক্ষণেই হঠাৎ খুব শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে, 'কি হয়েছে সব পরিষ্কার করে বলুন?'

উশ্রী জিজ্ঞেস করে বটে, কিন্তু এ খুনের সম্ভাবনা তার পূর্বপরিজ্ঞাত। পরেশ বস্থ নিজেও জানতেন, তবু এক ধরনের জিদ এবং ওকালতির মতো স্বাধীন ও সম্ভ্রমপূর্ণ জীবিকার সম্বন্ধে চরম আত্মাভিমান তাঁকে আত্মরক্ষায় উদ্বুত করতে পারে নি। নিরাপত্তার আয়োজনে তিনি অসম্মান বোধ করেছিলেন।

পরেশ বস্থর কোনো সিদ্ধান্তে কখনো প্রতিবাদ করে নি উশ্রী, দিন চারেক আগে একবার করেছিল, আপনি কেন সর্দারী সিং-এর বিরুদ্ধে খুন আর ডাকাতি মোকর্দমায় সরকার পক্ষের ব্রীফ নিতে যাচ্ছেন? পাব্লিক প্রসিকুাটার অন্য কেস নিয়ে দীর্ঘ দিনের জন্যে বাইরে চলে গেছেন, পাঁচ-ছ'জন এ. পি. পি. ব্রীফ নিয়েও সর্দারী সিং-এর তরফ থেকে ধমকানির চিঠি পেয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। ডিসট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট আপনার বাড়ি এসে অনুরোধ করেছেন বলেই নিতে হবে?'

'হবে না, হাজার হোক মক্কেল তো?' পরেশ বস্থ স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় রসিকতা করেন, 'ডি. এম. আমায় চারটে আর্মড গার্ডও দিতে চেয়েছেন, কিন্তু আমরা কাগজ কলমের কাণ্ডারী, বন্দুকধারী দেখলেই হার্টফেল হয়ে যায়, তাই নিতে রাজি হই নি। অনুরোধ যখন করছ, বেশ আছে, দৈনিক বিশ টাকা বাঁধা মজুরিতে তোমার কাজ করে দেব। তার ওপর একখিলি পান বা এক পেয়ালা চা পর্যন্ত না। আইনে নিষেধ যে!'

'আপনি যদি না গেছেন তাহলে স্টেটের কাজ কি হবে না? তাছাড়া আর্মড সিকিউরিটি গার্ডই বা নেবেন না বলেছেন কেন?' উত্তেজিত স্বরে উশ্রী প্রশ্ন করে।

উশ্রীর উত্তেজনা দেখে পরেশ বসু হেসে ফেলেন, 'ওঃ, তুমি এখনো ছেলেমানুষই আছ!' তারপরই সুচিন্তিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথা বলেন তিনি, 'দেখ উশ্রী, আমরা স্বাধীন পেশার মানুষ, ব্যক্তিগত শত্রুতা কারো সঙ্গেই নেই। দেহরক্ষী পাশে নিয়ে চলা আমাদের পক্ষে সম্মানজনক নয়। দ্বিতীয়ত, ভারত সরকার হোক, বা রাজ্য সরকার হোক, কিংবা যে কোনো সাধারণ শ্রেণীর মক্কেলই হোক, আমি তাদের সমান চোখে দেখি, নিজের পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু নেওয়া নীতিবিরুদ্ধ। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মক্কেল তো আমায় দেহরক্ষী দিতে পারবে না, সেইজন্যে কি ভয়ে তার কাজ ছেড়ে দেব? সে অধিকার কি আমার আছে?'

'কিন্তু নিজের প্রাণের চিন্তা তো করবেন?' প্রতিবাদের ভাষায় উশ্রী বলে।

পরেশ বসু বিপুল বেগে ঘাড় নাড়েন, 'অবশ্যই! কিন্তু তা অপরের ভরসায় নয়। তাতে নিজের মান থাকে না। যেদিন বুঝবো এ ভয়টা জয় করতে পারি নি, সেদিন ওকালতি ছেড়ে দিয়ে আইনের বই লিখে খাব। আমি আজ সঙ্গে দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরলে সারা বার ডিমরালাইজড হয়ে যাবে। আজকাল অনেক কলেজের প্রিন্সিপাল, য়্যুনিভারসিটির হোমরাচোমরা অফিসাররা দেহরক্ষী রাখছেন, তাঁরা যাদের শিক্ষাদানে ব্রতী, তাদেরই ভয় করে চলেন। ছাত্ররা তো সার্কাসের বাঘ সিংহ নয়, প্রিন্সিপালও রিং মাস্টার নন। এতে উভয় পক্ষেরই হবে অপমান। আর ডাকাত সর্দারী সিং তার ন'জন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জেল হাজতে আছে, তখন এত ভয়টাই বা কি? অবশ্য দলের অনেক লোকই বাইরে।'

উশ্রী আর বিতর্কে যায় না, এবার আব্দারের সুরে বলে, 'এসব কথা আমরা শুনতে চাই না, আপনি ব্রীফ ফিরিয়ে দিন।'

পরেশ বসু ধীরে ধীরে মাথা দোলাতে থাকেন, যেন নীরব ভাষায় বল-

ছেন, না না না। তারপর সিগারেট ধরিয়ে মৃদু সুরভিপূর্ণ ধোঁয়া ছাড়েন তিনি, 'তা হয় না উশ্রী, আমি ছেড়ে দিলেও সরকারের কাজ আটকে থাকবে না, হয়তো বাইরে থেকে উকিল আনবে। সেটা শুধু আমার নয়, আমাদের বার-এর সাড়ে পাঁচশ' উকিলের কলংক। আমি সবদিকই চিন্তা করেছি।'

'বৌদির মত নিয়েছেন?' এবার একজন পূর্ণ নারীর মতো উশ্রীর প্রশ্ন।

আচমকা খুব জোরে হেসে উঠলেন পরেশ বসু, 'যে সব দাদারা বৌদি-দের মতামত নিয়ে বাইরে কাজ করেন, আমি তাঁদের মতো অতটা পত্নীভক্ত নই। তবে সে যদি বিধবা হয়, আমার খুবই কষ্ট হবে, কারণ নিজের চেয়ে কম ভালো তাকে আমি বাসি না। আমি যখন মাছি মারা উকিল, মাসান্তে পঞ্চাশ টাকাও ঘরে আনতে পারি না, সে তার প্রথম যৌবন, গায়ে একটা আস্ত ব্লাউজ নেই, পরনে ছেঁড়া সায়া, সেদিনও মুখ বুজে আমার নিরুপায় অক্ষমতার দায় সহ্য করেছে। পেটে ভাত নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও মুখভরা হাসির কখনো ঘাটতি হয় নি। আমি মারা যাওয়ার পর সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে তার পাশে থাকতে পারব না, এই যে দুঃখ!'

কথাটা বলার পরই পরেশ বসুর মুখ হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। সর্ব অবয়বে একটা বিমর্ষতার ভাব নেমে এলো যেন। তারপর আর একটি কথা বললেন না তিনি।

উশ্রীই প্রশ্ন করেছে, সমস্ত কাহিনী বিবৃত করার জন্যে সুচিতপ্রসাদ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু উশ্রী নিজেই খুব শান্তভাবে বলল, 'থাক সুচিতবাবু, শুনে আর কি করব, আমায় তো ওখানে যেতেই হবে।' এবার ললিতার দিকে তাকাল সে, 'ললিতা চল্, তোকে চা খাইয়ে দি, তারপর আমায় একটু বেরোতে হবে।'

ললিতা আপত্তি তুলতে গেল, সেকথা কানে নিল না উশ্রী। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের খতিয়ান তার নিজের মধ্যেই থাক, এতে কোনো অংশীদার নিতে চায় না সে। বুকের ভেতর থেকে ব্যথার পিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এসেছে, সেটা নীরবেই নিচের দিকে ঠেলে দেবার আয়োজন চলতে থাকে।

৩১

পরেশ বসুর আকস্মিক অথচ প্রায় অবধারিত মৃত্যুতে উশ্রী খানিকটা অসহায় হয়ে পড়েছে, কিন্তু তিনিই তার মনে স্বাধীন বৃত্তিতে একা পথ চলার সাহস স্পৃহা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। উশ্রীর পক্ষ নিয়ে আর একটি কথা বলা যায়, ওকালতিতে মাত্র আটটি বছরের পূর্তি, কিন্তু তার পাঁচ বছর আগেও যেসব উকিল বার-এ এসেছে তাদের তুলনায় আদালতের মাটিতে সে-ই অধিক দৃঢ়ভাবে স্থিত। অপরিসীম আত্মবিশ্বাস, তৎসঙ্গে মক্কেলদের আস্থা অর্জনে তার মতো কেউ সক্ষম হয় নি।

তবে আদালত প্রাঙ্গনে নিজের বিচরণ ক্ষেত্র উশ্রী অনেক ছোট করে নিয়েছে। বলতে গেলে ফৌজদারী থেকে তার প্রায় অবসর। জেলা-কোর্টে ওদিকটায় মেয়েদের পক্ষে অসুবিধে প্রচুর। দেওয়ানী আদালতের আবহাওয়া অনেক সহনীয়। সেখানে সাধারণ সৌজন্য ও আইনের কদর যথেষ্ট বেশি।

ফৌজদারি মোকর্দমার উকিলের মতো মক্কেলকে বলতে হয় না, 'সাক্ষী মেলাও, পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বশ কর, হাসপাতালের ডাক্তারকে আগে থেকে পাঁচশ' টাকা দিয়ে এস, যাতে আদালতে এসে বলে, বাদীর শরীরে এ ধরনের আঘাত তরোয়াল কিংবা চেলা কাঠ ছুটোর দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।'

অবশ্য সেসনস্ কোর্টের ব্যাপার-স্যাপার অনেক ভদ্র, অনেক মার্জিত, কিন্তু ও যে ফাঁসির দড়ির দোলনা, কে আর সাধ করে উশ্রীর মতো জুনিয়ার উকিলকে কাজ করতে নিয়ে যাবে? সেখানে বিনয় রায় তপেন্দু ব্যানার্জি, জ্যোতিনাথ মিশ্র, আর দরকার হলে পাটনা থেকে নাগেশ্বর প্রসাদ। অথবা শ্রীমতী সুশীলাপ্রসাদ।

তপেন্দু ব্যানার্জির কথায় উশ্রীর মনে পড়ে লোকটিকে কেন যে এতখানি ভয় করত, তা সে নিজেই সঠিক বুঝতে পারে না। অতিশুভ্র পলিতকেশ

সুগোর বৃদ্ধ। বয়সে পঁয়ষট্টির ওপারে চলে গেছে, কিন্তু তীক্ষ্ম তলোয়ারের মতো দেহে বয়সের কিছুমাত্র ভার গ্রহণ করেন নি।

উশ্রী শুনেছে ওকালতিতে আসার পর থেকেই তপেন্দু ব্যানার্জি ইংল্যাণ্ড-অধিপতি এডোয়ার্ডের মতো জুডিসিয়ারি ও এগজিকুট্যিভের বিরুদ্ধে হোলি ক্রুশেড লড়ে চলেছেন। বার-এর সাড়ে পাঁচশ' উকিল তাঁর অভিভাবকত্ব এবং নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।

বেঞ্চের সঙ্গে যে কোনো উকিলের বিবাদ বিতর্ক এবং সংঘর্ষে তপেন্দু ব্যানার্জি উকিলপক্ষের ব্রীফধারী। তাঁর পাশে চির অনুগত ষাটোত্তীর্ণ উকিল লক্ষ্মণ মাহাতো। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তপেন্দু ব্যানার্জি নির্দেশ দেন, 'বার অ্যাসোসিয়েশনকা এমারজেন্ট মিটিংকে লিয়ে রিক্যুইজিশান লিখো লক্ষ্মণ, প্রস্তাব নিতে হবে জুনিয়ার উকিলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে অমুক মুন্সিফ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত একসপ্তাহের জন্যে বয়কট করা হলো। এই প্রস্তাবের একটা প্রতিলিপি উক্ত অফিসারএকটা জেলা জজ এবং আর একটা প্রধান বিচারপতি পাটনা হাইকোর্টকে পাঠানো হবে, for necessary action against theofficer concerned; অফিসারেরবিরুদ্ধেউচিতব্যবস্থারজন্যে।'

এতেই ক্ষান্ত নন তপেন্দু ব্যানার্জি, বয়কট পর্ব উদ্‌যাপনের পর অপদস্থ জুনিয়ার উকিলকে সঙ্গে নিয়ে সেই হাকিমের এজলাসে গিয়ে হাজির হন তিনি। জুনিয়ার উকিল সওয়াল আরম্ভ করে, হাকিম তার প্রতি আগে থেকেই বিরক্ত, সামান্য খুঁত ধরে তাকে ভর্ৎসনা করার প্রবণতা গোপন থাকে না।

এবার উঠে দাঁড়ান তপেন্দু ব্যানার্জি, জুনিয়ার উকিলের মোকর্দমার পয়েন্ট তুলে নিয়ে তার তরফের সওয়াল নিজেই চালিয়ে যান এবং তাঁরও প্রচেষ্টা আইনের ব্যাখ্যা ও ঘটনা বিশ্লেষণে হাকিমকে প্রত্যাঘাত করা।

শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে মুন্সিফ ম্যাজিস্ট্রেট আপত্তি তোলেন, 'আপনি এমোকর্দমায় কথা বলছেন কেন, আপনার কি ওকালতনামা আছে?'

'আমি হুজুরকে আইনটা পড়ে দেখতে অনুরোধ করি, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিনা ওকালতনামাতে অ্যাড্ভোকেট আদালতকে সম্বোধন করতে

পারে।'

হাকিম মনে মনে আশংকিত, বলেন, 'বেশ, কি বলছিলেন বলুন, আমি অনুমতি দিচ্ছি।'

'I don't appear upon mercy of your honour;' গলায় বাঁধা দো-ফিতে ব্যাণ্ডের নিচে আঙুল চালিত করে তপেন্দু ব্যানার্জি নাড়াতে থাকেন, 'I stand on the lawful strength of this; আমি আপনার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী নই স্যার, এই দো-ফিতের জোরে এখানে হাজির হয়েছি।'

অতঃপর হাকিম আর মাথা তুলতে পারেন না, মুখ নিচু করে তপেন্দু ব্যানার্জির সওয়ালের সূত্রগুলি লিখে চলেন। অন্যমনস্কতার দরুণ কিছু-বা ছেড়েও যায় তাঁর।

এ সব ঘটনা বস্তুত অকিঞ্চিৎ,তাঁর ক্রুশেডার জীবনীতে অধিকতর উল্লেখ-যোগ্য অনুষ্ঠানের স্বল্পতা নেই।

কিছুদিন যাবত নতুন এস.ডি.ও.-র সঙ্গে তপেন্দু ব্যানার্জির অ-বনিবনার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। একা তপেন্দু ব্যানার্জিই নন, উকিল মাত্রেই যেন এস-ডি-ও-র চক্ষুশূল। তপেন্দু ব্যানার্জি এজলাসে ঢুকতেই তিনি বলে বসলেন, 'মিস্টার ব্যানার্জি, আমি লক্ষ্য করছি, আপনি বরাবর একটা ঝুঠো মোকর্দমা নিয়ে আমার এজলাসে হাজির হন।'

তপেন্দু ব্যানার্জি উত্তর দেন, 'এই মন্তব্যের দরুন আপনার অনুতাপ প্রকাশ করা উচিত। আপনি মন্তব্য ফিরিয়ে নিন।'

'Why? কেন? আপনার প্রতিটি মোকর্দমাই মিথ্যে,এ বিষয়ে আপনি নিজে জানেন না তা নয়।' মন্তব্য প্রত্যাহার দূরে থাক, এস. ডি. ও. দ্বিরুক্তি দ্বারা তার পুষ্টিসাধন করেন।

তপেন্দু ব্যানার্জি শান্ত স্বরে বলেন, 'Your honour may please apologise before me for this loose comment; এ ধরনের অসাবধান উক্তির জন্যে হুজুরের উচিত আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।'

'ওঃ,তাই নাকি! আমি আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার প্রসিডিং

করছি।' এস. ডি. ও. ত্বরিত হাতে অর্ডার সীট লিখতে আরম্ভ করেন। তপেন্দু ব্যানার্জি হাসেন, 'এর জন্যে আপনাকে সর্বাগ্রে স্টেট বার কাউন্সিলের অনুমতি নিতে হবে। তার আমি কি করতে পারি দেখা যাক।'
এস. ডি ও-ও এজলাস ছেড়ে তপেন্দু ব্যানার্জি বেরিয়ে গেলেন, তার পর রাজ্য সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ এবং এস. ডি. ও-র বিরুদ্ধে মানহানির ফৌজদারি মোকর্দমা করার অনুমতি প্রার্থনা।
অনুমতি-পত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ডিসট্রিকট্ ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে অভিযোগীর কাঠগড়ায় উঠে তপেন্দু ব্যানার্জি হলফ নিয়ে নালিশ করলেন, 'I complain against so and so Sub-Divisional Magistrate of— ; আমি অমুক মহকুমা সমাহর্তার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করছি যে—।' তাঁর পক্ষের ওকালতনামা সই করেছেন প্রায় তিনশ' উকিল। সাক্ষীর তালিকায় চল্লিশজন উকিলের নাম, যাঁরা বাস্তবিকই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।
সে মোকর্দমা অবশ্য আর অধিক দূর গড়ায় নি। বিচার বিভাগীয় তদন্তের সময় ডিভিশনাল কমিশনার ও ডিসট্রিকট্ অ্যাণ্ড সেসনস্ জজের মধ্যস্থতায় স-করমর্দন যবনিকাপাত।
হাকিমদের বিরুদ্ধে তপেন্দু ব্যানার্জির যুদ্ধ চিরন্তন, কিন্তু তিনি চিরদিনই ঘনিষ্ঠ, স্বল্প পরিচিত অথবা সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যবহারজীবীবর্গের দাদা। ঐ ডাকটির কাছে তপেন্দু ব্যানার্জির তপন-তেজ বিগলিত। তবু কেন যে উগ্রী তাঁকে ভয় করে—! শেষ পর্যন্ত মনে হয় এই আদালতের যত উকিল সবার সঙ্গেই তার স্বল্পাধিক পরিচয়, কিন্তু তপেন্দু ব্যানার্জি যেন প্রথমাবধি তাকে অগ্রাহ্য করে গেছেন, আর এইজন্যে যে কোনো সাধারণ মেয়ের মতো তার নারীচেতনা বিক্ষুব্ধ। অবহেলিত হওয়ার অভিমান ক্রমশই অকারণ ভীতিতে পর্যবসিত।
নতুন সিভিল কোর্ট বাড়িটিতে লয়ার্স ওয়েটিং রুমস্-এর সবচেয়ে বড় ঘরের একটি বৃহৎ টেবিল ঘিরে জন পনেরো সভাসদ নিয়ে বসেন তপেন্দু ব্যানার্জি। চিন্ময় ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, তারা সেন, ফটিক মুখুজ্যে, লক্ষ্মণ মাহাতো, নাগেশ্বর সিং, মহেশ্বরী সিং, নাথুনী প্রসাদ প্রমুখ নিয়মিত

সভ্যবৃন্দ। অনিয়মিতদের মধ্যে বিনয় রায় এবং আরও অনেকে। সদা-বদান্য দাদার পক্ষ থেকে অব্যাহত গতির আগন্তুক চা পান সিগারেট। তপেন্দু ব্যানার্জির টেবিল একজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসকের পরামর্শ সদনও বটে। তাঁর রোগীর তালিকায় সমগ্র ব্যবহার-জীবী সমাজ, সিভিল কোর্টের আমলা পেয়াদা এবং দায়গ্রস্ত হাকিম-বর্গ।

পরামর্শ ও ওষুধ বিনামূল্যে, এবং আরোগ্যের ফল শতকরা নব্বই। বিশেষত ডায়বেটিস আর ফ্যালেরিয়ার মতো দুরারোগ্য ব্যাধি, এমনকি তরুণ অবস্থার ক্যানসার পর্যন্ত তিনি নিরাময় করে চলেছেন। তবে বহু ক্ষেত্রে ওষুধের সঙ্গে নিত্যসেব্য অনুপান, drink water of your own system ; 'আপনি রোজ সকালে উঠে নিজের ফার্স্ট ইউরিন খালি পেটে আধ গেলাস খেয়ে নেবেন, তাতে ভবিষ্যতে কোনো রোগ কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

তপেন্দু ব্যানার্জি ভারতের এক অশীতিপর প্রখ্যাত রাজনীতিজ্ঞের নামোল্লেখ করে বলেন, 'শুধু এই নিয়মটুকু পালন করে তিনি যে কোনো তরুণ যুবকের মতন পরিশ্রম করে চলেছেন। এ অভ্যেস বজায় রাখলে রোগ বা জরা কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

সেদিন কি যেন হলো উশ্রীর, বুকের মধ্যে অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে সে তপেন্দু ব্যানার্জির টেবিলের সামনে এগিয়ে, বেশ সহজ সুরে বলল, 'দাদা, আমায় ওষুধ দিতে হবে, প্রায় দিন দশ বারো থেকে ছোট মেয়েটার সর্দিজ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না।'

তপেন্দু ব্যানার্জি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'আপনার হাজব্যাণ্ড তো ডাক্তার?'

উশ্রী ঘাড় নাড়ে, 'আমার অ্যালোপ্যাথিতে বিশ্বাস নেই।'

জবাব শুনে তপেন্দু ব্যানার্জি বিগলিত, বলেন, 'বসুন, চা খান। মেয়ের বয়স কত? ওষুধ কাল এনে দেব, নিয়ে যাবেন।' তারপরই তিনি উশ্রীর দিকে দুখানা বই এগিয়ে দেন, 'এগুলো নিয়ে যান, পড়ে ফেরত দেবেন।'

বইয়ের মলাটে উশ্রী নাম পড়ে, water of life, জীবন বারি, লেখক মিস্টার আর্মস্ট্রং, এবং দ্বিতীয়টি রাওজীভাই প্যাটেল বিরচিত গ্রন্থ মানব মূত্রম।

মৃদু সলজ্জ হাসি হেসে উশ্রী তাড়াতাড়ি বইখানি নিজের কালো ব্যাগে পুরে নেয়। তবে তপেন্দু ব্যানার্জির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর ভয় কেটে গিয়ে মন খানিকটা হাল্কা হয়েছে তার।

কাছারিতে পরেশ বসুর চেম্বারেই উশ্রী বসে। বার লাইব্রেরিতে উকিলের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে, চেয়ার ছেড়ে জল খেতে গেলে ফিরে এসে আর জায়গা পাওয়া যায় না। সিভিল কোর্টের নতুন বাড়িতে উকিলদের জন্যে যে দুটো বসার ঘর, তার একটি দিনকর সাহু নিজের দেড়ডজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ভরিয়ে রাখেন।

সিঁড়ির দক্ষিণ দিকের ঘরটি অপেক্ষাকৃত বড়। দু'খানি টেবিল গোটা পঁচিশ চেয়ারের অর্ধাংশে তপেন্দু ব্যানাজির রাজত্ব। বাকি বারোটার জন্যে অন্তত পঞ্চাশজন প্রতীক্ষমান উকিল।

উশ্রীর পক্ষে শ্রেষ্ঠতম জায়গা বলতে পরেশ বসুর চেম্বার। তাঁর অন্যান্য জুনিয়ারও এই ঘরে বসে। মাসিক আট টাকা ভাড়া, কে যে কখন চুক্তি করে টের পাওয়া যায় না। ভাড়া বাকি পড়ে না, হয়তো বা অগ্রিম জমা হয়। এ চেম্বারে চারজন উকিলের আসন সংরক্ষিত এবং সুরক্ষিত। উপরন্তু পুরনো মক্কেলরা সর্বাগ্রে এখানে এসেই উদিত হয়। পরেশ বসুর চেম্বার এখনো অবধি তাঁরই খ্যাতির গুড্‌উইল, উশ্রী যার একজন উত্তরাধিকারী।

টিফিনের সময় জন তিনচার হাস্যমুখ সদ্য-বার-জয়েন-করা উকিল চেম্বারে এসে ঢুকল। তাদের একজন উশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'নমস্কার মিসেস মুখার্জি।' তারপর পরেশ বসুর উপস্থিত অপর দুই জুনিয়ারের উদ্দেশ্যেও নীরব নমস্কার জানাল তারা।

তিনজনের পক্ষ থেকে উশ্রী মৃদু আপ্যায়নের হাসি হেসে আমন্ত্রণ জানায়, 'বসুন আপনারা। অ্যানুয়াল সোস্যাল গ্যাদারিং-এর চাঁদা তো?' 'আগে

চা খান, পরে কাজের কথা হবে।'

একজন জুনিয়ার মৃদু হেসে উত্তর দেয়, 'চা তো আমরা খাবোই, না খেয়ে বিদায় হচ্ছি না। কাছারি মানেই চা পান সিগারেট। কিন্তু এবার আপনাদের চাঁদার রেট বেড়ে গেছে। আর দশে হবে না, অন্তত পঁচিশ টাকা করে। আপনারা তিনজনেই এখন সিনিয়ার। পরেশ বসু একাই একশ'এক দিতেন। এ ক্ষতিও আপনাদের পুষিয়ে দেওয়া উচিত।'

পরেশ বসুর নামোল্লেখ হতে উত্রী একটু গম্ভীরভাবে বলে, 'আমাদের যা দিতে বলেন তাই দেব, কিন্তু ক্ষতিপূরণ করতে পারব না। সব ক্ষতি কি পুষিয়ে দেওয়া যায়?'

পরেশ বসুর প্রথম জুনিয়ার সত্যেন্দ্র সিং একটু যেন ক্ষুব্ধ গলায় প্রসঙ্গ বিস্তারিত করে,'বার ইজ ওপন্ টু অল, বেকারের মিছিল-প্রবাহ কোনোদিন বন্ধ হবে না। এই একটা জায়গা, যেখানে বেকার থেকেও এম্প্লয়েডের তালিকায় নাম রেখে লজ্জা কাটানো চলে, কিন্তু এত ভিড়েও পরেশ বসু একযুগে দুটো হয় না।'

একজন চাঁদা-প্রার্থী সখেদে বলল,'আমরা একথা বলতে চাই নি সত্যেন্দ্রবাবু। পরেশ বসু আমাদের কালো কোটের ইজ্জৎ অনেক বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। ওকালতি পেশা বলতে কি বোঝায়, তিনি তার জীবন্ত অভিধান ছিলেন।'

চা খাওয়ার পর তারা চাঁদা নিয়ে ও ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।

আটত্রিশ দিনের পূজাবকাশ। মহালয়া থেকে নিয়ে অনেকগুলি পাল-পার্বণ তে[illegible]বার অতিক্রম করে দেওয়ানী আদালত খুলবে প্রায় শীতের মুখোমুখি। তখন শরৎ শেষ হয়ে হেমন্ত অবধি অতিক্রান্ত হতে চলেছে। সওয়া মাস পরে দেখাসাক্ষাতের প্রথম পর্ব বার-অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের আলিঙ্গনাদি এবং কুশল বিনিময়। মুসলমান এবং ক্রীশ্চান সভ্যরাও এ অনুষ্ঠানে সমান আগ্রহী।

এবং আর একটি ব্যাপার উত্রী আট বছর যাবত লক্ষ্য করে আসছে, পুজোর ছুটির পর কাছারি খোলার প্রথম দিনেই দু-একজন উকিলের অবধারিত মৃত্যু সংবাদ। লাইব্রেরিয়ান সুশীল ঘোষ লিখিত শোক-

প্রস্তাব তৈরি। বার লাইব্রেরির সেণ্ট্রাল হলে শোক সভা, এবং তারপব জজকোর্টে ডেথ্ রেফারেন্স।

সারা বছরের মধ্যে এই একটিমাত্র দিন, বাৎসরিক বন্ধের পূর্ববর্তী সন্ধ্যেবেলা বার লাইব্রেরি হলে বার্ষিক সম্মেলন। আমন্ত্রিত বলতে শুধুমাত্র জুডিসিয়াল অফিসারবর্গ। বড় জজসাহেব থেকে আবন্ত করে, সবচেয়ে ছোট পর্যায়েব শিক্ষানবীশ মুন্সিফ পর্যন্ত।

এ অনুষ্ঠানে এগজিক্যুটিভের সম্পর্ক নেই। কালেক্টর কমিশনার অবধি বিস্মৃত। অথবা উপেক্ষিত। তাঁরা চব্বিশ ঘণ্টাই হাকিম। তাই বোধহয় পবাধীন বৃত্তির বন্ধনমুক্ত উকিলরা এঁদের সাহচর্য তেমন পছন্দ করেন না। ভেতরের ব্যাপার যাই থাক, এ রীতি এবং মনোবৃত্তি উশ্রীর মোটেই পছন্দ নয়। তার ভালো লাগে না।

এই অপূর্ব সন্ধ্যাটিতে হাকিম উকিলের ক্ষীণতম ব্যবধান পর্যন্ত বিলুপ্ত। সাহিত্যরসিক অ্যাডভোকেট জ্যোতিনাথ মিশ্র সরস অভিব্যক্তির সঙ্গে সমস্ত জুডিসিয়াল অফিসার এবং বাছা বাছা উকিলদের সম্বন্ধে রসসিক্ত কড়চা পাঠ করেন। তারপর কিছু রঙ্গ রসিকতা ও কিছু সঙ্গীত।

দু-একটি গান উশ্রীকেও গাইতে হয়। রেডিও অথবা গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে তোলা গানই গায় সে। সঙ্গীত সাধনা বলতে কিছুই না, তবু সুরেলা মিষ্টি গলায় সে গান বেশ মানিয়ে যায়। গানের পর খুশির হাততালির বহর দেখে উশ্রীরও নিজেকে একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী বলে মনে হয়।

গান শেষ করে উশ্রী এসে নিজের জায়গায় বসেছে, পরবর্তী অনুষ্ঠান স্বরূপ কবি-উকিল নবলকিশোব প্রসাদ অঙ্গিকা ভাষায় স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন, অর্থাৎ গানের সুরে আবৃত্তি। এরপর নিজের লেখা কবিতা পাঠ করবেন প্রথম অতিরিক্ত সাবজজ নন্দকিশোর নন্দ, তার জন্যে পকেট থেকে কাগজপত্র বার করে তৈরি হচ্ছেন তিনি।

ইতিমধ্যে বড় জজসাহেব নিজের জায়গা ছেড়ে উশ্রীর কাছে উঠে এলেন, 'মিসেস মুখার্জি, আপনি এক মিনিট আমার সঙ্গে আসুন?'

'হ্যাঁ স্যার।' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল উশ্রী, তারপর জজসাহেবের সঙ্গ নিয়ে হাকিমরা যে দিকে বসেছেন সে দিকে এলো।

সুবেশ তরুণ দর্শন অথচ সর্বাঙ্গে সৌম্য গাম্ভীর্যের অভিব্যক্তি বিজড়িত এক ব্যক্তির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে জজসাহেব বললেন, 'আপনি তো সবে পরশু জয়েন করেছেন মিস্টার সেন; এখানে ইনিই একমাত্র মহিলা উকিল, উশ্রী মুখার্জি, খুবই রাইজিং।' তারপর উশ্রীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এঁর কোর্টে অ্যাপিয়ার হবার আপনার সুযোগ হয়েছে মিসেস মুখার্জি?'

সপ্রতিভ উশ্রী বেশ সহজভাবে উত্তর দিল, 'এখনো হয় নি, তবে পুজোর ছুটির পর থেকেই হবে স্যার।' তারপর বিনম্র হাসি হেসে নতুন ফার্স্ট সাবজজ সুধীর সেনকে হাত তুলে নমস্কার করল সে।

প্রতি নমস্কার জানিয়ে সপ্রশংস ভাষায় সুধীর সেন বললেন, 'আমি প্রায় সব জেলাতেই ঘুরেছি, কিন্তু আপনাদের এখানকার মতো এমন চমৎকার সোস্যাল গ্যাদারিং অন্যত্র দেখি নি। বেঞ্চ-বার-এর এতখানি কর্ডিয়াল আর হেলদি রিলেশানও কোথাও দেখা যায় না।'

ওদিক থেকে ফিরে এসে উশ্রী আবার নিজের জায়গায় বসল। নতুন সাবজজের যে মন্তব্য, সে কথা প্রায় সব হাকিমই বলেন। তারপর দু-এক বছরের মধ্যে অন্যত্র বদলি হয়ে গিয়েও কি তাঁরা আজকের মতো সন্ধ্যের কথা স্মরণ রাখেন? হয়তো কারো কারো মনে থেকে যায়, অধিকাংশেরই থাকে না। তবু তাঁদের এই মুহূর্তের মনোভাব, নিজের নিজের চেয়ারের ওজন এবং গাম্ভীর্য ভুলে এমন সুন্দর একটি সন্ধ্যেয় উকিলদের সঙ্গে একাত্মা হয়ে যাওয়া, এরও মূল্য কম নয়।

উকিল ও হাকিমের সুষ্ঠু সম্পর্ক না থাকলে ন্যায়ের চাকা ঠিকমতো ঘুরতে পারে না। পারস্পরিক সন্দেহ এবং অবিশ্বাস যেখানে প্রবল সেখানে ন্যায়বিধি বিমুখ হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বিচিত্রানুষ্ঠানের পর নৈশাহার। পরিবেশনের সময় সর্বদাই উশ্রীকে অগ্রণী হতে হয়, যদিও আরও কয়েকজন সুপটু ও উৎসাহী উকিল সঙ্গে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার গৃহীনিত্ব সবারই কাম্য।

খাওয়ায় বিরতি দিয়ে নতুন সাবজজ সুধীর সেন অসহায় ভঙ্গিতে মাথা তুললেন, 'মিসেস মুখার্জি, আপনি দেখছি আমায় আকণ্ঠ খাইয়ে মেরে ফেলবেন ?'

'এ অভিযোগ আর কেউ করেন নি স্যার', উশ্রী মধুর হেসে জবাব দেয়, 'আপনি তো দেখছি কিছুই খাচ্ছেন না।'

সাবজজের পাশেই প্রথম অতিরিক্ত সাবজজ নন্দকিশোর নন্দ। তাঁর পাতে মাংস ও পোলাও মিলিয়ে সের দেড়েকের স্তূপ, তিনি সে পর্বত অপসারণে ব্যস্ত, তবু উভয় পক্ষের কথা শুনে কাব্যাবৃত্তি করেন, 'সামনে যব আ যাতা হায় খানা, রে সিপাহী, কভী পিছু ন হটনা।'

নন্দকিশোর নন্দের কবিতা শুনে সুধীর সেন হেসে ফেলেন, তারপর পুনরায় প্রাচীন অসহায়তার আশ্রয় নেন তিনি, বলেন, 'আমায় এত খাওয়ানোর পরও আপনারা একথা বলবেন ?'

কয়েকবারই দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে, কিন্তু এইবার যেন উশ্রী লক্ষ্য করে নতুন সাবজজের চোখের আলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মুখের ওপব পড়ে স্থির হয়ে রইল। সেই সময়টুকুর মতো তার নিজের চোখ দুটিও অপলক। কতই বা বয়স ভদ্রলোকের ? চেহারায় অনুমান হয় পঁয়-তাল্লিশের নিচে। ইতিমধ্যেই হয়েছেন সিনিয়ার সাবজজ। বোধহয় এক-দেড় বছরের ভেতরই অ্যাডিশনাল জজের পদে উন্নীত হয়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া আসামীর গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেবার অধিকার অর্জন করবেন।

নিজের ভাবান্তর সামলাবার উদ্দেশ্যে সাবজজ সাহেবের প্লেটে আর দুটি মিষ্টি চাপিয়ে দিয়ে উশ্রী বলল, 'এ দুটো আপনাকে খেতেই হবে, ফেললে চলবে না।'

নিরুপায় অগত্যা ইত্যাকার সুর গলায় এনে সাবজজ সাহেব জবাব দিলেন, 'তা তো খেতেই হবে! কিন্তু পরিবেশনের ভার আপনার ওপর আছে জানলে আমি সাহস করে আসতামই না।'

সাবজজের কথা কুড়িয়ে নিয়ে জজসাহেব সহাস্যে মন্তব্য করেন, 'এখান-কার বার-কে তো আপনি জানেন না, তারপরই রিজোল্যুশান করে

আপনার কোর্ট বয়কট হয়ে যেত। All of them are great fighters; এঁরা সকলেই প্রখ্যাত যোদ্ধা।'

বয়কট, গ্রেট ফাইটার্স, এই ধরনের দুটি শক্ত শব্দ সমন্বিত মন্তব্য শুনে সুধীর সেন খাওয়া বন্ধ করে জজ সাহেবের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না স্যার?'

উশ্রী সামনে দাঁড়িয়ে, সে মৃদু হেসে সুধীর সেনের দিকে তাকাল।

পুনরায় দৃষ্টি বিনিময়, জজ সাহেবের অলক্ষ্যে, এবং ভোজনব্যস্ত নন্দকিশোর নন্দের অগোচরেও। উশ্রী কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যত্র দৃষ্টি চালনা করে দিয়েছে, যদিও এ টেবিলের সামীপ্য ছেড়ে অন্যদিকে যেতে পারছে না সে।

বাঁ হাতের তর্জনী তুলে জজ সাহেবের ঘরের দক্ষিণ কোণ নির্দেশিত করেন, 'ঐ ওখানে যে ব্যক্তিটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছেন, স্টীল মেড শোর্ডের মতো শাণিত সুগৌর চেহারা, উনি সর্বদা নিজের মেজাজে ধার দিয়ে রেখেছেন, যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন।'

কৌতূহলী সুধীর সেন প্রশ্ন করেন, 'নাম কি ওঁর?'

'তপেন্দু ব্যানার্জি, সিনিয়ার অ্যাডভোকেট।'

'খুব ঝগড়া করেন বুঝি?'

'ঝগড়া নয়, ধর্মযুদ্ধ।' গাম্ভীর্যের সঙ্গে জজসাহেব উত্তর দেন, তারপর বলেন, 'এস. কে. ব্যানার্জির মতন কড়া আর রাশভারি জজকে দিয়ে পর্যন্ত উনি দাদা বলিয়ে ছেড়েছিলেন। শেষাবধি তাঁকে তপেন্দু ব্যানার্জির বাড়ি গিয়ে বলতে হয়েছিল, 'দাদা, অনিদ্রা রোগে ভুগছি, আমায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিন। আমরা সবাই ওঁর পেশেন্ট। আপনার শরীরে কোনো রোগ নেই তো?'

ঘাড় নাড়েন সুধীর সেন, 'না তো!'

'তার জন্যে চিন্তা নেই,' জজসাহেব বলেন, 'দু-চার সাক্ষাতের মধ্যেই উনি আপনাকে অসুস্থ করে ফেলবেন, তারপর নিজেই ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তুলবেন।'

কথার শেষে জজসাহেবের উচ্চহাস্য টেবিলে উপস্থিত অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই হাসিতে সুধীর সেন উশ্রীর হাসিও যুক্ত হয়েছে। অবাক চোখ তুলে নন্দকিশোর নন্দ প্রশ্ন করেন, 'Anything wrong with me ; কোনো দোষ করে ফেলেছি নাকি ?'
জজ সাহেব উত্তর দেন, 'না, না, নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে যান, আপনি তো মিস্টার তপেন্দু ব্যানার্জির রেজিস্টার্ড পেশেন্ট, তবে আর ভয় কি ?'
এবার আর জজসাহেব হাসলেন না, কিন্তু সুগম্ভীর সুধীর সেনের মুখ-খানা আবার হাস্যরেখায়িত হলো। উশ্রীর মুখেও মৃদু হাসি, সুধীর সেনের দৃষ্টি পড়ে তা কিঞ্চিৎ লাজরাতুল হয়ে উঠেছে।

৩২

পরেশ বসুর চেম্বারের সঙ্গে উশ্রীর সম্পর্ক এখন অত্যন্ত ক্ষীণ। বলতে গেলে ও দিকটা সে আর মাড়ায় না। হয়তো তার নিজেরই খানিকটা সংকোচ, আজকাল কেউ কি তাকে তেমন সুনজরে দেখে ?
ভাগলপুর বার-এ প্রায় সাড়ে পাঁচশ' অ্যাডভোকেট, মনে হয় তারা সবাই মিলে একটি গোষ্ঠী, আর উশ্রী নিজে একা একটি দল, ঐ সাড়ে পাঁচশ'র হিসেব থেকে স্বতন্ত্র।
আর ওদিকে প্রায় পঁয়ত্রিশজন জুডিসিয়াল অফিসার। ইদানীং তাঁরাও বোধহয় উশ্রীকে বিশেষ প্রীতি বা সম্ভ্রমের চোখে দেখেন না। কোনো মোকর্দমা নিয়ে সেসব আদালতে হাজির হলে বুঝতে পারা যায় সর্বত্রই তাল কেটে গেছে। নিজের দিকে তাকিয়ে উশ্রী অনুভব করে সে যেন সাড়ে পাঁচশ' উকিলের মধ্যে বিশিষ্ট একজন, কিন্তু অত্যন্ত নির্মমভাবেই একঘরে।
এখন আদালতে উশ্রীর ঘর বলতে একটিই; ফার্স্ট সাবজজ সুধীর সেনের এজলাস। দেওয়ানী আদালত হিসেবে সবচেয়ে ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক অধিকারের ক্ষেত্র যার অপরিমেয়। টাকার অঙ্কে সারা ভারতের

যা দাম তার চেয়ে বেশি মূল্যের মোকর্দমার বিচার এখানে। উপরন্তু অ্যাসিসটেন্ট সেসনস্ জজের ক্ষমতা, দশ বছর পর্যন্ত কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার অধিকার সম্পন্ন।

দেওয়ানী ফৌজদারী যে কোনো মোকর্দমায় এক পক্ষের উকিল উশ্রী, এবং কেস যদি খুব খারাপ না হয়, ন্যায়ের পাল্লা অবধারিতভাবে তারই দিকে ঝুঁকে আসবে। উশ্রীকে নিযুক্ত করার পর, Courts are always uncertain ; আদালতের মতিস্থিরতা নেই ; এ সংশয় থাকে না। মাঝে মাঝে দু-পক্ষই এসে তার কাছে ধর্না দেয়। তখন উভয় তরফের ওজন পরখ করে সে একটি দিকের ব্রীফ হাতে নেয়।

অবিরাম অর্থের প্রবাহ, অনুক্ষণ কত ধনী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির আকুল অনুনয়ভরা আকুতি, তবু উশ্রীর মাঝে মাঝে নিজেকে কেমন ক্লান্ত মনে হয়। এ শ্রান্তি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বিরামহীন পরিশ্রমের নয়, তা তার সুপরিজ্ঞাত।

যে পরিশ্রমে প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে উঁচু হারের পারিশ্রমিক ও পুরস্কার যুক্ত, তাতে শ্রান্তির আঁচ বা অবসাদময় বিষণ্ণতা গায়ে লাগে না। এই শ্রান্তির কারণ উশ্রী নিজেই নির্ণয় করেছে, প্রায়ই এ জীবনটা তার কাছে এক অর্থহীন বোঝার মতো মনে হয়। সে যেন ক্রমশই নিজের একাকিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। বদ্ধ ঘরের বাতাসে নিশ্বাস নিতে নিতে স্বকীয় আভ্যন্তরীণ বিষে জর্জরিত।

ভাস্কর চিরদিনই দূরে, বাহ্যিক বিচারে সে দূরত্ব হয়তো খুব বেশি বাড়ে নি, কিন্তু তার চোখের কোণে উশ্রী আজকাল ঘৃণার রেশ দেখতে পায়, স্পর্শেও একই অভিব্যক্তি। কখনো সখনো তার মনে হয়, পুরুষ জাতটা বোধহয় ঘৃণ্য পদার্থ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে এক ধরনের পৈশাচিক পরিতৃপ্তি পায়, তাই ভাস্কর তাকে একেবারে পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারে নি।

অনবসর !

সারা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ির অফিস খোলা রাখলেও এক সেকেণ্ড খালি থাকবে না। বিকেল পাঁচটা নাগাদ কাছারি থেকে ফেরার পরই তবু উশ্রীর সব কাজের বিরতি। তখন যত দামী মক্কেলেই হোক তার আর

নাগাল পাবে না। সন্ধ্যে থেকে তার অফিস বহিরাগত, এমনকি বাড়ির লোকের জন্যে পর্যন্ত, নিষিদ্ধ এলাকা। ভাস্কর বাড়ি এলে ভুলেও এ অঞ্চল মাড়ায় না।

উশ্রী অফিসে বসে কখনো বা আগামীকালের মোকর্দমার নথি দেখে, কিংবা অফিস সংলগ্ন ছোট ঘরটাতে গিয়ে ডিভানের ওপর গা এলিয়ে বিশ্রাম নেয়। আর প্রতীক্ষা করে।

আদালতের আঙ্গিনায় কত জাতেরই মানুষ তো দেখল উশ্রী, আর দেখল আইনের পরকলার ভেতর দিয়ে; ধীরেন গুপ্ত, সুশীলাপ্রসাদ পরেশ বসুর মতো মানুষ, যাঁরা সাফল্যের তুঙ্গশীর্ষে সার্থক। দেখল আনন্দি ঝা'র মতো ব্যর্থ আইনজীবিকে, যিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে কৌতুকে-রহস্যে অসাফল্যকে তুড়ি মেরে অস্বীকার করে গেলেন। আজ দেখছে এ আসরে নতুন এক অভিনেতাকে—সাবজজ সুধীর সেন। তিনি ঐ দলেরই, দশ-জনে একজন। কিন্তু না, এই নবাগতকে উশ্রী একই ভাবে নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় তার কর্মক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারল না।

অধিকাংশ দিন সওয়া সাতটা নাগাদ সাবজজ সুধীর সেন আসেন, ঘড়িতে পৌনে ন'টা হলে বিদায় নেন। এ হিসেব প্রায় নিয়মিত। তবু তিনি চলে যাওয়ার পর উশ্রীর মনে হয়, এতক্ষণ একসঙ্গে থেকেও সে যেন গভীর শূন্যতার মধ্যে কাটিয়েছে। সমস্ত আলাপ আলোচনা সম্ভাষণ সাহচর্য অচেতন স্বপ্নের মধ্যে লীন, স্মৃতি বা সঞ্চয়ের খাতে তার একটি বিন্দুও তোলা সম্ভব নয়।

খুব খুশির ভাব নিয়েই সেদিন সুধীর সেন এলেন, 'উশ্রী, তোমার জন্যে একটা শুভ সংবাদ আছে।'

'আমার অশুভই বা কোন্‌দিন, তবু বলুন শুনি কি শুভ সংবাদ?' সর্ব-জ্ঞের নকল উদাসীনতার ভাব উশ্রীর প্রশ্নে।

সুধীর সেন উশ্রীর ডিভানের কাছে আরও একটু এগিয়ে আসেন, 'বল তো, কি হতে পারে?'

উশ্রী হাত বাড়িয়ে সুধীর সেনের ডান হাতের তিনটে আঙুল ধরে ফেলে, 'না বললে কি করে বুঝব, আমি তো জ্যোতিষী নই? তবু আপনার মুখ

দেখে মনের কথা খানিকটা বুঝতে পারি, কিন্তু বাইরের সব খবর কি করে জানব ?'

উশ্রীর বুক ঘেঁষে সুধীর সেন বসে পড়েন, তারপর তার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলেন, 'আজ গেজেট নোটিফিকেশান্ বেরিয়েছে, আমি অ্যাডিশনাল ডিসট্রিকট্ অ্যাণ্ড সেসনস্ জজ-এ প্রমোশন পেয়েছি। বিহার জুডিসিয়াল সার্ভিসে বয়সের দিক থেকে কনিষ্ঠতম জজ, হয়তো একদিন হাইকোর্টেও চলে যেতে পারি।'

এতখানি শুভ সংবাদ উশ্রী ঠিকমতো কানে নেয় না। একটি কথা তার মনে পড়ে যায়, দুপুর বেলা তাকে শুনিয়েই যেন একজন জুনিয়ার উকিল অপর একজনকে বলছিল, 'ছিলেন ইনি সাবজজ, হলেন জজ। Skin is more precious than gold, সোনার চেয়ে সুন্দরীর দেহত্বকের দাম অনেক বেশি ! মোরারজী দেশাই-এর উচিত ছিল গোল্ড কন্ট্রোলের আগে এদিকটা কন্ট্রোল করা, আমরা প্রাণে বাঁচতুম।'

দ্বিতীয় উকিলটি উত্তর দেয়, 'তোর হিংসে হচ্ছে নাকি ? কিন্তু ও দিকটা চিন্তা করে দেখ তো ? ভোগদখল করছেন মাত্র একজন, আর বাদবাকি বত্রিশজনের ইংরেজি কায়দায় উইনডো সপিং। দূর থেকে দেখেই তাদের পেট ভরাতে হচ্ছে।'

'সুভাষদা তো একটু আধটু লেখেন টেখেন, বলতে হবে একখানা রম্-রমে কিছু লিখে ফেলতে। নিমাই ভট্টাচার্য এখানে এসে আমাদের বার লাইব্রেরি নিয়ে য়্যোর অনার উপন্যাস লিখলেন, লেখাটা বেশ নামও করেছে, কিন্তু নায়িকা সংবাদ একেবারেই ওমিটেড্। আসলে বহিরা-গতের দৃষ্টি তো, ভেতরের ব্যাপার স্যাপার চোখে পড়ে নি !'

এরপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত উশ্রীর মস্তিস্কের স্থিরতা ছিল না। তবু নির্বিকার ভাব দেখিয়ে ঐ উকিলদের পাশ দিয়ে হেঁটে সে নিজের মোটরের দিকে এগিয়ে গেছে। কথা শুনে তখন মস্তিষ্ক গরম হয়ে উঠলেও সম্পূর্ণ ব্যাপা-রটা যেন ঠিক বোধগম্য হয় নি।

সমস্ত চিন্তা উশ্রীর একটিমাত্র জায়গায় কেন্দ্রীভূত। সুধীর সেন এখানে আসার পর থেকেই সে যেন আলাদীনের দৈত্যের গড়া সিঁড়ি বেয়ে

অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সাধারণের পক্ষে সে স্থান অনধিগম্য। কিন্তু সেখান থেকে আর নিচে তাকাবার উপায় নেই। সে ভাবনা মনে এলেও চেতনা বিলুপ্ত হয়।

উশ্রী জানে তার এতখানি উঁচুতে অবস্থানের মেয়াদ সুধীর সেনের স্থিতিকাল পর্যন্ত। তারপরই অনিবার্য অধোগতি। হয়তো সেখান থেকে তাকে আর খুঁজে বার করা যাবে না।

'প্রমোশন, মানে সেই সঙ্গে বদলিও তো?' আশংকিত স্বরে উশ্রী প্রশ্ন করে।

'না, আপাতত এখানেই, তবে চিরদিন তো আর নয়। আমি যেখানেই যাই তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব।'

সুধীর সেনের সর্বাঙ্গ উশ্রীর পূর্ণায়ত যৌবনময় দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে। তারপর অসীম নীরবতার মাঝে অজস্র সুখদ মুহূর্ত!

কিন্তু অবসাদ মুহূর্ত অতিবাহিত হওয়ার পর সুধীর সেন আবার সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে ফিরে আসেন। ব্যক্তিত্বের একান্ত সমীপে। জীবনক্ষেত্রে যে আসনে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত, উশ্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর সে আসনের সম্ভ্রম ও মর্যাদা কি ক্ষুণ্ণ করে ফেলেন নি?

না, স্বীয় অন্তর জগতে স্থিত সুধীর সেন বাহ্যিক নীরব ভঙ্গিমার মধ্যেই সজোরে মাথা নাড়েন যেন, উশ্রীর সঙ্গে তাঁর যা সম্পর্ক তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ, বাইরের জগতে কিছুমাত্র অতিদেশ নেই। বর্তমান দাম্পত্য জীবনে উশ্রী অসুখী, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তাঁরই জীবনে তার আগামী জীবনের সামগ্রিক সম্পর্ক চিহ্নিত হয়ে রয়েছে!

৩৩

একটুও অবাক হয় নি অবন্তী, সব কিছু কেটে যাওয়ার পর এতখানি সময়ের কালাতিপাত, তবু শ্যামলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হলো, যা স্থির সিদ্ধান্তে চিহ্নিত তাই শেষ পর্যন্ত ঘটল যেন।

শ্যামল কখনো লজ্জিত হয় না, এবারও বেশ সাদামাঠা গলায় বলল, 'জীবনের নাটক আরও বেশি আশ্চর্যের, না মরা পর্যন্ত অঙ্কের পর অঙ্ক বেড়েই চলে, শেষ হতে জানে না। আমার শুধু একটাই সন্দেহ ছিল, এসে দেখব তুমি ডাক্তারের ঘরণী। তবে এও ভাবছিলাম, ডাক্তার আঠারো আনা ভদ্দরলোক, ওরা বাইরে ব্যভিচার করে, কিন্তু ঘরে পাপ ঢোকায় না। খবর কি তার?'

এসব দিক না মাড়িয়ে অবন্তী শান্ত গলায় প্রশ্ন করে, 'তোমার স্ত্রী এখন কোথায়?'

'ওঃ, সেই!' শ্যামল আকাশের দিকে আঙুল তোলে, 'মরেছে। তারও প্রায় একই ব্যাপার, বামুনের ঘরের বিধবা, পবিত্র জঠরে অত মদ সইবে কেন?'

এ মৃত্যু সংবাদ অবন্তীর কানেই আসে শুধু, মনে কিছুমাত্র রেখাপাত হয় না, সে পরবর্তী প্রশ্ন করতে যায়, 'তোমার অপেরা পার্টি— ?'

'চুলোয় গেছে।' জিজ্ঞাসার মাঝখানে বাধা দিয়ে বেশ নিরাসক্ত গলায় শ্যামল জবাব দেয়, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত পয়সা হঠাৎ হাতে এসে গেলে সাধারণত যা হয়; ও বেনো জল সবই ধুয়ে মুছে নিয়ে চলে যায়। উপরন্তু বাড়তি ঋণের সুদের বোঝা সারা জীবনের মতন ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছে।' বলতে বলতে সে নিজের কালিপড়া মুখটা অবন্তীর দিকে বাড়িয়ে দেয়, 'আমার মুখ দেখেই বুঝতে পারবে ভেতরে অজস্র ব্যাধির ভাণ্ডার। আমি এত অবিবেচক নই, এ দেহ নিয়ে তোমার ঘরদোর আর মাড়াতে চাই না, বাইরের দিকে ঐ রাখালের ঘরটা তো

খালিই পড়ে থাকে, ওখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিও।'

একটু বিরাম দিয়ে শ্যামল আবার নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, 'নতুন করে তোমার ওপর আমায় পোষার ভার পড়ল, তবে কথা দিতে পারি যে, পোষা কুকুরের চেয়ে বেশি দাবি আমি কখনো করব না। আমার কথা শুনে কেউ কেউ হয়তো বলবে শরৎচন্দ্রের প্রভাব ; কিন্তু মেয়েদের মন গলাতে শরৎ-ডায়লগ অনবদ্য, এতে সধবা বিধবা কুমারী পত্নী উপপত্নী সবারই চিত্ত হরণ করা যায়। অবশ্য আমার মুখের এ ডায়লগ, পোড় খাওয়া বুকেরই মর্মবাণী।'

অবন্তী এবার শ্যামলের কাছে এগিয়ে আসে, বারান্দার মেঝেতেই বসে রয়েছে সে, তার একখানা হাত ধরে টেনে তুলতে চেষ্টা করে 'অনেক অভিনয় তো করলে, এখনো শখ মিটল না তোমার ? চল ঘরে গিয়ে একটু জিরিয়ে স্নানটান করবে। আর একটি কথা, এবার থেকে বাড়িতে বসেই যত খুশি অভিনয় করো, আর তোমায় বাইরে যেতে দিচ্ছি না। সন্ধ্যেবেলা হয়তো ভাস্করবাবু আসতে পারেন, যদি না আসেন আমি নিজে গিয়ে ধরে আনব, তোমায় ভালো করে চিকিৎসা করাতে হবে।'

কথাগুলো বলার পর অবন্তীর মনে হলো তার নিজের জীবনটা ব্যভিচারের বিরাট ক্ষতদুষ্ট না হলে সে কি এইভাবে এবং এত সহজে শ্যামলকে গ্রহণ করতে পারত ? সতী নারীর যা সামাজিক সংজ্ঞার্থ, সেই অভিধায় বিভূষিতা অবন্তী আজ লাথি মেরে তার এই নিজস্ব নিবাস থেকে দুরাচারী কুৎসিত রোগগ্রস্ত অপদার্থ লোকটাকে দূর করে দিতে দ্বিধা করত না। এসব কথা মনে হতে তার ভেতরটা আরও সংবেদনশীল ও উদার হয়ে ওঠে।

'না না ঘরে নয়, আমার ডাবলু-আর ডবল পজেটিভ, পুরুষের মন তো, যদি ছুঁয়ে ফেলি তুমিও যাবে। শুধু কি এই একটা রোগ ?' বলতে বলতে শ্যামল নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়।

'রোগের চিকিৎসা হবে, এখন ওঠ তুমি।' কঠিন স্বরে কথাটা ব'লে অবন্তী শ্যামলকে নিজের নির্দেশনার আয়ত্তে টেনে নেয়।

শ্যামল ঘরে গিয়ে ঢোকে, অবন্তী কিন্তু বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে থেকে আর

একবার নিজের মনের ভেতর দিকে তাকায়। প্রথম দিকের চিন্তা ছাড়াও এ কি শ্যামলের প্রতি তার অনির্বাণ প্রেম? না প্রেম নয়, ব্যভিচারিণী নারীর আত্মদোষ প্রক্ষালনের জন্যে নির্দিষ্ট কর্তব্য। শ্যামল তার কর্তব্যের প্রয়োগ ক্ষেত্র, আর ডাক্তার ভাস্কর মুখার্জির কাছে একজন অপরিতৃপ্ত স্বামীর মানসিক সান্ত্বনা সে, এবং ভুবনেশ্বর সিং প্রদীপ তার নিভৃত মনের প্রণয়-সমস্যা, যেখানে কুশল সংবাদ প্রাপ্তির কোনো ক্ষীণতম সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই। শুধু আজীবনের স্বপ্নময় প্রতীক্ষাই এক মাত্র মিলনের সেতু।

সন্ধ্যেবেলা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবন্তীকেই ভাস্করের বাড়ি যেতে হলো, সব সম্পর্ক বহুকাল আগেই কেটেছে। যা রয়ে গেছে তা কেবল অভ্যেসের টান। কিন্তু শ্যামলের সংবাদ ভাস্কর মোটেই সহজভাবে নিতে পারল না।

অদ্ভুত ক্রুর দৃষ্টিতে ভাস্কর অবন্তীর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'শেষ পর্যন্ত আমিই সব দিক দিয়ে ঠকে গেছি অবন্তী। তুমি শ্যামলকে ফিরে পেয়ে সুখী হলে, উশ্রী সুধীর সেনকে নিয়ে পরিতৃপ্ত, আমি শুধু একবার তোমার আর একবার উশ্রীর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলব?' বলতে বলতে ভাস্কর থেমে যায়, কি যে চিন্তা করে সে, তারপর এক ধরনের অবুঝ তেজস্বিতার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, 'না, সুখী তুমিও হবে না, আর, আর উশ্রী তো নয়ই।'

ভাস্করের উত্তেজিত ভঙ্গি দেখে অবন্তীর ভেতরটা হতচকিত হয়ে যায়, তার কথাগুলোও কেমন যেন সাংঘাতিক তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, তবু সে হাসবার চেষ্টা করে, 'আমাদের ভাগ্যে যা হবার তা হবে, কিন্তু আপনি রুগীর চিকিৎসা করবেন তো?'

ভাস্করের ঠোঁটের কোণে নতুন ধরনের বিচিত্রদর্শন হাসি, ওদিকে তাকানো যায় না। সেই হাসি মুখে নিয়ে সে যেন সুচিন্তিত শব্দ সংযোগে উত্তর দেয়, 'আগে নিজের চিকিৎসা করি, তারপর তোমার পতিদেবতা তখনো যদি বেঁচে থাকে তারও নিরাময়ের চিন্তা করা যাবে।'

কথাগুলো বলার পর ভাস্কর অপেক্ষা করতে থাকে, বোধহয় ভাবে তার

এই উক্তির প্রতিক্রিয়া অবন্তীর মনের ওপর কতখানি ; কিন্তু হতবাক্ অবন্তীর বহিরাচরণ সম্পূর্ণ নির্বিকার। তাকে নিরুত্তর দেখে ভাস্কর খুব শান্তভাবে কি যেন ভাবতে ভাবতে আলনার কাছে গেল, তারপর অবন্তীর সামনেই বাইরে বেরুবার পোশাক পরতে লাগল সে।
অবন্তী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'আমার বাড়ি যাচ্ছেন তো ?'
এক পলকের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ভাস্কর অবন্তীর অপাঙ্গ দর্শন করে, 'যাব তো বটেই, তবে আজ নয়।'
অবন্তী ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষায় রেখে ভাস্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। স্থির সংকল্পিত মনোভাব নিয়ে প্রায় মাইল-খানেক রাস্তা যেন চোখের পলকে অতিক্রম করে এলো সে। এতখানি ব্যস্ততা, অথচ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মনে হয় নি মোটরবাইক নিয়ে যায়। রাস্তাতেও একথা তার একবারও স্মরণ হয় নি।

কোন্‌কালে একবার সুদীন যাদবের বাড়িটা দেখেছিল ভাস্কর, আজ পরিপূর্ণ জ্ঞানে থাকলে এত ঘোর অন্ধকারে এ বাড়ি চিনতে পারত না, এখন যেন নিশির আকর্ষণে সে ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। নিজে-রই অজ্ঞাত কণ্ঠস্বরে সুদীন যাদবের নাম ধরে ডেকেছে।
অন্ধকার ঢাকা বাড়ির সামনে পিয়ালগাছ, সুদীন যাদব বেরিয়ে এলো, 'হুজুর, ডাক্তারসাব !'
'সুদীন যাদব, তোমার মিছে হার্নিয়া অপারেশন করে খুনের মোকর্দমার অ্যালিবাই তৈরি করে প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম, মনে আছে ?' একটিমাত্র প্রশ্নের মাধ্যমেই ভাস্কর অনেকখানি বিগত প্রসঙ্গ টেনে আনে।
'আমি তো হুজুরের গোলাম। খুন—?' সদা প্রস্তুত ভাব দেখিয়ে সুদীন যাদব কথা বলে। অনুজ্ঞা প্রার্থনা করে।
অন্ধকার কাটাবার জন্যে ডাক্তার ভাস্কর মুখার্জি মুখে সিগারেট নেয়, ত্বরিতে ঘাড় নাড়ে, 'না না, খুন নয় ; এমন শিক্ষা দিতে হবে যা সারা জীবন মনে থাকে। তবে একজন নয়, দু'জন। আমি শুধু চোখে দেখতে চাই।'

দুটো কেন, হুজুরের ঋণ বিশটা খুন করলেও শোধ হবে না।' এমন সহজ ভঙ্গিতে সুদীন যাদব কথাটা বলে যেন অত্যন্ত অনায়াস-সাধন কর্তব্য এটা।

সুদীন যাদবের মতোই মনোভাব সম্পূর্ণ অকম্পিত রেখে সিগারেটে মন্থর টান দিয়ে যেন অভ্যস্ত কণ্ঠস্বরে ডাক্তার ভাস্কর মুখার্জি নির্দেশ দান করে, 'বেশ, তবে কাল একবার দেখা করো।'

সুদীন যাদব ঝুঁকে পড়ে ভাস্করের পায়ে হাত দেয়। ভাস্কর সে প্রণাম ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবেই গ্রহণ করে।

প্রণাম করার পরও সুদীন যাদব দাঁড়িয়ে থাকে, 'হুজুরের আর কোনো হুকুম ?'

'হুকুম— ?' ভাস্কর স্মরণ করার চেষ্টা করে এইমাত্র বোধহয় সুদীন যাদবকে কথাটা বলেছে সে, তবু আবার বলে, 'আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'দেখবেন বই কি !' তারপরই সশঙ্ক স্বরে সুদীন যাদব প্রশ্ন করে, 'আসামীরা কি হুজুরকে চেনে ?'

মৃদু হাসে ভাস্কর, তার মুখের হাসির চেয়ে ঈর্ষা ও প্রতিশোধ পরায়ণ বুকের হাসি অধিকতর বিস্তৃত। সে উত্তর দেয়,'খুব ভালো করেই— ।'

এবার সুদীন যাদবের কণ্ঠস্বর একটু ভীত, 'হুজুরের হুকুম, একেবারে বডি পার্শ্বেল চলবে না, যেন বেঁচে থাকে। তারপর যদি আপনাকে চিনে ফেলে হুজুর ?'

'চিনুক,' বেপরোয়া এবং উত্তেজিত গলায় ভাস্কর জবাব দেয়, 'আমার ফাঁসি হবে, জেল হবে, এই তো ?' কথাটা বলার পর নিজের নিরুদ্বেগ ও নিঃশঙ্ক চিত্ত বোঝাবার উদ্দেশ্যে সে সিগারেটের বিপুল ধূম উদ্গিরণ করে।

সুদীন যাদব হাসল, 'হুজুর, আমার বেআদপী মাফ্ হয়, তবে খুন জখমের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, রাগ করে খুনের ব্যবস্থা চলতে পারে, কিন্তু ঠিক খুন করার সময়টাতে মনের রাগ সরিয়ে মাথা বরফের মতন ঠাণ্ডা করে নিয়ে কাজ সারতে হয়। নয় তো খুনী ধরা পড়ে যাবে। আপ-

নাকে চিনে ফেললে সেইসঙ্গে আমিও যে জাহান্নমে চলে যাব হুজুর ?'
'তুমি নিশ্চিন্ত থাক সুদীন যাদব,' নিজের পদমর্যাদা ভুলে, সমস্তরের ব্যক্তি জ্ঞানে, ভাস্কর সুদীন যাদবের কাঁধে হাত দিয়ে কথা শেষ করে, 'আমি মরে গেলেও তোমায় জড়াব না।'
ডাক্তার ভাস্কর মুখার্জির আচরণে সুদীন যাদব একটুও বিস্মিত নয়। অপরাধ প্রবণতার এই নিয়ম, আজ ডাক্তারবাবু তার কাঁধে হাত দিয়েছেন, কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর একপাতে বসে আহার করতেও দ্বিধা করবেন না। অধোগতির সিঁড়িতে পা রেখেই দাঁড়িয়েছেন তিনি।
তবু সুদীন যাদব ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারে না, নীরবে মাথা নাড়ে, তারপর বলে, 'আচ্ছা বেশ, হুজুরের হুকুম মতন আমি কাল দেখা করে আসামীদের বিষয় জেনে নেব। সন্ধ্যেবেলা তো ?'
'না, দুপুরে।' তারপরই ভাস্করের মনে হয় আসামীদের—! আসামীদের কেন ? আসামী শুধু একজন। শ্যামলকে আসামী ভাবতে তার শিক্ষিত চেতনার কোথায় যেন বেধে যায়। নিজে সে অপর এক ব্যক্তিকে যে হিসেবে অপরাধী বিবেচনা করে শাস্তি দেওয়ার জন্যে উদ্যত, ঠিক সেই কারণে শ্যামলও আজ তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। হয়তো বা করেওছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিরুপায় ক্ষোভে মূক হয়ে আছে সে।
তবু শ্যামলকে রেহাই দিলে অবন্তীও অব্যাহতি পেয়ে যায়। ভাস্করের উদ্দেশ্য কীটতুল্য শ্যামলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ নয়, অবন্তীর জীবনে চিরদিনের মতো গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে দেওয়া। কিন্তু অবন্তীর অন্তর এখনো কি ক্ষতহীন ? ভাস্করকে না পাওয়ার ব্যর্থতায় সেখানে কোনো শূন্যতাবোধ নেই ? অবন্তীর ভালবাসা শুধু অভিনয়, তার অকুণ্ঠ দেহদান নির্বিকার গ্রহণ সুখ, এর অতিরিক্ত কিছু নয় ?
না, নিজেকে ভাস্কর এতখানি অপদার্থ মনে করতে পারে না। তার এক মুহূর্তের গভীর সান্নিধ্য যে কোনো নারীজীবনে বহুল প্রাপ্তির অঙ্কপাত। তার অপসরণ অবন্তীর মনে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। সুদীন যাদবের আঘাতে আহত শ্যামল যদি সুদীর্ঘকালের জন্যে শয্যাগত হয়, সেই নিরুপায় ও অসহায়ের প্রতি মনোযোগ এবং মমত্ব দিয়ে অবন্তী

সে শূন্যতার বিকল্প পুষ্টিসাধন করবে।

ফিরে আসার সময় ভাস্কর বলল, 'সুদীন যাদব, তোমায় দু'জনের কথা বলেছিলাম না? দু'জন নয় মাত্র একজন।'

অনভিজ্ঞ হবু অপরাধীর হাবভাব দেখে সুদীন যাদব মনে মনে হাসে, কিন্তু মৌখিক সমীহ প্রকাশ করে উত্তর দেয়, 'বেশ হুজুর, কাল যেমন হুকুম হবে।'

সুদীন যাদব আর একবার ভাস্করের পায়ের কাছে নত হতে যায়, কিন্তু ভাস্কর আর তাতে সুযোগ দেয় না, তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়িয়ে তার হাতদুটো ধরে ফেলে সে। যার কাছে উপকার নিতে হবে তার এতখানি বিনয়ের ভার গ্রহণ সম্ভব নয়।

এবার ভাস্কর কতকটা শান্ত মনে বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে। অবন্তী কেন জানি দেখা করতে এসেছিল? শ্যামল খুবই অসুস্থ! ভাস্করের কাছে আসে নি অবন্তী, এসেছিল ডাক্তারের কাছে। নিজের সুখের কথা বলতে নয়, দুঃখের প্রতিবেদন দিতে।

রাস্তার মোড়ে এসে ভাস্কর একবার চিন্তা করল, অবন্তী কি এতক্ষণে বাড়ি ফিরে গেছে? তাই সম্ভব, একটা রুগীকে একা ফেলে রেখে কতক্ষণ আর বাইরে কাটাবে? এ অবস্থায় বাড়ির টানই তার স্বাভাবিক। ডাক্তার ভাস্কর মুখার্জি হাতঘড়ি দেখল, রাত মাত্র ন'টা। শ্যামলকে একবার দেখে আসা চলতে পারে। তাতে অবন্তীর কথঞ্চিত স্বস্তি। মনের চিরস্থায়ী শূন্যতায় মৃদু বাতাসের স্পর্শ পাবে সে, শূন্যতা দীর্ঘশ্বাসের মতো মর্মরিত হয়ে উঠবে!

৩৪

এতখানি বিষণ্ণতা সুধীর সেনের কখনো দেখা যায় নি। অন্তত উশ্রী ইতি-পূর্বে তাঁকে বিমর্ষ দেখে নি। মানুষটি স্বভাবতই গম্ভীর, এবং যেন সবিশেষ চিন্তাশীল। কিন্তু তাঁর মুখাবয়বে মেঘের পরিমণ্ডল কোনোদিনই রচিত হয় নি।

দু'একটি কথা বলার পরই সুধীর সেনের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ভরাট মুখটা যুগল করতলে নিয়ে ওপর পানে তুলে ধরে উশ্রী আন্তরিক চিন্তাব্যাকুল সুরে প্রশ্ন করে, 'কি হয়েছে বলুন তো আপনার? যে মুহূর্তে আপনি ঘরে ঢুকেছেন, লক্ষ্য করছি কেমন যেন হয়ে রয়েছেন!'

শিথিল গ্রীবা হেলনে সুধীর সেন উশ্রীর চিরকাম্য করপুট থেকে মুখ-খানা সরিয়ে নিয়ে উত্তর দেন, 'না, তেমন কিছু নয়।'

'কিছু তো বটেই,' ডিভানের ওপর সুধীর সেনের পাশে বসে পড়ে কণ্ঠ-স্বরে আত্মবিশ্বাস ঢেলে দিয়ে উশ্রী কথা বলে, তারপর সেই স্বর অভি-মানে সিক্ত করে নেয় সে, 'তবে একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি হয়, শুনতে চাই না।'

উশ্রীর এ ভঙ্গিতে আজ সুধীর সেনের মন বিচলিত হয় না। শুনতে চাই না, অর্থাৎ সবই শুনতে চায় সে, এবং হয়তো ভাবে তাঁর সম্বন্ধে তার বিস্তারিত জানার অধিকারও আছে। বিশেষত অন্যত্র অপ্রকা-শিতব্য তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত পর্যায়ের অধ্যায়গুলি।

বিবাহিতা পত্নীর কাছে গোপনীয়তা রক্ষা করা যদি বা সম্ভব, পত্নী-তুল্যার কাছে এ অধিকার নেই, কারণ এতে তার অমর্যাদা। এবং উশ্রী তাই গণ্য করবে। সে আশা করে সুধীর সেনের কায়িক ও মানসিক সত্তা তার কাছে সমভাবে উন্মোচিত হবে। পরকীয়া প্রেমে এই স্বতঃ-সিদ্ধ রীতি, এবং এক ধরনের নৈতিক দায়িত্ব।

যাহোক উশ্রী-পর্ব বাদ দিয়ে সুধীর সেনের জীবনে দ্বিতীয় কোনো

গোপন অধ্যায় নেই। তাঁর অতীত প্রকাশ্য দিবালোক, আর মাত্র একটি দিক ছাড়া বর্তমানও প্রায় উন্মুক্ত আলোকময়। কোথাও অন্ধকারের আবরণ নেই।

কিন্তু উশ্রী আজ যে ভাবে সুধীর সেনের মানস-নির্যাস আহরণের প্রয়াস করছে তার প্রয়োজন ছিল না। এই বিমর্ষতার কারণ কোনো গোপন অথবা অনুল্লেখনীয় তথ্য নয়, তবে একদিক থেকে তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত চিত্ত বিক্ষোভ। এবং হয়তো বা প্রতিটি ন্যায়জীবীর, যাঁরা বিচার বিভাগের বিভিন্ন পদে আসীন। কিন্তু তাঁর মনের এ গ্লানিময় ভার উশ্রী উপলব্ধি করতে পারবে না। চাকরিজীবীর যন্ত্রণা সমপর্যায়ের ব্যক্তিই বোঝে। স্বাধীন বৃত্তিতে সম্ভবত এমন নিরুপায় আত্মদহন নেই।

অতএব উশ্রীর অনুরোধের বিকল্প ভাষা, অর্থাৎ; একান্তই ব্যক্তিগত যদি কিছু হয়, শুনতে চাই না, আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে সুধীর সেন সে বিষয়ে নীরব থাকেন, এবং তারপর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা টেনে এনে প্রশ্ন করেন, 'আজ কি আমার চা, কথা গোপন করার অপরাধে বন্ধ, একেবারে শুকনো মুখে ফিরে যেতে হবে?'

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উশ্রীর অপাঙ্গে লোহিত চিক্কনতার নীরব সন্দর্ভ, কারণ প্রায় প্রতিদিনই যা হয়। এখানে আসার পর সুধীর সেনের এক পেয়ালা চা পান, তারপর প্রায় বিশ মিনিট ধরে মূল্যবান দীর্ঘায়তন সিগারেটের ধূম সেবন। প্রায় নিজগুণে সিগারেটটা ধীরে ধীরে জ্বলে চলে। কখনো বা সুধীর সেন লঘু ওষ্ঠস্পর্শে সেটির কর্কটিপ চুম্বন করেন। আবার কখনো চুম্বনের আধার পরিবর্তন। সিগারেটের পরিবর্তে উশ্রীর কামনাসিক্ত অধরোষ্ঠ, অথবা তার মৃদু প্রকম্পিত কবোষ্ণ যুগল বক্ষ-কুসুম। এইভাবে সুধীর সেনের প্রাথমিক বিশ্রাম পর্বের পরিসমাপ্তি। অতঃপর অফিস-সংলগ্ন চেম্বারে তুতলয়ের বিশ্রম্ভালাপ। জয় পরাজয় অনিশ্চিত, কিন্তু পরিসমাপ্তিতে যুগ্ম পরিতৃপ্তির সহজ সাক্ষর।

সুধীর সেনের প্রশ্ন শোনার পর মুহূর্ত কয়েক নীরব থেকে উশ্রী নিজেকে ব্রীড়া মুক্ত করে নেয়, তারপর নিরীহ সপ্রতিভতার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয়, এবং তারপরই প্রশ্ন, 'চা তো হবেই। কোন্ দিন আমায়

দিয়ে চা না করিয়ে আপনি ছুটি দেন বলুন তো ? রাঁধুনী বা চাকরের তৈরি চা তো আপনি মুখে দিতে পারেন না ? কিন্তু আজ আপনার কি হয়েছে তা তো বললেন না ? গোপনীয়তার অপরাধ বলে চুপ করে রইলেন ?'

অভিব্যক্তি এবং উক্তিতে পরিপূর্ণ তাচ্ছিল্য দেখিয়ে সুধীর সেন বলেন, 'আমার ব্যাপার গোপনীয় কিছু নয়, চাকরি বাকরির চিরপ্রাচীন গ্লানির কথা। তবে এখনকার ব্যাপার আরও বেশি অসহ্য।'

'মানে.?' উশ্রী আশংকিত স্বরে প্রশ্ন করে, 'চাকরিতে আবার আপনার কি হলো ?' প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় সুধীর সেনের পাশে বসে পড়ে।

'তুমি দেখছি ভয় পেয়ে গেছ ?' বাঁ হাতের শিথিল পরিবেষ্টনে সুধীর সেন উশ্রীকে আবদ্ধ করেন, তারপর এক নিমেষের জন্যে তার গালে ওষ্ঠ স্পর্শ করে বলেন, 'ভয়ের ব্যাপার কিছু না। তবে আমাদের এ দিকটা তুমি ঠিক বুঝবে না।'

না, আমি আর কি করে বুঝব !' অভিমান তিতিত কথাটি বলেই নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় উশ্রী, তারপর সুধীর সেনকে আর কোনো কথা বলার অবসর না দিয়ে চা তৈরির উদ্দেশ্যে এ ঘর থেকে প্রস্থান করে।

আজ চা এসে পৌঁছবার আগেই সুধীর সেন সিগারেট ধরিয়ে ফেলেন। প্রতিদিনের নিয়মে প্রাথমিক অনিয়ম। বাকি সময়টুকুও হয়তো নিয়মভঙ্গের পালা। কিন্তু কিছুই আর যেন ভালো লাগছে না তাঁর। পুরুষ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও অধিষ্ঠিত পদের গাম্ভীর্য এবং মর্যাদা বিঘ্নিত হলে পৃথিবীর যে কোনো আকর্ষণীয় বস্তুই অসাড় আর অর্থহীন বোধহয়। উশ্রীও আজ সেই অসাড় বস্তু সমূহের পর্যায়ে।

মিনিট দশেকের মধ্যে উশ্রী ফিরে এলো, ডান হাতে চায়ের পেয়ালা। সুধীর সেনকে সিগারেট টানতে দেখে যেন খানিকটা অনিয়মের ধাক্কা লাগল তার। চায়ের পেয়ালাটা তাঁর হাতের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'আজ বুঝি আমার চা আনতে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে, তাই আগেই সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছেন ?'

'না তো !' হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালা নেন সুধীর সেন, তারপর একটি চুমুক দিয়ে বলেন, 'ভাবছিলাম এ চাকরি যেন ঘাড়ের ওপর খাঁটি দাসত্বের বোঝা হয়ে বসেছে, এ আর সহ্য হয় না।'

মৃগীনয়না উশ্রী উত্তর দিল না, আয়ত চোখের ঈষৎ অভিমানক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে সুধীর সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

নিজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সুধীর সেন তিক্ত গলায় প্রশ্ন করেন,'আমার চাকরিটা কি বল তো উশ্রী ?'

'কেন, জজ !' সগর্ব কণ্ঠে উশ্রী জবাব দেয়।

'গায়ে কালো কোট, গলায় ব্যাণ্ড, আর আর্মস অফ্ জাস্টিস-এর হাতা দেওয়া কালো গাউন পরে এজলাস সাজিয়ে বসি, এই জন্যেই বুঝি ?'

সুধীর সেনের এ জিজ্ঞাসা সবিশেষ ব্যঙ্গাত্মক। উশ্রীর কাছে কোনো উত্তর আশা করেন না তিনি, প্রশ্নের জবাব তাঁর বলার ভঙ্গিতেই নিহিত। তবু উশ্রী বলে, 'বাঃ, তা কেন ? আপনাদের মর্যাদা কত বেশি, জুডিসিয়ারি আছে বলেই দেশে ন্যায়-নীতি বজায় থাকে। সে ন্যায়-নীতি বজায় রাখার দায়-দায়িত্ব আপনাদেরই।'

'That's the theory, but practical aspect of the case ? এ তো কথার কথা, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কি ?' আইনের ভাব এবং ভাষায় সুধীর সেনের প্রশ্ন, তারপর তিনি নিজেই উত্তর দেন, 'বস্তুত এখন আমরা এগজিক্যুটিভ আর পুলিশের তাঁবেদার ভৃত্যে পরিণত হতে চলেছি। অধিকাংশ মোকর্দমাই, বিশেষ করে তার মধ্যে যেগুলো রাজনৈতিক অপরাধ বলে চিহ্নিত, সবই প্রায় সি. আই. ডি. কনট্রোলড্। এজলাসে দর্শকের বেঞ্চে বসে তারা আমাদের কনফিডেনসিয়াল লেখে। কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী, সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেবার অধিকার আমাদের আর নেই। এমনকি লক্ষ্য করেছি অনেক উকিল সওয়ালের সময় সরকার পক্ষের ন্যায্য সমালোচনা করতে ভয় পায়। জজ ভীত, উকিল অস্বস্তিগ্রস্ত, এ অবস্থায় তোমাদের ঐ ন্যায়-নীতি কতক্ষণ বজায় থাকবে ?'

এ ব্যাপারে উশ্রীও সহমত, তবু সুধীর সেনকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে

বলে,'হয়তো জরুরী অবস্থা চলছে বলেই—। কিন্তু এ কি চিরদিন সম্ভব, সাধারণ মানুষ এ অত্যাচার কতকাল সহ্য করবে ?'

উশ্রীর মনে হচ্ছে, এই নিভৃত কক্ষ-নিকুঞ্জে তারা যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ক্রীড়াজুটি, সে আর সুধীর সেন। সহমর্মিতার সূত্রটা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে। বাইরের পরিবর্তন তাদের মর্ম-মহলে পর্যন্ত অব্যবস্থার ছায়াপাত করেছে।

উশ্রীর কথা কানে নিলেন না সুধীর সেন, বললেন, 'আজকের ব্যাপার কি জানো? অ্যাডভোকেট তপেন্দু ব্যানার্জি আমার কোর্ট থেকে একটা বেল ম্যাটার ম্যুভ করে বেরিয়েছেন, এখনো তাতে কোনো অর্ডার দেওয়া হয় নি, স্টেটের কাছ থেকে কিছু কাগজপত্র, মেমো অফ এভিডেন্স, তলব করা হয়েছে, কেস আবার পরশু পুট আপ হবে। এজলাসের বাইরে এক দারোগা তপেন্দু ব্যানার্জিকে বলল, একটু সাবধানে চলবেন স্যার, মক্কেল টাকা দিয়েছে যত খুশি বক্‌বক্ করুন, কিন্তু অ্যাডমিনিস-ট্রেশনকে গালাগাল দেবেন না, আর আপনাদের জজসাহেবকেও বলে দেবেন, যেন ভুলে না যান তিনি চাকরি করছেন।' এক মুহূর্ত নীরবতার পর তিনি আবার বললেন, 'দারোগা তো জানে না, সাপের লেজে পা দিয়েছে। তপেন্দু ব্যানার্জি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দারোগার বিরুদ্ধে ফৌজদারি কেস করেছেন, ক্রিমিনাল ইনটিমিডেশান। টিফিনের সময় আমার চেম্বারে এসে সে খবর দিয়ে গেলেন। সাধারণ অবস্থায় সি. জে. এম. কগনিজেন্স নিতেন না, হয়তো দারোগাকে চেম্বারে ডেকে পাঠিয়ে ধমক ধামক দিয়ে ছেড়ে দিতেন। এখন আমাদের প্রতিটি জুডিসিয়াল অফিসারের মনেই ক্ষোভ।'

আজ মানসিক ক্ষোভ, আগামীকাল প্রকাশ্য বিক্ষোভ এবং তৎপরবর্তী চিত্র সার্বিক বিদ্রোহ, একথা উশ্রী জানে। মাসখানেক আগে স্বয়ং ডিসট্রিকট অ্যাণ্ড সেসনস্‌জজের এজলাসে প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা।

হাইকোর্টে ওকালতি করতেন সি. এস. লাল, বছর চারেক আগে সিনি-য়ার জুডিসিয়াল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে প্রথম নিয়োগ অ্যাডিশানাল

ডিসট্রিকট এণ্ড সেসনস্ জজ। মাস পাঁচেক আগে এখানেই প্রথম ডিসট্রিকট্ পেয়ে এসেছেন।

সি. এস লালের বয়সের হিসেব এখনো পঞ্চাশে পদার্পণ করে নি। রেকর্ড পরিষ্কার থাকলে হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন। শারীরিক গঠন ঈষৎ স্থূল, ন্যায়াধীশের গাম্ভীর্য তাঁকে স্পর্শ করে নি। অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী, এবং অভিজ্ঞ উকিলের মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। উকিলরা হাকিমকে কোথায় কি ভাবে ফাঁকি দেয় তা ধরে ফেলতে দেরি হয় না। কিন্তু সেজন্যে তিলমাত্র বিরক্ত নন তিনি। দরাজ হাসির ফাঁকে নিজের অসহ-মত ব্যক্ত করেন।

কিন্তু যাকে বলে উন্মুক্ত চিত্ত, সি এস লাল. সর্বদাই তা ঠিক নন। এজ-লাসে বসে কোনো এক পক্ষের ব্রীফ ধরে ফেলেন, তারপর জেদী ও এক-রোখা উকিলের ভাব নিয়ে মোকর্দমা বিচারে উদ্যত হন। কিন্তু আবার ঠিক রায় লেখাবার সময় সাধ্যমতো ন্যায় বিচারই করেন তিনি। পরাজিত পক্ষের উকিলের মন্তব্য, 'most uncertain court ; অস্থির আদা-লত !'

ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইনে ধৃত আসামী অবনীন্দ্র পাঠক। ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির বিশিষ্ট সভ্য, এবং এম এ পরীক্ষার্থী। পুলিশ রিপোর্টে তার বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় অপরাধের মাল মশলা বিশেষ কিছু নেই। সাধারণ অব-স্থায় একজন জুনিয়ার উকিলও তাকে জামিনে ছাড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু সদর এস. ডি ও তার জামিনের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেছেন, তৎসঙ্গে ব্যক্তিগত মন্তব্যও জুড়ে দিয়েছেন একটি, 'দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এখন সর্বতোভাবে বিপন্ন এবং বিঘ্নিত, এ অবস্থায় এ ধরনের বিপজ্জনক আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া অনুচিত মনে করি।'

সেই আদেশের বিরুদ্ধে সেসনস্ জজের আদালতে এসেছে অবনীন্দ্র পাঠক। তার পক্ষের আবেদন, সামনেই এম. এ. পরীক্ষা, উপরন্তু জেল হাজতে থেকে স্বাস্থ্যভঙ্গ।

প্রথম দিন আবেদন শুনে সি. এস. লাল আদেশ দিলেন, আগামীকাল আসামীকে আদালতে হাজির করা হোক।

পরের দিন আসামীর উপস্থিতিতে সেসনস্ জজ জামিনের আবেদন শুনলেন, তারপর অ্যাডিশানাল পাব্লিক প্রসিকূ্যটারের উদ্দেশ্যে বললেন, 'জামিন না-মঞ্জুর করা যেতে পারে আমি তো তেমন কারণ কিছু দেখছি না মিস্টার এ. পি. পি ? সরকারি উকিলের সঠিক কর্তব্য শুধুমাত্র আসামীকে শাস্তি দেওয়ানো নয়, আইনের ক্রিয়া যাতে বিষাক্ত প্রতিপন্ন না হয় সে বিষয়ে কোর্টকে সাহায্য করা। আসামীর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ আছে, any material against the accused ?'

এ পি. পি ঘাড় নাড়েন, 'না ইওর অনার, এমন কিছু নেই, যার জন্যে জামিন অগ্রাহ্য হতে পারে।'

'Alright, released on bail for a security of rupees F I V E only, with one bailor ; পাঁ চ টা কা র জামিন।'

এস. ডি. ও-র মন্তব্য অত্যন্ত তিক্ত মনে হয়েছিল সি. এস. লালের, সে কারণেই এ ধরনের আদেশ।

ন্যায়নীতির দিক থেকে সেসনস্ জজ অন্যায় কিছু করেন নি, তবে শাসনের নামে যারা ব্যক্তি অধিকার খর্ব করায় রত হয়তো তাদের কিঞ্চিৎ উপহাস করেছেন। জামিনের আদেশ শুনে সমগ্র আদালত কক্ষে একটা মৃদু হাস্যরোল উঠেছিল, কিন্তু আদালতের মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে তা নিমেষেই প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্যের নিচে অন্তরীণ।

জামিনে মুক্ত ছেলেটি হাসি মুখে এজলাস থেকে বেরিয়ে সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য বাস্তবিকই দুর্বল, কিন্তু বন্ধু পরিজনের পরিবেষ্টনে দাঁড়িয়ে এ কথা ভুলে গেছে সে।

'আপনার নাম কি অবনীন্দ্র পাঠক ?'

'হ্যাঁ।' অবনীন্দ্র পাঠক বিস্মিত চোখ তুলে তাকায়। প্রশ্নকর্তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতে খানিকটা আতংকগ্রস্ত হয় যেন, তবু প্রশ্ন করে, 'আমায় কি দরকার, আমার তো জামিন হয়ে গেছে ?'

'তা জানি।' কোতয়ালি থানার ও. সি, সঙ্গে জন চারেক বন্দুকধারী পুলিশ, ও. সি. বলে, 'জামিন হবে তা আমরা কালই আন্দাজ করেছিলাম। আজ আর ডি. আই. আর. নয়, মিসা ; অর্থাৎ মেনটেনেন্স অফ্ ইনটারনাল

সিকিউরিটি অ্যাক্টের ওয়ারেণ্ট। এবার নিশ্চিত জেলখানায় পচতে পারবেন, হাইকোর্ট পর্যন্ত বেল দিতে পারে না।'

মুহূর্তের মধ্যে দেওয়ালের কান বেয়ে এ খবর বিচারাসনে আসীন ন্যায়াধীশের কানে গিয়ে ঢোকে। বিচারক সি. এস. লালের মুখাবয়ব লাল হয়ে উঠল। অপরিসীম ক্রোধ ও গভীর অপমানবোধ। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ছেলেটাকে তো দেখলাম, সত্যিই খুব অসুস্থ, এবার হয়তো জেলখানার অত্যাচারে মরেই যাবে।' আবার নীরবতা, এবং তারপরই ধীরে ধীরে বলে চলেন, 'জেনটলমেন অফ দ্য বার, জুডিসিয়াল অফিসার্স আর বিয়িং গ্র্যাজুয়ালি হারনেসড্ উইথ দ্য মোস্ট নিফেরিয়াস অ্যাণ্ড কন্‌ডেমনেবল্ সিসটেম অফ্ কমিটেড জুডিসিয়ারি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আর ন্যায় বিচারের ক্ষমতা ক্রমশই আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আপনাদেরও স্বাধীন আইনজীবী হিসেবে যে অধিকার তা পর্যন্ত বিলুপ্তির পথে। আমরা সরকারের বেতনভোগী তাঁবেদারের বশংবদে পরিণত হচ্ছি। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় এবং সে সম্বন্ধে আমরা এতদিন যা বলে এসেছি বা পড়েছি, তা এখন বই-এর বন্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে অন্তরীণ। These dictums are also arrested under the arbitrary law of Misa; ন্যায় এখন মিসা-বন্দী। We are no longer supposed to do justice, but only to pose that; আমরা আর বিচারকর্তা নই, বিচারকের ভূমিকায় অভিনেতা যেন! সংবিধান সংশোধন, জনস্বার্থ বিরোধী নতুন নতুন আইন, দু'দিক থেকে হাত বাড়িয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা আর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করেছে।'

'ইওর অনার—!' সিনিয়ার অ্যাডভোকেট মুকুন্দদেব প্রসাদ উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে গেলেন।

হাতের ইঙ্গিতে সি. এস. লাল থামিয়ে দিলেন তাঁকে, 'না, আমায় বলতে দিন। এইসব আইনের স্রষ্টা কারা? বর্তমান এক নেতৃত্বাধীনে পরিপুষ্ট স্বার্থান্বেষী জনপ্রতিনিধিরা, এবং সেই আইনের প্রয়োগকর্তা, প্রশাসন আর আরক্ষণ বিভাগ। Henceforth before deciding a case

we have to take advice from Daroga ; দারোগার উপদেশ নিয়ে বিচার করতে হবে !'

যদিও জজসাহেবের মন্তব্যের সঙ্গে উপস্থিত সকলেই সহমত, এবং মুকুন্দ-দেব প্রসাদের নিজেরও, তবু তিনি আবার উঠে দাঁড়ান, জজসাহেব নিষেধ দেওয়ার আগেই বলেন, 'এটা আদালত স্যার ; Your honour, we are in open court room !'

'তাতে কি হয়েছে ?' বিশেষ উত্তেজনার সঙ্গে সি. এস. লাল উত্তর দেন, 'আমার চাকরি যাবে ? যায় যাবে। সামান্য বেতনের বিনিময়ে আমি নিজের বিবেক আর মর্যাদা বিক্রি করতে চাই না, not for any amount of money ; যদি চাকরি যায় আবার হাইকোর্ট বার-এ চলে যাব। সেখানে জায়গা না পাই যে কোনো মহকুমা আদালতের বটতলায় বেঞ্চি পেতে বসব।'

তারপর আদালত অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিস্তব্ধ, সি. এস. লালই সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেন, 'Yes, next bail application, আর জামিনের দরখাস্ত আছে নাকি ?'

দিনকয়েক পরে সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা। অসহযোগ আন্দোলন অথবা বিয়াল্লিশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও ব্যবহারজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এতখানি আলোড়ন আসে নি, কারণ তখন এমন নির্লজ্জভাবে ন্যায়ের কণ্ঠরোধ এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা হরণের প্রচেষ্টা হয় নি।

রাষ্ট্রশক্তির সুয়োরাণী প্রশাসন বিভাগ। বিচার বিভাগ তার স্বেচ্ছা-চারিতার পথে কণ্টক স্বরূপ, তাই সে উপেক্ষিতা দুয়োরাণী। কিন্তু ইতি-পূর্বে কখনো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণের অন্যায় অপচেষ্টা হয় নি। ইংরেজ আমলেও নয়।

বার অ্যাসোসিয়েশনের সাড়ে পাঁচশ' ব্যবহারজীবী এবং অ্যাডভোকেটস্ অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় সত্তরজন সভ্য নতুন সিভিল কোর্ট প্রাঙ্গনে সমবেত। সম্বোধন করছেন সিনিয়ার অ্যাডভোকেট বাবু মহেশ্বরী সিং, 'আমাদের স্লোগান তিনটি, ন্যায়পালিকা আজাদ কর, বিয়াল্লিশ বাঁ

সংশোধন আপস লো, আর মিসা বন্দীয়োঁকো রিহা কর। But our primary demand is for an independent judiciary, independent bar ; স্বাধীন বিস্তার বিভাগ, স্বাধীন ব্যবহারজীবী !'
সিভিল কোর্ট থেকে যাত্রা আরম্ভ করে সারা শহর পরিক্রমা। উশ্রী মিছিলে যোগ দিতে পারে নি, কারণ কিছুদিন যাবত সে অনুভব করছে, এই সম্প্রদায়ের কেউ নয় সে। তার পরিচয় এক ঘরে উকিল হিসেবে। তবু অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে সে মনে মনে সমগ্র ব্যবহারজীবী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে নিজের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সমর্থন পাঠিয়ে দিয়েছে।
জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ, ডি. আই আর এবং মিসা আইন সর্বত্র ওৎ পেতে রয়েছে, উশ্রী ভেবেছে বুঝি সিভিল কোর্ট থেকে বেরুবার পরই ওদের ওপর পুলিশী জুলুম আরম্ভ হয়ে যাবে। গুলি চলবে। গ্রেপ্তার হবে।
সিভিল কোর্টের প্রাঙ্গন থেকে দেখা যায় অনেকগুলি পুলিশের গাড়ি ওদিকের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। বন্দুকধারী পুলিশ আর সি. আর পি. পজিশন নিচ্ছে। উশ্রী তখন জানত না, শুধুমাত্র ব্যবহারজীবীদের মিছিল বলেই নয়, এতগুলি মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর রোধ করার ক্ষমতা কোনো স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তিরই থাকে না।
উশ্রী লক্ষ্য করে, ডিসট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসনস্ জজ সি. এস. লাল এবং তাঁর সহযোগী বিচার বিভাগীয় কর্মিবৃন্দ সিভিল কোর্টের ছাদে পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের মুখাবয়ব আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় স্বাক্ষরিত। সুধীর সেনও সেই দলে, কিন্তু যেন কিঞ্চিৎ দূরে।

এর আগে কিন্তু উশ্রী অথবা সুধীর সেন স্বদল থেকে এতখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন নি। সুধীর সেন নবাগত। যদিও ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, কিন্তু সে সংবাদ উশ্রীর অফিসঘর সংলগ্ন বিশ্রামাগার ছেড়ে বাইরে পরিব্যাপ্ত নয়। প্রণয়ের অলিখিত সমস্ত শর্ত অতিশয় বিশ্বস্তভাবে উভয় পক্ষ থেকেই প্রতিপালিত। আজও তাদের কেউ বিশ্বাসভঙ্গ করে নি।
'শুনুন এখানে।' ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে উশ্রী হেঁটে যাচ্ছিল,

তপেন্দু ব্যানার্জি ডাকলেন।

খানিকটা বিস্ময় নিয়ে উশ্রী তপেন্দু ব্যানার্জির টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়, এবং তারপরই সে বিস্ময় আরও বেড়ে যায় যখন তপেন্দু ব্যানার্জি তার হাতে একটি মিষ্টি আর নোনতা খাবারভরা কাগজের প্লেট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আমাদের উৎসব পালন হচ্ছে ; We are very happily celebrating the occasion !'

'কিসের ?' প্লেট হাতে নিয়ে করে উশ্রী প্রশ্ন করে।

'Our hats are off in proud appreciation of the Hon'ble High court of Judicature at Allahabad ; এলাহাবাদ হাই-কোর্টের সম্মানার্থে।'

'ওঃ !' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে উশ্রী হাসে, 'রাজনারায়ণ জিতে গেছেন।'

'না।' তপেন্দু ব্যানার্জির মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, সজোরে মাথা নাড়েন তিনি, 'মোকর্দমায় কে হারল, আর কে জিতল, তা নিয়ে কোনো উকিলই মাথা ঘামায় না। আমাদের গর্ব আর আনন্দ, ন্যায়ের অমর্যাদা হয় নি। একজন সাধারণ নাগরিক আর উকিল হিসেবে আমি একথা বলতে পারি, আমাদের দেশে স্বাধীন বিচার বিভাগ আছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের নিরাপত্তা রয়েছে।'

সেই সন্ধ্যেরই ঘটনা, সুধীর সেন এলেন, স্বভাব-গম্ভীর মুখ সবিশেষ হাস্যোজ্জল, উশ্রীকে আদর করতে করতে বললেন, 'জানো উশ্রী, আজ আমাদের মুখ রক্ষা হয়েছে, মান বেড়েছে।'

'তা তো বটেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়টা যেন আপনিই লিখেছেন !' নিজের ঠোঁটের ওপর থেকে সুধীর সেনের ঠোঁটের সোহাগলেপন শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে উশ্রী উত্তর দেয়।'

সুধীর সেন সগর্বে বলেন, 'নিশ্চয়ই, এ তো আমাদেরই দেশের বিচার বিভাগের রায়। আমাদের একজনের মান সবার মান, একার অপযশ সবারই অপযশ।'

উশ্রী প্রণয় আবেগে সুধীর সেনের বুকে মাথা রাখে, 'না, আপনার যশের ভাগ আমি অপর কাউকে পেতে দেব না।'

সুধীর সেন হাসেন, তারপর গভীর আলিঙ্গনে উশ্রীকে বুকে চেপে বলেন, 'বেশ, তাহলে আমরা এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা হয়ে থাকি ?'
পৃথিবী চিরদিনই প্রাচীন পন্থায় পথ পরিক্রমা করে। উশ্রীর এই একান্ত কক্ষটিও একটি ছোট্ট পৃথিবী, এখানেও সেই একই বিশ্বরীতি প্রযোজ্য। নিয়মভঙ্গ হয় না।

৩৫

দুপুর আড়াইটায় টিফিনের ঘণ্টা শেষ। তারপর থার্ড অ্যাডিশনাল সাব-জজ পি. এন. ভার্মার এজলাসে একটা ছোট বিষয় ম্যুভ করে এসে উশ্রী পুরনো কাছারির বার লাইব্রেরিতে বসেছে।
সিভিল কোর্টে উকিলদের যে দু'খানি ঘর তার কোনোটাই উশ্রী আজকাল মাড়ায় না। আগেও সে বড় একটা ওদিকে যেত না, তবু তখন এ বিষয়ে মনের মধ্যে নিষেধ ছিল না কোনো। পরেশ বসুর ঘরে কতদিন যে ঢোকে নি। মিঃ বসুর ঘর, বা সিভিল কোর্টের ঘর দুখানা, সেসব জায়গায় ছোট ছোট সমাজ, ভেতরে ঢুকলেই সমবেত অগ্নিদৃষ্টি তাকে এসে বিঁধবে।
পুরনো বার লাইব্রেরিতে এ ভয় ততটা নেই, সেখানে সহস্রের মেলা, ঐ ভিড়ে গা মিলিয়ে দিতে পারলে বেশ একলা থাকা যায়। নিজেকে হারিয়ে ফেলার শ্রেষ্ঠতম জায়গা জনারণ্য, সেখানে গিয়ে একবার অন্য-মনস্ক হয়ে পড়তে পারলে আর চিন্তা নেই। কেউই উশ্রীকে খুঁজে নিতে আসবে না। সে-ও নিজের মধ্যে নিজেকে অনুসন্ধান করবে না।
উশ্রী এই নির্ভয় জনারণ্যে এসে বসেছিল। বার লাইব্রেরীর পুরনো দেও-য়াল ঘড়িতে সওয়া তিনটে। ঘড়িটা প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু যখন চলে, সময়ের সঠিক নির্দেশ। ঐ ঘড়িতে সাড়ে তিনটের ঘণ্টা বাজলে উশ্রী বাড়ি চলে যাবে, কারণ সেই সময়টা থেকে হলঘর ক্রমশই খালি হতে আরম্ভ করে। তারপর এই পাতলা ভিড়ের মধ্যে সবকটি চোখের দৃষ্টি একত্র হয়ে আলস্যযুক্ত ব্যঙ্গময় অর্থসহ তার সর্বাঙ্গে এসে আছড়ে পড়বে। আজকাল তাকে কেউ আর আমল দেয় না, নিজেদের স্বজাতি

হিসেবেও অগ্রাহ্য করে।

ঘড়িতে তিনটে পঁচিশ। উশ্রী এবার উঠি উঠি করছে। বড় কাঁটাটা ছ-এর ঘরে পৌঁছবার মিনিট তিনেক আগেই সাড়ে তিনটের ঘণ্টা পড়বে। সব কিছুরই যেন একই ব্যাপার, বেলা ফুরিয়ে এলে বাকি সময়টা বড় তাড়াতাড়ি কেটে যায়।

উশ্রী উঠে বার লাইব্রেরির উত্তর দিকের সিঁড়ি পর্যন্ত চলে এসেছে। সামনে রাস্তা। ওপারে নগরপালিকা সৌধের পাশে কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় দাঁড় করানো তার মার্ক টু অ্যামবাসাডর। সে ছায়ার অধিকার নিয়ে কতিপয় উকিলের মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতা এখনো কমে নি। উশ্রী আজও সেই প্রতিযোগিতায় সচেষ্ট শরিক। একমাত্র এই একটি জায়গায় তার সঙ্গে অপরের শরিকানা, সহযোগিতা আর প্রতিযোগিতা।

পেছন থেকে চন্দ্রদেও সিং মৃদুস্বরে ডাকল, 'দিদি, আপকী চিঠ্‌ঠি।'

চিঠি! না, দু'লাইন লেখা চিরকুট একটা। সুধীর সেন এই মুহূর্তে তাকে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

কিন্তু এই চিঠি লেখার আগে সুধীর সেনের মনোজগতে অজস্র মনন-মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে। আহত অবস্থায় হাসপাতালের শয্যায় দীর্ঘকাল পড়ে থাকার সময় অনুক্ষণ বিবেকের দংশন অনুভব করেছেন তিনি। উশ্রী-পর্বের সবটাই তাঁর জীবনের নৈতিক পতনের চিত্র। বিচারক হিসেবে সর্বত্রই যেন অন্যায়ের অপভার রেখে গেছেন। তেমন দিন যদি আসে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য উশ্রীকে অস্বীকার করবেন না। বরং মনের অকুণ্ঠ আগ্রহ নিয়ে তারই প্রতীক্ষা করবেন!

চিরকুটের লেখাটা পড়ার পর উশ্রী জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি হাসপাতালে গিয়েছিলে চন্দ্রদেও সিং, সাহেব কেমন আছেন?'

'কাফী আচ্ছে তো হ্যাঁয়!' জবাব দিয়ে চন্দ্রদেও সিং চলে গেল।

চন্দ্রদেও সিং চলে যাওয়ার পর সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে উশ্রী আবার চিরকুটের লেখাটা পড়ল। একুশ দিন পরে এই চিরকুটের মাধ্যমে তার সঙ্গে সুধীর সেনের প্রথম যোগাযোগ। চন্দ্রদেও সিং আনিত সংবাদ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানে না সে। সেই প্রথম দিন একবার

হাসপাতালে গিয়েছিল, দেখা হয় নি, তারপর আর তার পক্ষে ও পথ মাড়ানো সম্ভব ছিল না। অনেকেই দেখতে গেছে, কিন্তু সে পারে নি। অনিয়মের ঘনিষ্ঠতা মাঝে মাঝে সাধারণ পরিচয়ের চেয়ে অধিক দূরত্ব এনে দেয়। উপরন্তু তুনিয়ার লোকের চোখে সে-ই যেন অপরাধী। তারই কৃত অপরাধের শাস্তি সুধীর সেন বহন করছেন। ন্যায়াধীশ স্বয়ং দণ্ড-ভোগী।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই উশ্রী হাসপাতালে এসে পৌছুল। হাসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ড, সেখানে সুধীর সেনের নির্দিষ্ট কেবিন। কি মনে করে গাড়িটা মিউনিসিপ্যাল বিলডিং-এর পাশে কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় ফেলে রেখে রিক্সায় এসেছে সে। এ গাড়ি অনেকে চেনে, এক নজরেই আগ্রহী দৃষ্টি কামড়ে ধরতে পারে। অর্থাৎ অযথা সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গের পুনরুন্মোচন। দরজার গায়ের নীল পর্দা বাঁ হাতে সরিয়ে উশ্রী কেবিনে ঢুকল। উত্তর দক্ষিণ বন্ধ, পশ্চিম দিকে একটি রেলিংহীন প্রশস্ত জানলা।
খাটের রেলিং-এ হেলান দিয়ে সুধীর সেন বসে, হাতে খোলা-পৃষ্ঠা বই একখানি. কিন্তু তা পড়ছেন না। জানলার ওপারে তাঁর চোখের দৃষ্টি, দেখে অনুমান হয় মনের জাগরণ অন্যত্র কেন্দ্রীভূত।
উশ্রীর প্রতীক্ষা করছেন সুধীর সেন। মনে হয় এতক্ষণে চিঠিটা তার হাতে পৌছে গেছে, যদি কোনো এজলাসে ব্যস্ত না থাকে এখুনি এসে পড়বে। প্রতীক্ষা শুধু তাঁর একার নয়, উশ্রীরও। যদিও তার একুশ দিনের সংবাদ তিনি জানেন না।
আজও সুধীর সেনের পিওনের দৌত্য নেবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু অন্য উপায়ও দেখতে পান নি তিনি। ডাকে চিঠি পাঠালে তু'দিনের আগে সে চিঠি উশ্রীর হাতে পৌছুত না, স্থানীয় ডাক বিলি সম্বন্ধে তাঁর এই অভিজ্ঞতা। উশ্রী অবশ্য কয়েকবার চন্দ্রদেও সিংকে দূত নিযুক্ত করেছে, যা তিনি মন থেকে সমর্থন করতে পারেন নি। উশ্রীকে বলেওছেন এ কথা, কিন্তু অবস্থার বিবৃতি দিতে তাঁকে চুপ করে যেতে হয়েছে। যাহোক সমস্ত ব্যাপারই চন্দ্রদেও সিং জানে। পিওনের অজ্ঞাতে হাকিম নয়, পেশ

কার বা স্টেনোগ্রাফারকে তবু একটু দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

ঘরে ঢুকে উশ্রী সামনে এসে দাঁড়াল। সুধীর সেন তাকিয়ে দেখলেন, বেশবাস মলিন নয় তার, সুন্দর মুখখানাও প্রসাধনবর্জিত নয়, তবু যেন খুবই ম্লান দেখাচ্ছে তাকে। সে কি কিছুদিন রোগ ভোগ করেছে? শরীরের অসুস্থতা যদি না হয়, মনের অশান্তি ও ক্লিন্নতার ছাপ তার সর্ব অবয়বে প্রসারিত, যা যে কোনো লোক-চক্ষুতেই ধরা পড়ে। এর জন্যে সুধীর সেনের পরিচিত বা অন্তঃপ্রেরিত দৃষ্টির প্রয়োজন নেই।

খাটের পাশে সাদা রং করা টুলটা দেখিয়ে দিলেন সুধীর সেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন উশ্রী, বসো?' তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বলেন, 'অনুমতির অপেক্ষা করছিলে বুঝি?'

'না তো!' উশ্রী ঘাড় নাড়ে, তারপর টুলের ওপর বসে পড়ে বেশ সপ্রতিভ ভাবে কথা বলার আয়োজন করে, 'কেমন আছেন আপনি?'

ঘরে ঢোকা অবধি উশ্রী লক্ষ্য করছে এখান থেকে যেন বহু দূরে সুধীর সেনের মানস-স্থানান্তর হয়েছে। অন্য কোথাও চলে গেছেন তিনি। তাঁর চেতনাটুকুই শুধু এ ঘরে উপস্থিত, যার সঙ্গে উশ্রীর বাক্য বিনিময়।

উশ্রীর প্রশ্নের উত্তরে সুধীর সেন বলেন,'এখন তো ভালোই আছি।' তারপর যে উত্তর উশ্রীর সর্বাঙ্গে অনুলিপ্ত, সেই কথাই জিজ্ঞেস করেন তিনি, 'তুমি ভালো আছ তো?'

হ্যাঁ না কোনো জবাবই উশ্রী দেয় না, উভয়ার্থক ভঙ্গিতে হেসে মৃদু গ্রীবা আন্দোলন করে। তারপর যে প্রশ্ন সুদীর্ঘ একুশটি দিন ধরে তার সর্ব অনুভূতিতে একটি জিজ্ঞাসার রূপ ধরে অহরহ আলোড়িত, সেই প্রশ্নটি তুলে ধরে সে,'একটা কথা বলুন তো, কে এমন করল?'

সুধীর সেন হাসেন, 'রহস্য গ্রন্থের ভাষায়, কে বা কাহারা?'

'হ্যাঁ, কে—?' সুধীর সেনের কৌতুক অগ্রাহ্য করে উশ্রী দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে। কণ্ঠস্বরে দ্বিগুণ উত্তেজনা।

সুধীর সেন উত্তর দিলেন না, চুপ করে রইলেন।

'আপনি জবাব দিচ্ছেন না কেন?' উশ্রী একবার ফাঁকা ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়, তারপর প্রশ্নের জের টানে, 'এতদিনেও কেউ ধরা পড়ে

নি! আপনি কি কিছু দেখতে পান নি, বা অনুমান করতে পারেন না, কে এমন করল, কেনই বা করল?'

কি যেন উত্তর দিতে গিয়ে সুধীর সেন নীরব হয়ে গেলেন, মুখভাব অস্বাভাবিক গম্ভীর, কিন্তু পরক্ষণেই হাসি টেনে এনে পাশ কাটানো জবাব দিলেন একটা, 'অপরাধীকে খুঁজে বার করা পুলিশের কাজ, বিচারকের কর্তব্য অপরাধী বলে যাকে সাব্যস্ত করা হবে তার বিচার।

উশ্রী সজোরে মাথা নেড়ে বলে, 'না, এ আপনার কোনো কথাই হলো না, আপনি তো এখানে বিচারক নন, আহত ব্যক্তি। আপনি যদি জানেন কে দোষী তা আপনার পুলিশের কাছে বলা উচিত। বলা কর্তব্য।'

উশ্রীর উত্তেজনা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে সুধীর সেন একবার হাত বাড়িয়ে তার একটি হাত ধরতে যান, কিন্তু অচির মুহূর্তে নিজের হাত ফিরিয়ে এনে খোলা বই-এর পৃষ্ঠার ওপর রাখেন, তারপর বলেন, 'সত্যিকার অপরাধী কে আগে তা সঠিক বুঝতে পারি, তবে তো? সব জিনিসই নিমেষের মধ্যে ধরা যায় না, কোনো কোনো ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য জানার জন্যে সময়ের প্রয়োজন। এখনই তুমি অত ব্যস্ত হয়ে পড়ো না।'

'অর্থাৎ আপনি কিছুই বলবেন না?' সুধীর সেন নীরব হবার সঙ্গে সঙ্গেই উশ্রী অবিশ্বাস ও বিরক্তিপূর্ণ তীক্ষ্ম স্বরে প্রশ্ন করে।

উত্তর দেন না সুধীর সেন।

সেই বিরক্তির রেশ নিয়েই উশ্রী আবার জিজ্ঞেস করে, 'এতদিন পরে আমায় মনে করে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন, কিছু বলবেন কি?'

'হ্যাঁ।' সুধীর সেন শান্ত জবাব দেন, তারপর ঈষৎ হেসে প্রশ্ন করেন, 'তুমি নিজে তো আমায় একদিনও দেখতে এলে না?'

'আমার কি কোনো উপায় ছিল', উশ্রী উত্তর দেয়, 'আর সবার মতন আমি যে ইচ্ছে হলেই আসতে পারি না, তা তো জানেন?'

'তা ঠিক।' সুধীর সেনও এ কথা স্বীকার করে নেন, তারপর বলেন, 'শোনো উশ্রী, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, আজ সকালেই গভর্ণমেণ্টের কাছে রেজিগনেশান লেটার চলে গেছে। এখন আমি বেশ সুস্থ, তাই কালই হাজারিবাগ চলে যাচ্ছি, যেখানে আমার বাড়ি।'

'তার মানে ?' সুধীর সেনের কথা উশ্রী যেন প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারে না, তারপর সে চাপা স্বরে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'কেন, আপনার কি অপরাধ, কিসের জন্যে চাকরি ছাড়বেন? আপনি আমায় প্রফেশনে একটু সাহায্য করেছেন, কিন্তু কোনোরকম ডিজঅনেস্টি তো করেন নি, neither in moral convictions, nor in judicial or legal proceedings ; বিবেক কিংবা আইনের অনুশাসন আপনি তো কখনো অবহেলা করেন নি? আপনি কোনোদিন এক প্যাকেট সিগারেটও ঘুষ নেন নি। আজ পর্যন্ত আপনার একটা জাজমেণ্ট, একটা অর্ডার হাইকোর্ট থেকে বাতিল হয় নি, পুনর্বিচারের জন্যে রিমাণ্ড হয়েও আসে নি।'

উশ্রীর বক্তব্য সবিশেষ জোরাল, তবু যেন সুধীর সেন নিজের অন্তরে সমর্থন খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, না উশ্রী, আমি সৎ নই। আজ আমার প্রতি বিচারপ্রার্থীদের প্রবল অনাস্থা, যে কোনো বিচারকের পক্ষেই তা কঠিন আর মারাত্মক অপযশ। এই অপ-যশ নিয়ে ন্যায়াধীশের আসনে বসার সাহস নেই।

কিন্তু সত্যি হলেও এই অপরাধের স্বীকারোক্তি করে সুধীর সেন নিজেকে আর নিচে নামাতে পারলেন না। যে তথ্যে সত্যের মূল নিহিত তার পরিবর্তন হবে না কোনোদিন, বরং স্বীকারোক্তির শিলমোহর পড়ে গ্লানি-ময় রূপ অধিক প্রকটিত হয়ে উঠবে।

নিজের মনের যা চিন্তা তাই খানিকটা ভাষা পরিবর্তন করে সুধীর সেন উত্তর দেন, 'তুমি যা বলছ উশ্রী, তা হয়তো ঠিকই; কিন্তু প্রহার-খাওয়া বিচারকের আর ন্যায়ের আসনে বসা উচিত নয়। সাধারণের চোখে মর্যাদা হারানোর পর ওখানে যাবার অধিকার কারো থাকে না। আমি জুডিসিয়ারিতে অপযশ আনার পক্ষপাতী নই। আজ যদি হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে আবার ওখানে বসি, তা একা আমার নয়, সহকর্মী-দেরও কলঙ্ক।' একটু বিরতি দিয়ে তিনি বলে চলেন, 'তোমাকেও একই কথা বলি, উকিলদের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে আর বার-এ থেক না। লোকে জানুক বেঞ্চ আর বার, ন্যায়ের এই দুটি অঙ্গ, সম্মান আর শ্রদ্ধার জায়গা, সেখানে কোনো দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় না।'

উত্তেজিত প্রায় অবাক কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সহজ ও শান্ত রেখে উশ্রী প্রশ্ন করে, 'আপনি আমাকেও ওকালতি ছেড়ে দিতে বলছেন ?'
পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সুধীর সেন উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, বর্তমান সহকর্মী আর সমব্যবসায়ীদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে আমাদের দু'জনেরই নিজের নিজের জায়গা থেকে সরে যাওয়া উচিত।'
উশ্রী লক্ষ্য করে সুধীর সেনের বাচন ভঙ্গিতে স্পষ্টোক্তির দৃঢ়তা, কিন্তু মুখাবয়ব অপরিসীম মমত্ব ও বেদনাপূর্ণ। তাঁর এ ম্রিয়মান ভাব দেখে সে আর কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না।
তাহলে কি এবার সব সম্পর্কের যবনিকাপাত, সব কথার পরিসমাপ্তি ? এ সমাপ্তির প্রাক্ ইঙ্গিত উশ্রী যেন বেশ কিছুদিন আগে থেকেই পাচ্ছিল, তদনুযায়ী মনটাও যথাযথভাবে প্রস্তুত করে নিয়েছে। প্রাত্যহিক যোগাযোগের সূত্র ছিঁড়েছে বহুদিন আগে, তাই এখন আর বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনাবোধ নেই। মনটাও প্রাচীন ক্ষতের মতো ক্রমশ যেন অসাড় হয়ে আসছে। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে নিজেকে সে সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলবে।
চেতনায় দৃঢ়তা এনে বেশ সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে উশ্রী উঠে দাঁড়াল, 'আমি যাই তবে ?'
মুখের ভাষায় সুধীর সেন জবাব দিলেন না, মৃদু ও অনিচ্ছুক ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন তিনি।
দরজার এপারে পর্দার আড়ালে এসে উশ্রীর মনে হলো, কি যেন বলছেন সুধীর সেন। তারই উদ্দেশ্যে কি ? না, অন্তর্মুখী স্বগত ভাব নিয়ে মৃদু ও প্রায় অর্ধোচ্চারিত স্বরে তিনি আবৃত্তি করছেন !

'When you go home,
Tell them of us and say,
For their to-morrow,
We gave our today !'

এটুকু শেষ হলে নিজের মনেই যোগ করেন, 'ফর এ বেটার ডন্, অ্যাণ্ড দ্য বেস্ট টুমরো !'

উশ্রীর স্মরণ হলো, আনন্দি ঝা'র মুখে শোনা কবিতা একদা সে-ই কোন এক গভীর ভাবাবেশে সুধীর সেনের কাছে আবৃত্তি করেছিল। কিন্তু এর যা বিষয়গত তাৎপর্য তা কি বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রযুক্ত হতে পারে। তবু কোথায় যেন খানিকটা গভীর আত্মত্যাগের নিদর্শন থেকে যাচ্ছে, নয়তো সব হারিয়েও এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি সে কিছুতেই অনুভব করতে পারত না।

চির ব্যর্থতার ইতিহাসে করুণ পরিসমাপ্তি আনন্দি ঝা, মাস ছয় যাবত পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। মৃত্যুর নির্দেশ সেখানে নিশ্চিতভাবে মুদ্রিত,বছর মাস অথবা দিন, সবই সমভাবে প্রতীক্ষিত। আনন্দি ঝা আর নেই!

হাসপাতালের বারান্দা থেকে নেমে উশ্রী সেই একই রিক্সায় উঠল, এবং তারপর অনুচ্চ স্বরে নির্দেশ দিল, 'কাছারি-বার লাইব্রেরী!'

আজ আর উশ্রীর আদালতে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। হয়তো আগামীকাল থেকে এই পরিচিত রাস্তা ক্রমশই অনভ্যস্ত হয়ে আসবে, এখন কিন্তু একবার যাওয়া দরকার, ব্যবহারজীবিনী রূপে তার দ্রুত সাফল্যের নিদর্শন মার্ক টু অ্যামবাসাডার গাড়িটা মিউনিসিপ্যাল অফিস কম্পাউণ্ডে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে পড়ে রয়েছে।

হাসপাতাল থেকে কাছারি মিনিট পনেরোর রাস্তা। পরিপূর্ণ বিকেলের জনস্রোত-উজ্জ্বল মহাত্মা-গান্ধী-পথ উশ্রীর কাছে মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দময় বোধ হচ্ছে। তার ক্ষীণ চেতনা স্বপ্নাবিভূত। মর্যাদা ও অপমানের মাঝে ব্যবধান রেখাটা এক বিষণ্ন পরিতৃপ্তিতে লীন। অবচেতন মনে এতখানি মানসিক সমতা ইতিপূর্বে কখনো অনুভব করে নি সে!

সর্বাঙ্গে বিচিত্র আলোর স্পর্শ পেয়ে উশ্রী একবার আকাশের দিকে তাকাল। বৈকালিক সূর্য আর হাল্কা মেঘে মাখামাখি। চতুর্দিকেই যেন বিচিত্র প্রাত্যূষিক রেশ। অন্যান্য দিনের তুলনায় আরও দীর্ঘ, আরও বেশি, শেষ বিকেলের অফুরন্ত সকাল!